বাংলাদেশ চিরকালই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এসেছে। বাংলার রাজধানী গৌড়কে তাই দিল্লীর লোকেরা বলত—'বলঘাকপুর' অর্থাৎ বিদ্রোহের নগরী। শুধুমাত্র রাজনীতি নয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও একদিন গৌড় দিল্লীর দরবারকে ছুঁড়ে দিয়েছিল বিদ্রোহ। এক ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁরই জন্য দিয়েছিলেন প্রাণ। প্রাণের বিনিময়ে এ বিদ্রোহ করবার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন কোথায়? আমার স্বপ্ন-দৃষ্টি মেলে দিয়ে সে প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজেছি এ উপন্যাসে।

লেখক

পরম পূজনীয় পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার মহাশয়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের :

সবুজ মাঠের ইতিকথা, সরস্বতী বাঈ, নীল পান্না লাল বাদশা,
নতুন মহলের·বেগম, বেগম নয় বাঁদী নয়, তিন পাহাড়ের
বিবি, ইরাণ কন্যা, একটি বেগমের অশ্রু, শ্যামের কণ্ঠী,
রাজা বাদশার পথের ধারে, দক্ষল
দরওয়াজার নগরী, আগ্রা দুর্গের
বন্দী, এক টুকরো প্রেম,
সুলতানী আমল;
বাবু আর বিবি
ইত্যাদি

সকাল বেলার রোদ যথারীতি উঠেছে। পথের পাশের গ্রামগুলির খড়ের চুড়োতে সেই সোণালী রোদ পড়েছে। রাত্রির স্নেহ শিশির হয়ে ঝরে পড়েছিল, এখনো শুকোয় নি। আলোর বর্ণচ্ছটা শিশির বিন্দুগুলির মধ্যে ঝলমল করছে। রাত্রির অন্ধকার সলিলে স্নান করে ওঠা গ্রামকে প্রভাতের বেলাভূমিতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। এই শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে কে বলবে পৃথিবীতে দুঃখ আছে, যন্ত্রণা আছে, নিত্য আছে যুদ্ধ আর বিদ্রোহ।

তা ঠিকই। প্রকৃতির কাছে যুদ্ধ নেই, বিদ্রোহ নেই। যত বিপর্যয়, যত বিঘ্ন আসুক তার মনে রেখাপাত করতে পারে না। আকাশে কালো মেঘ করে ঝড় আসুক, আর্ত বৃক্ষগুলি বাহু আন্দোলিত করে ত্রাসই ব্যক্ত করুক, কেউ ভাঙুক, কেউ দুমড়ে যাক্, কিন্তু বিপর্যয়ের পর আবার তার দিকে তাকালে মনেই হবে না যে, তার মনে ঝড়ের তাণ্ডব কোন রেখাপাত করতে পেরেছে। আবার হাসবে সে, আবার তেমনি স্নিগ্ধ অনাবিল ব্যাপ্তি মেলে ধরবার চেষ্টা করবে।

এই গ্রামের দিকে তাকালে সেই স্থির প্রশান্তি এখন। কাকেদের প্রাথমিক কোলাহল শেষ হয়েছে। তারা এখন মাঠে মাঠে আঙিলায় আঙিনায় নেমে গেছে। ফুলের রেণু পাখায় জড়িয়ে প্রজাপতিরও ক্লান্তি এসেছে। মানুষের ঘুমভাঙা আর পাখী-পতঙ্গের জগতে কর্মে মনোনিবেশ করবার মধ্যে এক সীমান্তকালীন সময় এখন। প্রকৃতি তাই বড় মধুর।

রাত্রির স্নেহ সূর্যের সোনালী রোদ্দুরে মোহময় হাসি হাসছে। যুদ্ধ নেই, বিদ্রোহ নেই, অশান্তি নেই, কিছু নেই। গ্রামের পাশ দিয়ে যে পথ চলে গেছে সেও নীরব নিথর হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু প্রকৃতি যাই বলুক—মানুষের জীবনের জগৎ অন্য রকম। তার শান্তি নেই। জীবন চাঞ্চল্য ফোটাতে হবে বলেই বুঝি বিধাতা শান্তি দেন নি। কিন্তু চাঞ্চল্যের জন্য যে অশান্তি তা মানুষ সহ্য করতে পারে কোথায়? জীবনের জন্য সংঘাতের প্রয়োজন বুঝেও জীবনে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চায় কে? দ্বন্দ্বকে মানুষ ভয় পায়। সে শান্তি চায়।

কিন্তু শান্তি পৃথিবীতে ছিল না, আসবেও না। জীবন যদি থাকে শান্তি কোথায়? তবু কি শান্তি নেই? চাঞ্চল্য, প্রশান্তি এ দুয়েকে কি কেউ মেলাতে পারেন নি? সংঘাতের মধ্যেও বিক্ষুব্ধ না হবার কি কোন উপায় নেই? হয় তো আছে। শাস্ত্র তো কতই বলেছে। তবু মানুষ তা পেল কৈ? তাই যুগে যুগে মানুষ মহাপুরুষের খোঁজ করে। তিনি যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন।

শাস্ত্রে আছে, শাস্ত্র তারা কিছু কিছু জানেও, তবু মানুষের শান্তি নেই। বিশেষ করে এই যুগে নেই। যখন নিত্য যুদ্ধবিগ্রহ, রাজপথের ধারে গৃহীর নিত্য নিপীড়ন। এই লোভিদের আমলেও সে শান্তি নেই। এমন দিন চলছে না, যেদিন সংঘাত নেই, এমন দিন চলছে না যেদিন সংঘাতের খবর না আসছে। দিল্লীর সুলতানের মুহূর্ত মাত্র বিশ্রাম নেবার অবসর নেই, নেই তার প্রজাবর্গেরও। যে মাটীতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সে মাটী কাঁপলে মানুষ স্থির থাকবে কি করে? তাই গ্রামের বুকে যতই প্রকৃতির স্নেহ স্পর্শ পড়ুক না কেন, গ্রামের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আছে যারা সেই মানুষের অন্তরে শান্তি নেই।

যে গভীর বিশাল প্রকৃতি সান্ত্বনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে দিকে তাকাবার অবসর কোথায় মানুষের?

তাই দুঃস্বপ্নে রাত কাটে। ঘুম ভেঙে ক্লান্ত চিন্তায় পথে বেরুতে হয়। প্রথম গৃহ থেকে একজন মানুষ তেমনি প্রথম নিদ্রাজড়িমা ভেঙে বেরুবার চেষ্টা করল। কিন্তু বোঝা যায় নিদ্রা তার প্রয়োজন মেটাতে পারে নি। দেহে মনে কোন শান্তির প্রলেপ সে পায় নি।

ঘরের পাশ দিয়ে পথ চলে গেছে নদীর ধারে। সে পথের দু' ধারে, সেই পথের ধারে দিগন্তবিস্তৃত আবাদী জমি। সেই গৃহী লাঙল জুড়ে মাঠের দিকে বেরুল।

তখন গ্রামের অভ্যন্তরে নিত্য সমস্যা, নিত্য প্রয়োজনের কাকলি কণ্ঠে ফুটে উঠেছে। সেই কণ্ঠকে পেছনে রেখে স্নিগ্ধ হাওয়ার মধ্য দিয়ে কৃষক মাঠের দিকে এগিয়ে চলল। তার দৃষ্টি সম্মুখের মাঠের দিকে। কিন্তু তার মনের মধ্যে কি আন্দোলন তা জানবার উপায় নেই। কৃষক চলতে-চলতে একটা অশথ গাছের পাশে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়াবার ইচ্ছা তার ছিলনা। কারণ তার গন্তব্য আর একটু আগে। কিন্তু তাকে দাঁড়াতে হল। কেন?

তার কারণ আছে।

সে এক আশ্চর্য্য জিনিষ দেখল।

সাধু দেখেছে, সন্ত দেখেছে সে জীবনে অনেক। এ যুগে সাধু-সন্তের অভাব নেই। নিত্য যখন যন্ত্রণা তখন সাধু-সন্তের করুণা ভিক্ষা করা ছাড়া মানুষের আর কিই-বা আছে! মানুষের মনের সে অবস্থাটা সাধুরা জানে। তাই গেরুয়া পরে দলে দলে সন্ন্যাসী আসে রোজ—। শুধু ভিক্ষা নয়, মানুষের শ্রদ্ধা আর কত কিছু নিয়ে যায় তারা। কিন্তু বিনিময়ে যা কাম্য সেই শান্তি বা ঈশ্বরের করুণা দিতে পারে না। বঞ্চিত মানুষেরা আবার তাকায় নতুন সন্তের দিকে। নতুন আবির্ভাবের সম্ভাবনায় পথ চেয়ে থাকে।

মানুষের দুঃখের অন্ত নেই। তাই জ্যোতিষী হাজার হাজার। রাজধানী গৌড় থেকে সাধারণ মানুষের দুনিয়া পর্যন্ত ছেয়ে আছে তারা। রাজপুরুষ থেকে সামান্য গৃহী, কে না যায় তাদের কাছে ভাগ্যের জটিল বন্ধন খুলে একটু সুখ শান্তির দিনের ইঙ্গিত জানবার জন্য, আশ্বাসের অন্ত নেই। কিন্তু কখনো সত্য হয় না তাদের ভবিষ্যৎ-বাণী। কখনো কখনো সত্য হলেও শান্তি কোথায় মানুষের মনে?

না সাধু, না সন্ত, না দরবেশ, না জ্যোতিষী, কেউ শান্তি দিতে পারেন না! যে শান্তি আর সুখকে নিয়ে তাদের ব্যবসা, সে শান্তি আর সুখ তাদের নিজেদেরই আছে বলে মনে হয় না। সুখ যদি বা কারো কারো থেকে থাকে—শান্তি নেই। শান্তি নেই সেটা তাদের মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

বহু বিদ্যা নয়, বহু জ্ঞান নয়, অন্তরের অনুভূতিতেই বুঝি সেই পরম সত্যকে জানা যায়। শান্তির মুখ আলাদা। সে মুখের ছবি কোনদিন নজরে পড়েনি, যে মুখের দিকে তাকিয়েই মনে হয়—স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ।

কিন্তু এ তবে কে?

এর মুখে বৃক্ষের ছায়া, শিশিরের স্নিগ্ধতা এল কোত্থেকে?

বিস্মিত কৃষক লাঙল কাঁধ থেকে নামিয়ে এগিয়ে গেল।

তিনি ছুটো চোখের পাতা বুজে বসে রয়েছেন। কুমোরের হাতে গড়া মহাদেবের মুখের মত প্রশান্তিতে ভরা এই মুখ।

কৃষক আপন অজ্ঞাতসারেই ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাকে প্রণাম করল: আপনি কে প্রভু?

তাঁর ঘন ছুটি চোখ মেলে ধরলেন তিনি। বিরক্তি নেই, হাসিও নেই, শুধু শান্ত, শুধু শান্ত।

তিনি বললেন: আমি মানুষ।

আপনাকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলে বোধ হচ্ছে, আপনি কি বর্ণ?

তিনি হেসে বললেন: আমার বর্ণ নেই। আমি শুধু মানুষ।

—আপনার কি আশ্রম?

তিনি আবার হেসে বললেন: এই জীবনই আমার আশ্রম।

কৃষক তাঁর হেয়ালীর অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারল না। তবে সে অনুভব করল যে ইনি বড়, অনেক বড়। বলল: প্রভু আমাকে ছলনা করবেন না—বলুন আপনি কে?

তিনি যথারীতি হেসে বললেন ছলনা আমি জানি না। আমি মানুষ, শুধু এইটুকু ছাড়া আমি আর কে, একথাও জানি না।

কৃষক বলল: আপনি সামান্য মানুষ নন। নিজেকে লুকাতে চাইছেন।

তিনি বললেন: আমি মানুষ। অত্যন্ত সামান্যই মানুষ। আমাকে যেমন দেখছ ঠিক তেমনি।

কৃষক বলল: বহু মানুষ আমি দেখেছি—আপনি তাদের মত নন। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

তিনি বললেন: শান্তি হোক তোমার।

কর্মের আহ্বান আছে, তাকে অস্বীকার করলে চলবে না। কৃষক আবার মাঠের দিকে চলল। কিন্তু তার মনে কি এক ছবি গেঁথে গেছে তা আর উঠবার নয়। সে শুধু সে কথাই চিন্তা করতে লাগল। ইনি কে? ব্রাহ্মণ সন্তান? যদি তা হতেন তবে কৃষককে দেখে চমকে উঠতেন। কারণ কৃষকের ত্রিসীমানায় ব্রাহ্মণকে থাকতে নেই। ছায়া মারালে জাত যাবে। ইনি সন্ন্যাসী? যদি হন, তবে গেরুয়া কোথায়? আর সন্ন্যাসীদের মত ব্যবহারই বা কই? 'বাবা দীর্ঘজীবি হও, ধনপুত্রে বৃদ্ধি লাভ কর' বলেতো হাত পাতলেন না? কমণ্ডুল বা ভিক্ষা পাত্রই বা কোথায়?

তবে কি ইনি মুসলমান ফকির?

তাহলে ফকিরের পোষাক কোথায়?

তবে ইনি কে? কোন পলাতক রাজপুত্র কি?

কিন্তু রাজপুত্র যদি হবেন, তবে এর মুখে এই প্রশান্তি এল কোথেকে?

কৃষক চিন্তা করে কিছু স্থির করতে পারল না। একটা সমস্যাতে কেনই যেন বারে বারে নিজেকে বিব্রত বোধ করতে লাগল। অবশেষে কাজ সমাধা হবার আগেই আবার বাড়ীর দিকে ফিরতে লাগল।

এল সেই পথ দিয়েই, সেই অশথ বৃক্ষের নীচে।

কিন্তু কৈ? তিনি কোথায়?

তিনি চলে গেছেন।

নিতান্ত হতাশ হল কৃষক। কিন্তু বিরাট এক কৌতূহল অনুভব করল। তাড়াতাড়ি গ্রামের দিকে ছুটল। এ এক বিরাট খবর। এ খবর সবাইকে দিতে হবে।

শুনে হেসে অনেকে উড়িয়েই দিল। কেউ বলল: পাগল না হয় মাথা খারাপ। হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল। কত সাধু সন্ন্যাসী এল গেল—স্বয়ং শ্রীমৎ পরমানন্দজী কিছু করতে পারলেন না! —তা আবার কে না কে? কিন্তু আবার কারো কারো মনে সাড়া তুলল: হতেওতো পারেন কেউ! ভগবান পাপীতাপীকে পরিত্রাণ করবার জন্য কখন কাকে পাঠান কে বলতে পারে।

যে নিন্দে করতে লাগল সেও, যে বিশ্বাস করল সেও—সকলেই গোপনে গোপনে খোঁজ করতে লাগল। অন্তর্দাহের অভাব কি? সকলেই ভুগছে। দৈব ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির সাহায্য কে না চায়!

প্রথম যে দেখেছিল মনোক্ষুন্ন হল সেই বেশী। নিজের চোখকে সে কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারছে না। তার শুধু অভিমান, অধমকে ছলনা করলেন কেন প্রভু।

দিন গেল, মাস গেল, আর তাঁর দেখা নেই। কথাটাকে মনের স্মৃতি থেকে মুছেই ফেলল অনেকে। এ নিয়ে বিদ্রূপ, তিরস্কার অবিশ্বাসের আর কিছু থাকল না। শুধু যে দেখেছিল সে ভুলতে পারল না।

অকস্মাতের ব্যাখ্যা নেই। হঠাৎ সেদিন আবার দেখা মিলল হাটের পথে। এখানে এমন ভাবে তাঁকে দেখবে ভাবতে পারেনি সে। এবার কোন অশথ গাছের নীচে নয়, একটি আমগাছের গুড়িতে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন তিনি। গেরুয়া, জটা, ত্রিশূল, কমণ্ডুল কিছু তাঁর ছিল না—আজো নেই।

তাঁকে হঠাৎ ওভাবে দেখতে পেয়েই যেন বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল কৃষকটির। তাড়াতাড়ি প্রায় সে ছুটে এগিয়ে গেল। মাথার ঝুরি নামিয়ে হাত জোড় করে সামনে বসল। তিনি তখন হাসছেন। সে হাসিতে কোন বিদ্রূপের ছোঁয়া নেই, তিরস্কারের তীক্ষ্ণতা নেই, ভণ্ডামীর আভাষও নেই। স্নিগ্ধ নিরুত্তেজ, অথচ জ্যোতির্ময় হাসি।

সে বলল: প্রভু হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার ছলনা করলেন কেন? আপনাকে কত খুঁজেছি।

তিনি বললেন: প্রভু কেন, বল মানুষের সন্তান, বল ভাই।

—না আপনি অনেক উর্দ্ধে—আপনি দেবতা।

—দেবতা আছেন কিনা জানি না। যদি থাকেন মানুষের মধ্যেই তিনি। মানুষকে দেবতা বললে মানুষের মধ্যে যে দেবতা তাঁকে অপমান করা হয়। আমি মানুষ। আমাকে ভাই বলে ডাক?

কিন্তু মন থেকে ভাই বলে ডাকবার সাহস কিছুতেই যেন সে পেল

না। তাই কোন সম্বোধন না করে বলল : আপনি দেখা দিয়ে আবার কোথায় লুকিয়ে ছিলেন ?

তিনি বললেন : লুকোব কেন ; জীবনের সাধনায় ব্যস্ত ছিলাম।

কৃষকটি তার অনাবিল শান্তির উৎস সেই মুখটির দিকে তাকিয়ে দেখল। ইতিমধ্যে আরো লোকেরা চলেছিল হাটের পথে। দুএকজন ওঁদের দেখে থমকে দাঁড়ালো।

পরিচিত কেউ কৃষকটিকে ডাকল : কিরে, তুই ! ইনি কে ?

আনন্দের জ্যোতিতে তখন কৃষক সন্তানটির মুখও ভরে গেছে। সোল্লাসে সে চেঁচিয়ে উঠল : ইনিই সেই।

সে কথা তখন অনেকেই ভুলে গেছে।

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে তাকাল তারা, কে ?

ইতিমধ্যে লোক দেখে আরো লোক জড় হয়েছে।

ওরা বলল : কে ?

কৃষকটি বলল : কেন মনে নেই সেই যাঁর কথা বলেছিলুম ! সেদিন সকালে যার দেখা পেয়েছিলুম ?

তিনি কিন্তু স্নিগ্ধ হাসির ছটা ছড়িয়ে দিয়ে তেমনি নিরুত্তাপ শান্তি নিয়ে বসে আছেন।

মনে পড়ে গেল অনেকেরই ঘটনাটা। কৌতূহল আরো ঘন হয়ে এল। ওরা সকলে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল : সত্যি অপূর্ব শ্রী। একটা ইন্দ্রিয়াতীত লাবণ্যে যেন ভরে আছে।

শ্রদ্ধা আপনি হৃদয়ের উৎস থেকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সেই অপ্রত্যাশিত অতিথির পাদদেশে ঝরে পড়তে লাগল।

বহু প্রণাম তিনি কোন রকমে থামিয়ে বললেন : আহা আহা কর কি, কর কি। আমি মানুষের সন্তান। আমি দেবতা নই, সাধু নই, সন্ন্যাসী নই।

অভিভূত দৃষ্টিতে অনেকেই তাঁকে তাকিয়ে দেখল। বলল : আপনি কে সে আর জানতে চাই না। আপনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়।

তিনি হেসে বললেন : কি করে বুঝলে ?

—আপনার মুখ দেখে।

—মুখে আমার কি আছে ?

—আছে শান্তি, আছে আশ্বাস।

—কিসের আশ্বাস ?

—জীবনে দুঃখ বেদনার হাত থেকে মুক্তি পাবার আশ্বাস।

তিনি কোন কথা বললেন না।

ওরা বলল : প্রভু, যদি দয়া করে দেখা দিয়েছেন তবে বঞ্চনা করবেন না। চলুন।

তিনি বললেন : প্রভু বোল না, বল মানুষের সন্তান। কোথায় যাব আমি ?

—আমাদের কাছে।

—কি করব ?

—আমাদের কাছে থাকবেন। আমরা আপনার অমর্যাদা করব না।

তিনি বললেন : আমি জানি, কোন মানুষ মানুষের সন্তানকে সহজে অপমান করেন না। কিন্তু আমি সেখানে থেকে কি করব ?

—আমাদের উপদেশ দেবেন।

তিনি বললেন : মানুষকে জীবনের সত্য রূপ বোঝানই আমার সাধনা। কিন্তু সেজন্য মানুষকে ঠকিয়ে গুরুগিরি করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

ওরা বলল : আপনি ঠকাবেন কেন। আপনাকে কাছে পেলে আমরা সব দিক থেকে কল্যাণের সন্ধান পাব।

—কিন্তু নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে কারো সাথে থাকতে আমি রাজি নই। জীবনের অভিজ্ঞতায় যে সত্যের সন্ধান আমি পেয়েছি তার মধ্যে কর্ম্মও একটি। আমাকে কি কাজের অধিকার দেবে তোমরা ?

—আপনি আমাদের শিক্ষা দেবেন।

—যে সত্য জীবনে অনুভব করেছি—সেই টুকু দিতে পারি, তার বেশী নয়।

—আপনি আমাদের মন্দিরে পূজো করবেন।

তিনি হেসে বললেন : আমি পূজারী নই। মন্ত্র জানি না।

সেকি! সকলে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। আপনি আমাদের বঞ্চনা করতে চাইছেন!

—না। রীতি আচারে যে পূজো, তা আমি জানি না। কিন্তু যে পূজা সত্যিকারের ঈশ্বরের সন্ধান দেয় সে পূজা আমি জানি। যে মন্ত্র সত্যিকারের মন্ত্র তা আমি জানি।

ওরা বলল : আপনি সেই মন্ত্রেই আমাদের পূজা করবেন। চলুন।

তিনি বললেন : আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।

হাট ফেরত সকলে তাঁকে ধরে নিয়ে গাঁয়ে ফিরল।

চণ্ডীতলার বারান্দায়—তার জন্য হল বিশেষ ঠাঁই।

সাধু নয়, সন্ত নয়, ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, নামগোত্রহীন এই নতুন অতিথিকে দেখে মন্দিরের পুরোহিত অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু গাঁয়ের লোকের আগ্রহের কথা শুনে তিনি প্রতিবাদ করতে সাহস পেলেন না।

সন্ধ্যাবেলা লোকেরা ঘিরে ধরল তাঁকে; আমাদের ধর্মের কথা বলুন।

—কোন্ ধর্ম্ম?

—হিন্দু ধর্ম্ম।

তিনি বললেন: বিশেষ কোন ধর্ম্ম নেই। জগতে একটি মাত্র ধর্ম্ম আছে, সেটা ভালোবাসার, প্রেমের।

এত বড় কথা লোকে বড় শোনেনি। কিন্তু বক্তার বলার মধ্যে এমন একটা আত্মপ্রত্যয়ের স্থর আছে, আর এত মোহময় কণ্ঠে তিনি বলেন যে, তাকে অস্বীকার করা যায় না।

ওরা বলল : সে ভালোবাসা কি করে পাওয়া যায়?

তিনি বললেন : দুঃখের মধ্য দিয়ে, জীবনের মধ্য দিয়ে।

—কোন শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করবার প্রয়োজন নেই?

—নেই।

—তবে?

—নিজেকে পাঠ করো। প্রতিপদে নিজেকে বিচার কর। জীবনের পাঠই বড় পাঠ।

—তাতেই মুক্তি লাভ করা যাবে ?

—যাবে।

—ভগবানকে ?

—তাও পাওয়া যাবে।

—জীবনে কোন পথে চলব ?

—সত্য পথে।

—সত্য পথ কি ?

—নিজের বিবেকের নির্দেশ পালন করা।

—বিবেক যদি অন্যায় করতে বলে ?

—কখনো করবে না।

—তবে লোকে ভুল করে কেন ?

—নিজের বিবেকের নির্দেশ সে ধরতে পারে না বলে। প্রতিপদে মনে রাখতে হবে একজন আমাদের উপরে আছেন। উপরে কেন, তিনি সর্ব্ব সময় পাশে পাশে আছেন। প্রত্যেকটা কাজ তাঁর ইঙ্গিতে হচ্ছে, আর সবটাই মঙ্গলের জন্য। কাজটা তিনি করান। কাজের অর্থটা আমাদের ধরতে দেন। সেই অর্থটুকু ধরে যিনি নিজেকে জানেন তিনি লীলা শেষ করে তাঁকে আনন্দ দেন এবং নিজেও পান।

—তিনি যদি সবই মঙ্গল করেন, তবে আমরা দুঃখ পাই কেন !

—মঙ্গলের জন্য।

—মঙ্গলের জন্য !

—হ্যাঁ, তাই। সবচেয়ে যিনি বড় দুঃখ পান, তিনিই বড় সত্যের দিকে এগিয়ে যান। যে যত বেশী দুঃখ পান তত দুঃখবিহীন এক আনন্দময় জগতের দিকে এগিয়ে চলেন।

—কোন্ শাস্ত্রে একথা লেখা আছে ?

—জীবনের শাস্ত্রে। নিজের জীবনকে পাঠ কর। প্রত্যেকটি কাজের অর্থ হিসাব কর। তবেই বুঝবে। তবেই বুঝবে, পৃথিবীতে অমঙ্গলপূর্ণ কিছু নেই। অর্থহীন কিছু নয়।

—জীবনে তো কত ঘটনাই ঘটে, সে ঘটনা থেকে সে বোধ আসে কই ?

—সে বোধ আসবে যদি বিশ্বাস থাকে।

—কার উপর বিশ্বাস ?

—একজন কেউ আছেন, তিনি কখনো অমঙ্গল করেন না। তিনিই সব করান। ভাল মন্দ সমস্ত কাজের দায়িত্ব যখন তাঁর উপর ছেড়ে দেবে, সবই তিনি করাচ্ছেন যখন এই বোধ আসবে, তখন দেখবে দুঃখ নেই। তখন জীবনটাকে অর্থময় মনে হবে। মরনটাকেও তাই মনে হবে।

—কোন্ শাস্ত্রে এটা লেখা আছে ?

—শাস্ত্র জানিনা, তবে জীবনের অনুভবে একথা সত্য। শাস্ত্র পাঠে কিছু হয় না যদি না জীবনের অনুভব কোন সত্যকে ধরতে পারে। তাই পুস্তক পাঠ নয়, জীবন-চর্চাই সব চেয়ে বড় সত্যবোধ দিতে পারে। পরমের সাধনা মানে জীবনেরই সাধনা। জীবনের মধ্য দিয়েই জীবনাতীতের সন্ধান মেলে। যে তা পায় না তার সাধনাই ব্যর্থ। আমি শুধু এক কথাই জেনেছি…জীবন সত্য, জীবনের মধ্য দিয়ে চিরজীবনের যে অনুভব তাই সত্য ধারণা। শুধু নিজেকে ধৈর্য ধরে বিচার কর। ‘ধৈর্য ধর, বিচার কর, নিজেকে জান।’

—আমরা মূর্তি পূজা করি তার মধ্যে তিনি আছেন ?

—যদি বিশ্বাস করো, সুখ দুঃখ সমস্তই তাঁকে অর্পন করো, তবে তিনি আছেন।

—যারা মূর্তি পূজা করেন না তাদের ভগবান আছেন ?

—আছেন।

—তিনি কোথায় থাকেন ?

—বিশ্বাসে।

—আল্লা-ভগবান এদের মধ্যে প্রভেদ আছে ?

—না।

—হিন্দু-মুসলমানে ?

—না।

—তবে এতকাল ধরে লোকে যে এ সব বলে এসেছে ?

—জীবনকে অনুভব করেনি বলে। হিন্দু-মুসলমান, ধর্মাধর্ম, জীবনকে সাধনা করে উপলব্ধি যারা করেনি তাদের জন্য। জীবনসত্য যাঁরা

অনুভব করেছেন, তারা সবাই এক। জীবনসত্যকে যিনি অনুভব করেছেন, তাঁর লোভ নেই, ঘৃণা নেই, বিদ্বেষ নেই, ক্রোধ নেই, মোহ নেই, মাৎসর্য নেই, কাম নেই। সবার মধ্যেই তিনি আছেন অথচ এদের কেউ তাঁকে বাঁধতে পারে না।

—এত রিপু। সবাই এর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে না ?

—সবাই পারে।

—সবাই !

—হ্যাঁ।

—কি ভাবে ?

—শুধু বিশ্বাসে।

—কার উপর ?

—তাঁর উপর। ভগবানের উপর।

—কি ভাবে সেই বিশ্বাস আনতে পারব ?

—নিজের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাকে প্রতিনিয়ত বিচার করে দেখলেই আনা যাবে।

—পাপ আছে ?

—হ্যাঁ।

—পাপ কি ?

—অজ্ঞতা।

—অজ্ঞতা কি ?

—নিজেকে না জানার দরুন ভগবানের উপর যে অবিশ্বাস তাই অজ্ঞতা।

—পুণ্য কি ?

—নিজেকে চর্চা করে আমাদের উপর যিনি আছেন তাঁকে বোঝাই পুণ্য।

—দান ধ্যানে কোন পুণ্য আছে ?

—না।

—নেই !

—না। যদি সে দান ধ্যান কেউ নিজে করেন বলে মনে করেন

তবে তার কোন মূল্য নেই। যদি কর্তব্য বলে করা হয় তবে পুণ্য আছে।

—সেই পুণ্য কি?

—কর্ম্ম।

ওরা বলল: আমরা অত কিছু বুঝি না, বুঝতে পারি না। আমরা শুধু মুক্তি পেতে চাই দুঃখ থেকে। আমরা ভগবানের করুণা চাই। কি করে তা পাব তাই বলুন।

—নিজেকে চর্চা করলেই তা পাবে।

—নিজেকে কি করে চর্চা করব বলে দিন।

তিনি বললেন: হ্যাঁ, সেটাই প্রশ্ন। কোন শাস্ত্র বাক্য তুলে উপদেশ দিলে হবে না। মহাপুরুষের জীবনী ব্যাখ্যা করলে তাতেও নয়। নিজের জীবনের উপলব্ধ সত্য ব্যাতিরেকে কেউ কোন শিক্ষা দিতে পারে না।

একজন বলল: আপনি কি নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে উপলব্ধি করেছেন?

—হ্যাঁ।

—তবে দয়া করে আপনি সেই সত্য আমাদের বলুন।

তিনি বললেন: আমি বিনা দ্বিধায় সেই সত্য তোমাদের কাছে বলছি শোন। কিন্তু গৃহচুড়ে উঠতে গেলে যেমন মইয়ের ধাপ বেয়ে উঠতে হয়, তেমনি জীবনসত্যকে জানতে হলে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে যেতে হয়। সেই স্তরের মধ্যেই থাকে মানুষের ভুল ত্রুটি দুঃখ বেদনা এই সব। সূর্য উঠবার আগে পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে—তাই অন্ধকারকে যেমন আমরা ভয় করি না, তেমনি জীবন সত্যে পৌছুবার আগে আমাকে অনেক অন্ধকার, অনেক লজ্জা ত্রুটির মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে। জীবন সত্যের পথে আমি যখন সেই স্তরগুলি ব্যাখ্যা করব, তোমরা যেন কেউ ঘৃণা বা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিও না। অন্ধকারের পরে যেমন আলো, ত্রুটির পরে তেমনি আছে পরিপূর্ণতা। তোমরা শুধু আমার কাহিনীটুকু শোন। এবং সেই কাহিনীর মধ্যে যে সত্যে উপনীত হয়েছি তা অনুভব করবার চেষ্টা কর।

সন্ধ্যার অন্ধকার এক মায়াময় পরিবেশ রচনা করেছে মন্দির প্রাঙ্গনে। প্রদীপের আলো থেকে স্নিগ্ধ আলোর ছটা আসছে। নতুন অতিথির স্নিগ্ধ মুখখানা স্নিগ্ধতম দেখাচ্ছে। গভীর কৌতূহলে সকলে নিবিড় হয়ে বসে বক্তার মুখের দিকে তাকাল।

তিনি বললেন: আমি এক মানুষের সন্তান। আমার বাবার কর্ম্ম ছিল-পুজো করা।

একজন বলল: আপনি তাহলে ব্রাহ্মণের সন্তান?

তিনি বললেন: না। আমি মানুষের সন্তান। আমি মানুষ। আমি মানুষের মধ্যেই তাঁকে জেনেছি। যে জীবনে আমি তাঁকে জেনেছি, সেই জীবনের কাহিনী মাত্র আমি শোনাতে পারি।

আর একজন বলল: আপনি বলুন আমরা শুনব। আর প্রশ্ন করব না।

তিনি আবার বলতে লাগলেন: আমি যেদিন চোখের দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখতে শিখলাম সেই দিন এই বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুকেই আমার ভাল লাগল। আকাশের নিবিড় নীল নীলিমা, মৃত্তিকার সবুজ সমারোহ, পশু পাখী ফুল ফল, সব কিছু। আমার যেন মনে হত সব আমি। সবই আমার খেলবার জন্য। আমি একাত্মভাবে এই প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যেতুম। আমার আত্মীয় স্বজন, মা বাবা কারো কথা আমার মনে পড়তো না। শুধু আমি তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। দেখতুম। আর আমার মনে হত, এই সব কিছু যদি আমি তৈরী করতে পারতুম! এই সব কিছুকে নিজে সৃষ্টি করে উপভোগ করবার মধ্যে যেন আরো বেশী আনন্দ। তাই আমি তুলি নিয়ে চিত্র আঁকতুম, মাটী দিয়ে পুতুল তৈরী করতুম। আর আমার কি মনে হত জান, আমাদের দেয়ালে ছিল ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের ছবি টানানো। তাঁর সেই লাবণ্য ভরা মুখখানা আমার বড় ভাল লাগত। আমি আপন মনে তাঁর সঙ্গে কথা বলতুম। আমার যেন মনে হত আমি তাঁকে পাব। ছোট বেলাতেই মা বাবার কাছে তাঁর কত গল্প শুনতুম। এই বিশ্বে তাঁর কাছে যখন যা চাওয়া যায় তাই নাকি পাওয়া যায়। আমি তাঁর কাছে কি চাইব! আমার তো তখনো খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল না।

তাই তাঁর কাছে চাইতুম অভয়। সন্ধ্যার পর গাঢ় অন্ধকার পৃথিবীতে নেমে এসে যখন আলো ঢেকে দিত, তখন আমার কি অজানা এক ভয়ের শিহরণ লাগতো। আমি বলতুম, তুমি আমার পাশে থেকো, আমাকে ভয় থেকে মুক্তি দিও।

আর ভয় করতুম আমি মৃত্যুকে। আমার মনে হত, যদি কখনো মরে যাই! মরে গেলে এই পৃথিবীর ফুল ফল, পশু পাখী কিছুইতো আর দেখতে পাব না। তাই তাঁকে বলতুম—আমাকে যেন এই সুন্দর পৃথিবী থেকে তুমি কখনো মৃত্যুর কবলে টেনে নিও না। তখন ছোটবেলা রামায়ণ মহাভারতের গল্প শুনে শুনে আমার মৃত্যু-লোক সম্বন্ধে বড় ভয় হয়েছিল। সেখানে সব ভীষণ দর্শন যমদূতেরা আছে। যদি কখনো তাদের কাছে গিয়ে পড়ি তবে না জানি কি হবে। তাই বলতুম; ঠাকুর তুমি পাশে থেকো। কখনো যেন যমের দূতেরা আমাকে টেনে নিয়ে যেতে না পারে। যুধিষ্ঠির যেখানে স্বর্গে গিয়েছিলেন, যে স্বর্গে ইন্দ্রের নন্দন পারিজাত কানন আছে মরলে যেন সেখানেই যেতে পারি। যেখানে ফুল আছে, পশু আছে, পাখী আছে, সে এক অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার; যেন সেখানেই যেতে পারি।

জনৈকা কৃষক গৃহিনী শুনে বলল: আহা গোপাল তোমাকে কৃপা করেছেন। তাই এমন সুন্দর লাবণি ভরা মুখখানা বাছার আমার।

কালো এক কৃষক কন্যা পাশে বসে ছিল। বলল: তুমি চুপ্ করো দিদিমা, শুনতে দাও। গভীর কৌতূহলের চোখ তুলে সে নতুন অতিথির মুখের দিকে তাকালো।

সাধুর মত কথা নয়। দরবেশের মত ত নয়ই। একটা অতি প্রাচীন বৃদ্ধের মুখ থেকেও উপদেশ বাণী আসছে না। তবু যেন সমবেত জনতা সকলে হতাশ হল না। এ নতুন পথ। জীবনের মধ্য দিয়ে সত্য কেমন করে আসে জানবার কৌতূহল। বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রচারের মত সেই ধর্ম্মের কথা এর মুখ দিয়ে নিস্থত হবে কে না কি জানে। যত আশা, যত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সকলে এসেছে, সব সফল হবে কিনা সে প্রত্যাশা আরম্ভ থেকে সঠিক করা যাচ্ছে না। তা না হোক, একটা মস্ত

কথক ঠাকুরের মত বড় সুন্দর বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে পারেন নতুন মানুষটি। চলতি পথ নয় সম্পূর্ণ নতুন, অথচ শুনতে ভাল লাগে। সমবেত মানুষের মধ্যে একটু চাপা গুঞ্জরণ। নতুন অতিথি তা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না। আবার বলতে লাগলেন। কি এক গভীর আত্মবিশ্বাস থেকে তিনি বলছেন। তিনি যেন জানেন—সবাই শুনবে। তাই আবার বলতে লাগলেন:

এমনি যখন দিন কাটছিল—তখন হঠাৎ আমার জীবনে এল বিপর্যয়। একদিন আবার মা মারা গেলেন।

বৃদ্ধা কৃষক-পত্নী সমবেদনা দেখালো: আহা: বাছারে আমার!

একজন বৃদ্ধ কৃষক পাশ্ববর্ত্তীকে বললেন: ভগবান যাদের ডাকেন তারা প্রায়ই মাতৃহারা হন। বুদ্ধদেবের মা ছোটবেলাই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। মৌলানা সাহেবেরা বলেন—ছোট বেলা পয়গম্বর মা বাবা সবাইকে হারিয়েছিলেন।

একজন বলল: আহা: শোন উনি কি বলছেন। দেখছোনা কেমন উজ্জ্বল মুখচোখ! তিনি অবশেষে অনেক ভাল কথা বলবেন।

সকলেই শুনতে লাগল।

উনি বলে চললেন: আমি কাঁদলুম। কিন্তু খুব কাঁদতে পারলুম না। কারণ আঘাতের তীব্রতাটা তত হিসেব করে বুঝবার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমি আমার পিতার একই মাত্র পুত্র। ভাই বোন আর কেউ নেই। আমাকে দেখবার জন্য যে আর কেউ থাকলেন না—এটা আমি বুঝতে পারলুম না। আমি জানতুম প্রকৃতি আছে, পাখী আছে, ফুল আছে, প্রজাপতি আছে। আমি জানতুম খেলার শেষে আমাকে কেউ খাইয়ে দেবেই। সুতরাং···কিন্তু সেদিনের দুঃখের কথা আজ আর ভাল করে মনে নেই আমার।

বাবা আমার জন্য এক বুড়ী দাই রেখে দিয়েছিলেন। আমি তার হাতেই মানুষ হয়ে গড়ে উঠলুম। আমার হাতেখড়ি আগেই হয়েছিল। একদিন টোলে ভর্তি করে দিলেন বাবা।

সেই দিনের কথা আমার আজো বেশ মনে পড়ে। সেদিন আমার কি ভয়। কি সঙ্কোচ। আমার পরিচিত দুনিয়া—ছোট্ট বাগিচা,

দোয়েল পাখীর বাসা—, রাঙা ঝুমকা জবার দোল্না, পাখী, প্রজাপতি এইসব ছেড়ে বাইরে যেতে আমার বড় ভয় হচ্ছিল। আমাদের গৃহ ছিল গ্রামের এক প্রান্তে। ছোট বেলা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিনি। শুধু মাত্র একা থেকেছি। তাই মানুষের মধ্যে যেতে ছিল আমার বড় সঙ্কোচ, ভয়।

আমার সেদিন মনে হয়েছিল, বাবা বড় নিষ্ঠুরের মত আমাকে কোন এক যন্ত্রনাদায়ক কারাগারের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। সব ছেলের দল, তাদের দুষ্ট হাসি, সব যেন আমাকে বিদ্রূপ করবে সেখানে গেলে। সেই পাঠশালার কথা শুনে আমার কান্না পেতে লাগল। কিন্তু বাবা ধমকে উঠ্‌লেন। কোন কথা শুনলেন না। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে আমি যদি লেখাপড়া না শিখি তবে ব্যবসা নষ্ট হবে। সমাজের কাছে মর্যাদা পাব না। সুতরাং ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে যেতে হল। সেই একদল ছেলে আর টেকো মাথা পণ্ডিত মশাইকে দেখে আমি বড় ভয় পেয়ে গেলাম।

শুনে সেই কালো মেয়েটি ফিক্ করে হাসল।

কেউ কেউ হতাশ হল। এর মধ্যে ধর্ম্ম, জীবনবোধ কোথায়?

কিন্তু বক্তার উজ্জ্বল দৃষ্টির মধ্যে এমন তন্ময় ভাব যে, অবশেষে একটা জীবনবোধের আশ্বাসের কথা কেউ সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করতে পারল না।

সেই সৌম্য নতুন অতিথি বলতে লাগলেন: আমার চোখ দিয়ে প্রায় জল গড়িয়ে পড়ল।

পণ্ডিত মশাই বাবাকে দেখে বললেন: আজ সময় ভাল নেই। আজ ভর্তি করব না। তুমি ওকে কাল পাঠিয়ে দিও। ব্রাহ্মণ মানুষ দিনক্ষণ বিচার করে কাজ করতে হয় এটাও জাননা!

বাবা একটু লজ্জিত হলেন। আমাকে নিয়ে ফিরে এলেন।

আমি ভাবলুম, কোন দিনটাই যদি পাঠশালায় যাবার পক্ষে ভাল না হত! আমাকে যদি আমাদের গৃহের সেই শ্যামল আঙিনাটুকু কখনই ত্যাগ করতে না হত!

পরদিন বাবা যেতে পারলেন না। তালপত্র হাতে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন একা। আমার মনে মনে কান্না পেতে লাগল। ঐ

অপরিচিত পাঠশালায় একা আমি কিছুতেই যেতে পারব না। কিন্তু না গিয়ে কোন উপায় ছিল না। বাবাকে আমি জানতুম। তিনি ভয়ানক বদমেজাজী। না গেলে আমাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করবেন। সুতরাং সজল চোখে, দুরু দুরু বক্ষে, এগিয়ে চললুম।

সেই অপরিচিত একদল দুষ্ট ছেলের সামনে আর ভয়ঙ্কর গুরুমশায়ের কাছে আমি মুখ তুল্‌তে পারলুম না। কথা বলবার শক্তি আমার ছিলনা।

গুরুমশাই কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন: তোর নাম কি?

আমি বললুম: মগন।

বিকৃত কণ্ঠে গুরুমশাই ধমকে উঠলেন: ওটা আবার নাম হল নাকি! ভাল নাম বল।

আমি প্রায় কেঁদে ফেললুম। বললুম: ভাল নাম আমি জানি না।

গুরুমশাই আবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন: তুমি একটি গর্দ্দভ।

সেই কালো মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে উঠতে গিয়ে থেমে গেল।

এর মধ্যে ধর্ম্ম কোথায়? কিন্তু গল্পের আমেজ আছে তাই সকলে বিরক্ত হলনা। আর তা ছাড়া বক্তার চোখে এক দিব্য ঔজ্জ্বল্য।

তিনি বলে চললেন: গুরুমশাই ধমকে আমাকে ফেরৎ পাঠালেন: যা ঘরে যা। অন্নপ্রাশনের দিনে যে নাম রাখা হয়েছিল সেই নাম জেনে আয় গে।

নাম জিজ্ঞেস করতে বাবার কাছে যাবার সাহস আমার ছিল না। তাই যে ঘরে বুড়ীমা বসে পুজো করছিলেন সেই ঘরে তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম। আমার ভালো নাম তারো জানবার কথা নয়। জানতেন মা। কিন্তু তিনি ইহলোকে নেই। বুড়ীমা তখন গোপালের পট মুছছিলেন; কি মনে এল, বলে দিলেন: যা, বলগে তোর নাম গোপীবল্লভ।

একজন বৃদ্ধ শুনে বললেন: আহা ঠিক যেন ব্রজের ঠাকুরটি আমার। বুড়ীমা ঠিকই নাম দিয়েছিলেন।

সেই কালো মেয়েটি শুধু ঝিলিক দিয়ে একটু নীরব হাসি হাসল।

তিনি বলে চললেন: সেই নাম নিয়ে আমি ভর্তি হলুম পাঠশালায়। কিন্তু সহজে যেন সে জীবনকে গ্রহণ করতে পারলুম না আমি। কতদিন আমার লেগেছে ঐ ছোট্ট ঘরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য।

কতকগুলো বাধা-ধরা নীতি, একটি ঘরের মধ্যে সারাদিন কাটানো, কিছুতেই যেন আমি একে গ্রহণ করতে পারছিলুম না। কিন্তু অবশেষে যখন বর্ণপরিচয়ের শেষে 'নীতিকথা মালা' পাঠ করতে দেওয়া হল আমাকে, আমি আনন্দ পেলুম। গল্প আমার ভাল লাগল। ফলে আমি হলুম সকল ছেলেদের মধ্যে সেরা। গুরুমশাইও অবশেষে আমাকে ভালবাসতে লাগলেন। আমি একদিনে নীতি কথামালা শেষ করে তাঁর কাছে পড়া দিলুম। খুশী হয়ে গুরুমশাই আমার পিতৃদেবকে জানালেন। আমার নিজের কৃতিত্বে সেই দিন আমার ভাল লাগল। আমার মনে হল, ঐ নীতিকথার গল্পমালার মত আমিও যেন গল্প লিখতে পারি। তাল পাতায় কলমের আঁচড় কেটে আমি গল্প লেখবার প্রয়াস পেলাম। একদিন দেখে গুরুমশাই হাসলেন। কিন্তু বাবাকে বললেন: তোমার পুত্র কালে বড় হবে। ও কবি হতে পারবে। তখন কবিদের কত কদর। আমাদের দেশে ও গৌড়ে কত কবির নাম ছিল। রাজ দরবারে কতজন সুলতানের খিলাৎ লাভ করেছিলেন। আমার মনে স্বপ্ন জাগল, আমিও কখন এমন খিলাৎ পাব—আর আমার চতুষ্পার্শের মানুষেরা কত কৌতূহলে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখবে। কিন্তু···

এমন প্রাণের আবেগ দিয়ে গল্প বললেন তিনি যে, শুনতে মন্দ লাগে না। একটা বিরাট প্রামাণ্য বিষয়কে আড়াল করে তিনি গল্প বলছেন। গল্প কি ভাবে সেই প্রামান্য বিষয়কে প্রমাণ করবে তার জন্য একটা বিরাট কৌতূহল। তাই আগ্রহে সকলে বক্তার মুখের দিকে তাকাল।

বক্তা আবার বলতে আরম্ভ করলেন: সকলের নিশ্চয়ই মনে আছে, বছর বিশেক আগে এখানে কেমন দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। মরা ঘোড়ার মাংস পর্য্যন্ত মানুষকে খেতে হয়েছে। আর কষাইয়ের দোকানের সামনে কাঁচা রক্তের জন্য লোকেরা ভীড় করতো।

দেশ ছেড়ে অনেককেই সে দিন পালাতে হয়েছিল। আমার বাবা নিজে পালাতে পারলেন না বটে, তবে আমাকে বাঁচাবার জন্ত পাঠালেন গঙ্গা অতিক্রম করে ওপারে। ওপারে তেলিয়াগড়ে যেখানে কাজল রেখা টেনে দিয়ে গঙ্গার পাশে পাশে ছোট রাজমহল পাহাড়

চলে গেছে। সেখানে আমার দাছু থাকতেন। তিনি ছিলেন জোৎদার। বুভুক্ষার হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য বাবা আমাকে সেখানে পাঠালেন।

পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যেতে আমার বড় কষ্ট হচ্ছিল। অথচ বাবার মুখে অজানা এক পাহাড়ী দেশের গল্প শোনাতে সেই দেশ দেখবার জন্য কৌতূহল জেগেছিল। সব চেয়ে বড় কথা গ্রামকে, তার ঝোঁপ ঝাড়কে, সবুজ বাগিচাকে, যতই ভালবাসিনা কেন, তখন সেই পরিচিত পরিবেশের মধ্যেও একটা ভীতির ভাব এসেছিল। কত লোক না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল। কত লোক পালিয়েছিল দূরে দূরে। ঠিক ছুপুর বেলাতেই গ্রামের মধ্যে এমন এক নিরব নিস্তব্ধতা বিরাজ করত যে—ভয় লাগতো। মনে হত, কি এক অমঙ্গলের পেত্নী যেন গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য এগিয়ে আসছে। সেই অগ্রগামী পিশাচের ভয়ে সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে।

সন্ধ্যা আরম্ভ হতেই ভয় আরো বেশী দানা বেধে উঠতো। বিকট চিৎকারে যেন হাজার হাজার শেয়ালেরা ডাকতো। রাত ছুই প্রহরে ভুতুম ডাকতো ঘরের চুড়োতে। মনে হত, যেন মহাশ্মশানের মধ্যে বাস করছি। তাই আমারও ভয় হোত। সেই নতুন দেশে যেন আলো বাতাস প্রচুর। সেখানে সৌন্দর্যের মধ্যে এমন বিষণ্ণ ভয়ের ছাপ নেই। তাই পরিচিতকে ছেড়ে যেতে ছুঃখ হলেও মনে খুব ক্ষোভ হল না।

এইটুকু বলেই তিনি থামলেন।

সকলে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল। রাত গাঢ় হয়ে আসছে। একটু একটু করে শিশির পড়ছে, তার শব্দ পর্যন্ত শোনা যায়। বাইরে অন্ধকার এক মোহময় নীরবতা বিস্তার করে চলেছে! মন্দিরে প্রদীপের আলোর শিখা ছুর্বল হয়ে এসেছে। যেন একটা অধ্যায়ের ছেদ এখানে হলে ভাল হয়।

সকলের অবচেতন মনের সেই ইচ্ছাকে প্রতিধ্বনিত করে আগন্তুক বললেন: জীবন-সত্যকে একদিনে অনুভব করা যায় না। দীর্ঘ দিন চলতে চলতে আপন খেয়ালে সে নিজের স্বরূপকে উদঘাটিত করে। সুতরাং একদিনে তাকে বোঝানো যাবে না। আমার কাহিনী আজ থাক।
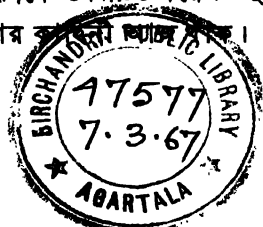
কেউ কোন কথা বলল না। সবাই নিরবে উঠে দাঁড়ালো।

সেই কালো মেয়েটি আর একবার আড় চোখে বক্তার দিকে তাকিয়ে দিদিমার হাত ধরে উঠে পড়লো। অনেকেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অভ্যস্ত চরণে মাঠের পথে চলতে লাগল।

একজন বলল: আজগুবি। এ আবার সন্ন্যাসী নাকি! ধর্ম কথাকি এমন করে বলে? আর একজন বলল: কি জানি ভাই, আমরা তখন কি দেখে ভুললুম তবে? আর একজন বলল: না ভাই কিছু আছে। উনি বললেন না, ধীরে ধীরে বলবেন? ঝাঁঝিয়ে উঠল একজন: মিছে কথা। ধাপ্পা। আসলে···

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বুড়ো মতন একজন বললেন: অধৈর্য হয়ো না। উনি বললেন না, সত্যকে জানতে হল 'ধৈর্য' ধরতে হয়!

আর একজন বলল: ঠিক বলেছ। কি উজ্বল চোখ মুখ! উনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না।

জনতা অভ্যস্ত চরণে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যে যার গন্তব্য স্থানে এগুতে লাগল।

সেই কৃষকটি, যে তাকে প্রথম দেখেছিল, সে তখনো মন্দির ছেড়ে আসেনি। আগন্তুককে সে বলল: আপনি আমার ঘরে চলুন। এই নির্জ্জন মন্দিরে একা থাকবেন না।

উনি বললেন: তোমার সহৃদয়তা তোমাকে মহিমামণ্ডিত করুক। সর্ব্বত্র ঈশ্বর আছেন, এই অন্ধকারের মধ্যেও। সব তাঁরই ইচ্ছা। আমি একা থাকব না।

সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ না করলেও আসলে উনি যে একজন তেমনি গুণী ব্যক্তি সে বিষয়ে কৃষকটির কোন সন্দেহ নেই। সন্ন্যাসীরা নির্জ্জনে একা থাকতে ভালবাসেন। সুতরাং তাঁকে আর বিরক্ত না করে, সে মনে মনে তাঁর পায়ে অশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা জানিয়ে, নিজের ঘরের দিকে ফিরল।

প্রদীপের কম্পিত শিখা জনসমাবেশ ফাঁক হয়ে যেতেই একটা দমকা হাওয়া এসে নিভে গেল।

গাঢ় অন্ধকারে নতুন আগন্তুক ঢাকা পড়ে গেলেন।

দুই

সোনালী রশ্মির ছটা ছড়িয়ে দিন উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কৃষক লাঙল নিয়ে মাঠে যাবার পথে মন্দিরে নতুন মানুষটিকে দেখতে এল। সেই রহস্যময় মানুষটি মন্দিরে এসে থাকবেন তার নিশ্চয়তা কি? একদিন হঠাৎ যেমন তিনি দেখা দিয়ে উধাও হয়েছিলেন, আবার তেমনি চলে যেতে পারেন। ইতিমধ্যেই তাঁকে নিয়ে অনেক কথা। কেউ বলছে, এ আবার ধর্ম কথা কি, এতো নিজের জীবনের কথা! আবার কেউ কেউ তাঁর গল্প বলার ঢংয়ের প্রশংসা করছেন। কিন্তু তার নিজের ধারণা, সেই উজ্জ্বল চক্ষু দুটি কোন সত্যের সন্ধান না পেলে এমন স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরে উঠতে পারে না। আর ঐ সুন্দর গল্পের আড়ালেই হয়তো তিনি সেই চরম কথাটি বলে যাচ্ছেন। শুনতে শুনতে একদিন সকলের কাছে সে তাৎপর্য ধরা পড়ে যাবে।

এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে মন্দিরে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু এসে দেখল, না তিনি যান নি, মন্দিরের বারান্দা থেকে নেমে পূবের সোনালী আকাশের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন। সেই ধ্যানমুগ্ধ একাগ্র-চিত্ততার মধ্যেও এমন প্রশান্তি যে, দেখলে সমস্যা ক্লান্ত হৃদয়ের যন্ত্রণাতেও মুহূর্তের জন্য একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করা যায়।

পেছনে অনেকক্ষণ কৃষক তাঁকে সেই ভাবে তাকিয়ে দেখল। তাঁকে সুপ্রভাত জানিয়ে বা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তাঁর ধ্যান ভাঙবার ইচ্ছে তার হল না। কিন্তু এক সময় তিনিই সেই সোনালী আকাশ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পেছনে তাকালেন। সেই মুখের মধ্যে এক অপূর্ব্ব শ্রী। দেখে কৃষকের অন্তর ভরে গেল। সে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনার ভঙ্গীতে নবাগন্তুকের দিকে তাকাল।

নবাগন্তুক বললেন: ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কোথায় যাচ্ছ?

—মাঠে।

—চল আমিও যাব।

কৃষক অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল : আপনি !

—কেন ! আমি যেতে পারিনা ! এ বিশ্বের কোথায় ভগবান নেই বলতে পার ? তোমার মাঠেও তিনি আছেন। আমি সেখানে যাব, চল। আমি তোমার সঙ্গে মাঠে কাজ করব, চল।

—আপনি কাজ করবেন !

—হ্যাঁ, শ্রমের বিনিময়ে অন্ন গ্রহণই জীবনের উদ্দেশ্য। আমি এখন তোমাদের অন্ন গ্রহণ করছি, আমার শ্রম নাও।

কথাগুলোর মধ্যে যেন কেমন একটা যাদু আছে। তিনি যা বলেন তাকেই মেনে নিতে ইচ্ছে করে। সুতরাং কৃষক আর কোন আপত্তি করল না। তিনি তার সঙ্গে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মাঠে তিনি কৃষকের সঙ্গে কাজ করলেন। কৃষক অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, তিনি মাঠের কাজও জানেন। কোনপ্রকার শ্রান্তির আভাষটুকু লক্ষ্য করা গেলনা। মনে হল, যেন খেলছেন তিনি। কে জানে এও সম্ভব কিনা, কৃষক নিজের মনে মনেই ভাবল। সব দেখে তার নিজের মনেও কেমন যেন একটা প্রেরণা জাগল। যিনি সত্য অনুভব করেছেন, তাঁর মনের পরশ নীরবেই যেন অপরের মনকে প্রভাবিত করতে পারে।

কাজ শেষে ওরা ফিরে এল। এবার কিন্তু কৃষককে কোন কথা বলতে হলনা। তিনি নিজেই তার সঙ্গে তার গৃহে গিয়ে উঠলেন। কৃষক বলল : আপনার আহার্য বস্তু প্রস্তুত করে দিচ্ছি, সহস্তে রন্ধন করে নিন।

তিনি হেসে বললেন : শ্রমকে আমি ভয় করিনা। জীবন মানেই তো শ্রম। তবে সমস্ত মানুষের সন্তানই আমার কাছে সমান।

কৃষক একটু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এ কথার অর্থ কি ? তিনি কি···। সে বলল : আপনি কি আমাদের হাতে অন্ন গ্রহণ করবেন ?

তিনি বললেন : সমস্ত মানুষই সমান।

—আমার তো কোন অপরাধ হবে না ?

—কর্ত্তব্যে কখন কার অপরাধ হয় ?

—আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান।

—আমি মানুষের সন্তান।

কৃষক বলল: আমার গৃহিনী শুদ্ধ ভাবেই আপনার আহার্য্য প্রস্তুত করবেন। আপনি গ্রহণ করুন।

কৃষক তখন তাঁর হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য জল এনে দিল। তিনি পরম আপনবোধে কৃষকের গৃহে অন্ন গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেন।

সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল কোন বয়স্কা মহিলা। তিনি সেই বারান্দায় বসে ছিলেন। মন্দিরের পুরোহিত তাঁর প্রতি একটা ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করে সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করে দেবতার আরতি করে গেলেন। ফেরবার পথে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন। তিনি কিছু মনে করলেন না, সেই প্রশান্ত সৌম্য হাসি মুখে ছড়িয়ে বসে থাকলেন।

সমস্ত দিনের শ্রমের শেষে কৃষকেরা নিজেদের দাওয়ায় বসে সময় কাটাতে যাচ্ছিল। কিন্তু গত সন্ধ্যার কথা তারা সব ভাবলো। অনেকের মনে দ্বন্দ্ব দেখা দিল, যাবে কি না। ধর্ম কোথায়, ধর্মের কথা তো লোকটি কিছু বলেনি! কিন্তু তবু গল্প বলার ঢংটা মন্দ নয়। কথকতার নতুন ভঙ্গী। সন্ধ্যার অবসরটা যা হোক কোন রকমে তো কাটাতেই হয়! মন্দ কি গিয়ে শুনলে! সুতরাং কখন আপন অজ্ঞাতসারেই তারা চলে এল। অনেকে ভাবল, জীবনের মধ্যে সত্যের কথা বলেছেন তিনি। সাধারণ জীবনের মধ্যে কি করে সেই সত্য ফুটে ওঠে, হয়তো জানা যেতে পারে। হাজার হোক কখনো তিনি এমন এক জগৎ থেকে কথা বলছেন না যাকে তাদের নিজের অভিজ্ঞতার বাইরে বলে মনে হয়। দেখা যাক কি সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন। কেউ কেউ তাঁর সেই প্রশান্ত চোখ দুটি এবং আনন্দঘন মুখের কথা ভাবল। হয়তো তিনি পরীক্ষা করছেন মাত্র। আসল সত্য কথা তিনি শেষে বলবেন। তার জন্য ধৈর্য্য চাই। প্রকৃতপক্ষে তিনি পরম সম্পদ আহরণ করেছেন জীবনে।

দেখা গেল, অবিশ্বাসে, অর্ধ-বিশ্বাসে, এবং বিশ্বাসে, প্রায় সকলেই আবার মন্দির প্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সন্ধ্যাটাকে জড়িয়ে ধরে একটা অব্যক্ত প্রশান্তির ভাব টেনে তিনি

বসে আছেন। তাঁর সদা হাস্যময় মুখখানা সকলকে মোহময় ভঙ্গীতে নীরবে অভ্যর্থনা জানাল।

তা দেখে অবিশ্বাসীদের মনেই দোলা লাগল। কিছু না বলে নীরবে তিনি যদি বসে থাকতেন, তবেই বুঝি তাঁকে আরো বেশী মানাতো। কিন্তু তিনি এ কোন্ কাহিনী শোনাচ্ছেন!

সবাই তাঁকে ঘিরে গোল হয়ে বসল। বৃদ্ধ কৃষক বলল: দয়া করে আপনি আপনার জীবন-বোধের কাহিনী আরম্ভ করুন।

দু-এক বার তাঁকে 'প্রভু' বা 'দেবতা' বলে সম্বোধন করবার পর এখন কেউ সে রকম কোন সম্বোধন করছে না। কারণ তিনি নিজেকে মানুষের ঊর্দ্ধে বলে মনে করতে পারেন না। এবং প্রতিবারই মনে করিয়ে দেন যে, তিনি 'মানুষের সন্তান'।

তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমি বলব, আমি বলবার জন্যই এসেছি। কেন না, এই কাহিনী লজ্জা, ত্রুটি, ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে আমাকে জীবন বোধের সন্ধান দিয়েছে।

তিনি তখন মূল কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন: আমি এই পবিত্র গঙ্গা অতিক্রম করে অবশেষে ওপারে গেলুম। আমার অভিজ্ঞতার দিগন্ত প্রসারিত হল। আমি অবাক বিস্ময়ে ওখানকার মাটীর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। মানুষ প্রায় এমনি, ছোট ছোট সারিবদ্ধ বদ্ধ মাটীর ঘর। এ সমস্ত কিছুর মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। তবে সেখানকার মেয়েদের মধ্যে নতুনত্ব দেখলুম। আরো অনেক স্বাধীন, আরো অনেক সহজ। বিলাসকে জীবনে প্রশ্রয় দেয়না তারা। শ্রমকে জীবনের অঙ্গ ভেবে অনলস ভাবে কাজ করে। দুর্ভিক্ষের, অনাহারের, ভয়ের কালো ছায়া নেই। মাঠে মাঠে ওদের রাখালেরা গোরু চড়ায়। ক্ষেতে ক্ষেতে ওদের মেয়েরা কাজ করে।

কিন্তু প্রথম সেই মানুষের জীবনও আমাকে ততটা আকর্ষণ করল না। আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হলাম ওপারের ঐ ধূমল পাহাড়ের রেখা দেখে। কত দূর থেকে এসেছে, কেউ জানেনা। আবার কোথায় গেছে তার কোন ঠিকানা নেই। খুব বড় সে পাহাড় নয়, অর্থাৎ সে খুব উঁচু নয়। পাহাড় আমি কখনো দেখিনি। তাই

পাহাড় বলে তাকে চিনতে পারিনি। প্রথম দিন যখন সেই নতুন দেশে গিয়ে উপস্থিত হলুম, সেদিন ছিল দারুন কুয়াশার দিন। সেই কুয়াশার মধ্য দিয়ে পাহাড়টাকে একটা মাটির ঢিবির মত দেখাচ্ছিল। অনেক উঁচু মাটীর ঢিবি আগে শুধু আমাদের কুম্ভকারদের উঠানেই দেখেছি। কিন্তু এত উঁচু নয় সে। এত উঁচু মাটি কোন্ কুম্ভকার জড় করে রেখেছে, আমি শুধু অবাক হয়ে তাই ভেবেছিলুম। আর সেই ভাবনার কথা অপরের কাছে গোপন না রেখে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম।

হেসেছিল সকলে আমার অজ্ঞতা দেখে। ওরা বলেছিল, মাটী কোথায়? ওতো পাহাড়।

পাহাড়! আমার বাবা আমাকে যে পাহাড়ের কথা বলে দিয়েছিলেন, সেই পাহাড়! আমার কৌতূহল আরো ঘনতর হয়েছিল। আমি সেই পাহাড় দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলুম।

বস্তী থেকে রাখালেরা যেত পাহাড়ে গোরু চরাতে। আমি তাদের সঙ্গে পাহাড়ে গেলুম। পাহাড় যে এত রসিক হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

সকলে অবাক হয়ে বক্তার মুখের দিকে তাকাল। সমতল ভূমির মানুষ ওরা নিজেরাও। সকলে পাহাড় দেখেনি। তবে বর্ণনা অনেকেই শুনেছে। কিন্তু পাহাড়ের রসিকতার কথা তাদের জানা নেই। পাহাড়ের রসিকতার কথা শুনে তাদের কৌতূহল হল।

তিনি তাদের মুখে সেই কৌতূহল লক্ষ্য করলেন কিনা কে জানে। কিন্তু তিনি তার কাহিনী বলে যেতে লাগলেন। যেন সজ্ঞানে নয়, একটা স্বপ্নের মধ্যে সেই পাহাড়ে প্রবেশ করে নিজের অজ্ঞাতেই তাঁর কথা বলতে লাগলেন।

তিনি বললেন: পাহাড় যে এত রসিক আমার ধারণা ছিল না। ঘর থেকে হাত বাড়ালে যার নাগাল পাওয়া যায় বলে আমার মনে হয়েছিল, হেটে হেটে ক্লান্ত হয়েও তার কোলে গিয়ে আমি উঠতে পারলুম না।

অবশেষে যখন উঠলুম, আমার পায় ব্যথা ধরেছে। পাহাড়ী

কাকড়ে পা'ছুটো ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবার উপক্রম। পাহাড়ের সেই গৈরিক মাটীতে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের গন্ধ নেওয়া মাত্র সমস্ত পরিশ্রমের কথা আমি ভুলে গেলুম।

অবাক বিস্ময়ে আমি পাহাড়ের কোল থেকে উর্দ্ধে তাকালুম। অজস্র নাম না জানা গাছ, লতা পাতা ফুল ফল। এমন অপরূপ, এত অপরূপ, আমি কখনো ভাবতে পারিনি। আমি শুধু তাকিয়ে থাকলুম। আর আমার মনে হল, ঐ সমস্ত গাছ পাথর লতাপাতা তৃণ সব আমার দিকেও যেন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে।

আমার মনে হল, আমি প্রত্যেকটা বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরি। শ্যামল পুষ্ট লতার ডগা গুলোকে মনে হল, চুম্বন করি।

যে কালো মেয়েটি তার দিদিমাকে নিয়ে এসেছিল, সে শুনে একটু রাঙিয়ে উঠবার চেষ্টা করল বোধ হয়। প্রদীপের ম্লান আলোতে অন্ধকারের প্রান্তরে বসা, শ্যামল মেয়ের ভাব পরিবর্তন সহজে লক্ষ্য করা গেল না। তবে সে মুখটা নীচু করে নিল, এটা ঠিক।

তিনি তখনো বলে চলেছেন: অজস্র ফুলের প্লাবনে আমি হারিয়ে যাই, আমার এমন মনে হল। সেই অতি বাঞ্ছিতকে পাবার জন্য আমার বুকের মধ্যে যে প্রবল উচ্ছাস, তা যেন আমাকে নদীর ঢেউয়ের মত দোলাতে লাগল।

প্রথম দিন আমি পাহাড়ের কোলে বসে শুধু তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করলুম। পাহাড় থেকে একটা বিশাল গন্ধ, নিবিড় ছায়া, আর অপ্রতিরোধ্য নিমন্ত্রণ নিয়ে এলুম আমি।

নেশা লাগল আমার। পাহাড়ের নেশা। রোজ যেতে লাগলুম। রাখালেরা পাহাড়ের কোলে গোরু ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়াতে শুয়ে পড়ত। আমি কিন্তু ঘুমোতে পারতুম না। আমি শুধু প্রবল কৌতুকের দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। ঘাস বনের আড়ালে, পাথরের টুকরোর উপর বসে, সাঁওতাল ছেলেরা বাঁশী বাজাতো।

এই পাহাড়ের কোলেই আমি নতুন মানুষদের দেখলুম—অর্ধ উলঙ্গ। কিন্তু পাহাড়ের কোলে তাই বড় ভাল দেখায়। আর সাঁওতাল

মেয়েরা! ঐ পাহাড়ের কোলে নাম না জানা পুষ্ট লতার মতনই সুন্দর রসপূর্ণ। তেমনি অপূর্ব ভঙ্গীমা।

মাথায় পাগড়ী, হাতে বাঁশী, ঘাস বনের আড়ালে সেই সাঁওতাল ছেলেরা বাঁশী বাজাতো। দুপুরে যখন তাদের বাঁশী বাজতো, তখন আমি নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ করতুম। আমার মনে হত, কোন্ অতি দূর থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে। পটে আঁকা ব্রজের গোপালের ছবি আমার চোখের উপর ভেসে উঠত। আমার মনে হত, তিনিই আমাকে ডাকছেন। আমি তখন পাহাড়ের ঘাসবনের উপর শুয়ে পড়ে, পাহাড়ের উপর কান পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করতুম।

বৃদ্ধ একজন কৃষক বলে উঠল: আহা! ব্রজের রাখাল তোমাকে প্রথম থেকেই করুণা করেছিলেন গো।

বাঁশীর কথা শুনেই বুঝি একজন বৃদ্ধার চোখে জল এল।

সেই কালো মেয়েটি শুধু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল।

তিনি কিন্তু তখনো বলেই চলেছেন: কয়েকদিন শুধু পাহাড়টাই মুগ্ধ করে রাখল আমাকে। পাহাড়ের বাইরে অন্য কোন কিছুর দিকে তাকাতে পারলুম না। কিন্তু হঠাৎ একদিন নিজের গাঁয়েয় কথা মনে পড়ে গেল। একটা লালফুলের বুকে বসেছিল একটা সাদা প্রজাপতি। ঠিক এমনি করে আমাদের ছোট্ট বাগিচাতে জবাফুলের বনে একটি সাদা রংয়ের প্রজাপতি ছুটে বেড়াতো।

আমার নিজের গ্রামের কথা মনে পডে গেল। ঘর ছেড়ে আমি পশ্চিমে এসেছিলুম—আমার মনে ছিল। তাই ফেলে আসা গাঁয়ের কথা মনে পড়তে আমি পূবের দিকে তাকালুম।

তাকালুম, কিন্তু তাকিয়ে আর যেন সহজে আমার দৃষ্টি ফেরাতে পারলুম না। পাহাড়ের নেশা আমাকে অন্য কোথাও তাকাতে দেয় নি। কিন্তু এক অনাবিল সৌন্দর্যের স্রোত যে পাহাড়ের ওপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, আমি ভাবতে পারিনি। একটা বিস্তৃত রূপার পাতের মত ঝক্ ঝক্ করছে নদী—যে নদী আমি অতিক্রম করে এসেছি।

ভাঙা পার থেকে আমি নদীকে দেখেছি। পার থেকে নদীকে

তার বিস্তার দেখে ভয় লাগে। কিন্তু পাহাড়ের কোল থেকে প্রবহমান নদীকে দেখলে ভাল লাগে। শুধু ভাল লাগে বললে ভুল হয়, তাকে দেখে লোভ জাগে। তার গভীর রেখা কি যে প্রশান্ত ভঙ্গীতে চলে গেছে, সে অনুভবকে শুধু মুখে বলে বোঝানো যায় না। আমার তখন মনে হল, গুরুমশাইয়ের কাছে টোলে প্রাচীন বেদের স্রষ্টা ঋষিদের কথা শুনেছি। প্রথম বোধ হয় তাদের কোন ঋষি গঙ্গাকে এমন ভাবেই দেখেছিলেন।

আমার মনে হয়েছিল—আমিও চিৎকার করে উঠি, চিৎকার করে উঠি প্রবল মনের আনন্দে।

একজন বৃদ্ধ শব্দ করে উঠলেন : আহাঃ! আহাঃ!

কিন্তু সেই কালো মেয়েটি মুচকি হাসল মাত্র।

তিনি আবার বলতে লাগলেন : এত যে বিপুল সৌন্দর্যের বিস্তার—তবু আমি গঙ্গার দিকে আর তাকাতে পারলুম না। পাহাড়ই আমাকে ডাকল একটা রহস্যঘন ইঙ্গিত দিয়ে। আমি সেই পাহাড়ের ডাকে মুগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম তার কোলে কোলে।

কাজ ছিল না আমার নতুন দেশে। শুধু আমার সেই ক্ষমতাশালী দাদু আমাকে অন্নদানের জন্যই আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিনিময়ে তিনি আমার কাছ থেকে কোন প্রকার কাজের প্রত্যাশা করেন নি। কিন্তু আমি যেচেই কাজ করতে লাগলুম। রোজ রাখালদের সঙ্গে পাহাড়ে যেতে লাগলুম। পাহাড়ের মৌন নীরবতার মধ্যে আমি তার কত কথা বুঝতে পারতুম। আমি যেন তার কত পরিচিত! আমি তাকে ভালবাসতুম আর সেও ভালবাসতো আমাকে।

রাখালরা চাইতো তাদের খেলার মধ্যে আমাকে ভিড়িয়ে নিতে। কিন্তু আমাকে চঞ্চল জীবনের চাইতে সেই স্থির প্রাণের আহ্বানই বেশী টানতো। আমি একা একা ঘুরতুম পাহাড়ের কোলে কোলে। ওরা আমাকে ভয় দেখাতো, একা গভীর অরণ্যে যেও না, বাঘ আছে? বন্য শূয়রও তাড়া করতে পারে। কিন্তু পাহাড়ের স্নিগ্ধ নীরব হাসির মধ্যে আমি কোন ভয় পেতুম না। যেন আপন অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তির বুকের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতুম। রঙিন হয়ে ইতস্ততঃ নুড়িগুলো

ছড়িয়ে থাকতো। আমি তাদের কুড়িয়ে নিতুম। আমি তাদের মধ্যে কোন রত্ন খোঁজ করতুম না, শুধু সেই নীরব সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করতুম।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের গা বেয়ে যে পথে পাহাড়ী ছেলে মেয়েরা চলে, সেই পায়ের রেখা অনুসরণ করে উপরে উঠতে লাগলুম। কিছুটা উঠবার পর আমি কিন্তু সেদিন একটু ভয় পেলুম। আমার গাটা ছমছম করতে লাগল। যতই উপরে উঠছিলুম, অরণ্যের বেষ্টনী ততই ঘন হচ্ছিল। আরো নিবিড় ঘাসের বন রহস্য মেলে দাঁড়িয়ে ছিল। যেন একটা অজ্ঞাত জগতের মেঘ সেখানে ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

কৌতূহলী শ্রোতারা আরো নিবিড় হয়ে বসল। বাইরে অন্ধকার গভীর হচ্ছে। কথক চমৎকার এক পরিবেশের সৃষ্টি করছেন। তিনি কি যে এক অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাকে টেনে আনবেন কে জানে। সেই নীরব পাহাড়ের কোলেই তিনি তার জীবন-অনুভূতি লাভ করেছিলেন কিনা, ঈশ্বর সেইখানেই তাকে করুণা করে দেখা দিয়েছিলেন কিনা, কে জানে!

তিনি তখনো বলে চলেছেন: সেই একটা গাঢ় ছায়ার নীচে, সেই প্রথম আমার সেদিন ভয় করতে লাগল। আমার মনে হল, যেন কোন রহস্যময় এক অপরিচিত জগতের মধ্যে এসে পড়েছি। কাছে কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই। পাহাড়ী বস্তীগুলো আরো উপরে। যদি বাঘ বা ভালুকই বের হয়! আমি নিজের মধ্যে একটা ভয়ের কম্পন অনুভব করতে লাগলুম। ঠিক সেই সময় একটা প্রবল চিৎকারে আমি কেঁপে উঠলুম।

কৌতূহলী শ্রোতারা গভীর আগ্রহে বক্তার দিকে তাকাল।

কিন্তু সেই বক্তা যেন তখন আর তাদের মধ্যে নেই। তিনি সেই গত দিনের নীরব এক ছায়ার নীচে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখে মুখে সেই বিশাল রহস্যময় ছায়ার নীচে নীরব একাকিত্বের অসহায় ভাব। তিনি যেন সেই গভীর অরণ্যের নিবিড় বিশালতায় মিশে গিয়ে, নিজেই সেই দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শ্রোতারা দেখতে লাগল কি শুনতে লাগল, নিজেরাই বুঝতে পারল না।

তিনি বলে চললেন: *ঠিক* সেই সময় আমি একটা প্রবল চিৎকার শুনতে পেলুম। আমার সমস্ত দেহ মন প্রাণ কেঁপে উঠল। মুহূর্ত্ত আমি কোন দিকে তাকাতে পারলুম না। তার পর কোন প্রকারে নিজের মধ্যে ফিরে এসে যে দিক থেকে চিৎকার আসছিল সেই দিকে তাকালুম। চিৎকার আসছিল প্রকৃতপক্ষে আমার মাথার উপর থেকে, বৃক্ষের কোন শাখা থেকে। আমি আমার পাশের বিরাট এক তেঁতুল বৃক্ষের শাখায় তাকিয়ে দেখলুম, একদল বাঁদর। তাদের সেই নীরব শান্ত জগতে আমি অবাঞ্ছিত ব্যক্তির মত প্রবেশ করেছি বলে বুঝি তারা ক্রুদ্ধ। আমি তাকাতেই আমার দিকে তাকিয়ে তারা নানা ভঙ্গীতে তাদের মুখগুলি বিকৃত করতে লাগল। কিন্তু অনেক সময় নয়। একটু পরেই বুঝি ওরা বুঝতে পারল, আমি গ্রাহ্য করবার মত ব্যক্তি নই। তাই তারা আবার নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করল। কেউ কেউ বা অত্যন্ত গম্ভীর জ্ঞানী ব্যক্তির মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি আর আমার জগতে দাঁড়িয়ে নেই। আমি যেন হাজার বছর পিছিয়ে গিয়ে সেই দিনের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি, যে দিনের কাহিনী গুরুমশাই পাঠশালায় আমাদের বলতেন। সেই রামায়ণের দিনের কাহিনী। আমার মনে হল, এই বুঝি সেই কিস্কিন্ধ্যার চিত্রকুট পর্ব্বত। এখানে সুগ্রিব রাজা তার পাত্র মিত্র নিয়ে বসে আছেন। কি এক রহস্যময় সেই জগৎ। আমার মনে হল, আমি যেন হাজার বছরের অতীত জগৎকে বুঝতে পাচ্ছি। আমার মনে হল, আমি সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হয়েছি। অদূরেই কোথাও বুঝি রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই আছেন। তাঁরা ধনুর্বান নিয়ে আসবেন। দেবদুর্লভ সেই দুই ভাইয়ের আগমনের একটা শিহরণ আমি পেলুম। আমি সম্পূর্ণ হারিয়ে গেলুম। শুধু মুগ্ধ হয়ে সেই অরণ্যচর শাখামৃগদের দেখতে লাগলুম। সুন্দর, এত সুন্দর হতে পারে এই অরণ্য আর পাহাড়! সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হল, আমি যদি আর এখান থেকে না যেতুম! কিন্তু আমাকে যেতে হল। কিছুকালের মধ্যেই বানরকুল কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই আদিম জীবদের আমি আর দেখতে পেলুম না।

এতক্ষণ যে স্বপ্নের মধ্যে নিজের একাকিত্বকে আমি ভুলেছিলুম সেই একাকিত্ব আবার আমি অনুভব করলুম, ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলুম।

শ্রোতারা এতক্ষণ ভয়ঙ্কর রহস্যময় একটা কিছুর কথা ভাবছিল। কিন্তু তা হল না। বক্তা আবার স্বাভাবিক জগতে ফিরে এলেন। একটা অসম্ভব কিছুর আশা তারা করেছিল, কিন্তু সেটা হল না। এর জন্য একটু হয়তো হতাশা দেখা দিল কারো কারো মধ্যে। কিন্তু সেটা স্থায়ী হল না। কারণ বক্তা স্বাভাবিক জগতে ফিরে এলেও তার কাহিনী বন্ধ করেন নি। তিনি তখনও বলে চলেছেন: আমি ফিরে এলুম বটে, কিন্তু পাহাড়ের আকর্ষণ আমার বেড়েই চলল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই পাহাড়ের রহস্যের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

গভীর অরণ্যের মধ্যে আমি কত ময়ূর দেখলুম। ময়ূরের পেখম দেখলুম। দেখলুম আয়তচক্ষু নীল গাইয়েদের। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর বাঘ আর দুষ্ট বন্য শূয়র আমি দেখলুম না। বরং দেখলুম হাজারো বর্ণের নানা প্রকার পাখীর ঝাঁক। মাঝে মাঝে দেখলুম, ঘাসের বনের ফাঁকে দেশী হরিণের দল—চড়ে বেড়াচ্ছে তারা। আত্মীয়-স্বজন, মানুষ-জন, তাদের চেয়ে কত বেশী ভাল লাগল এই সব আমার কাছে।

একদিন আমি পাহাড়ের আরো উপরে উঠবার জন্য রওনা হলুম। পাহাড়ের আড়ালে শুধু পাহাড় আর পাহাড় দেখা যায়। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের যে চূড়ো সেখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিক কেমন দেখা যায় তাই দেখবার আমার ইচ্ছা হল। আর মনে হল, পাহাড়ে ইতস্ততঃ কত প্রাণী ঘুরে বেড়ায়, পাহাড়ের সর্ব্বোপরে না জানি আরো কত প্রাণী আছে।

কিন্তু পাহাড়ের সেই চুড়োতে উঠবার পথটি আমার জানা ছিল না। তাই একজন রাখালকে অনেক বুঝিয়ে নিয়ে গেলুম। এই পাহাড়ের সঙ্গে ওদের কত ঘনিষ্ঠ পরিচয়—ওরা সব জানে। পাহাড়ের কোণ বেয়ে ঝর্ণার ধারা নামছে। সেই ঝর্ণার জল কোথেকে আসছে জানবার জন্যও আমার আগ্রহ হল। আমার তখন অবুঝ চোখের ছিল অতৃপ্ত কৌতূহল।

সেই রাখাল আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ঢেউ খেলানো পাহাড়ে বাঁকা পথ বেয়ে বহুক্ষণ চলবার পর অবশেষে যে শীর্ণ ধারা জলস্রোত ঝর্ণা হয়ে নীচে পড়ছিল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তির্ তির্ তির্ তির্ করে সেই জলস্রোত খণ্ডখণ্ড পাথরের টুকুরোর ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

মাটী থেকে এত উপরে জলের স্রোত! আমার কৌতূহল হল। আমি সেই শীর্ণধারা জলের মধ্যে নামলুম। কিন্তু শীর্ণ হলে কি হবে সে বড় প্রবল স্রোত। আর কি ভয়ানক শীতল। আমাকে যেন টেনে নিয়ে নীচে ফেলবার চেষ্টা করল। রাখালটি আমাকে হাত ধরে কোন রকমে জল থেকে তুলল। ঠিক ওপারেই পাহাড়ের আর একটি ঢেউ খেলানো চুড়ো। ঘাসের বনের পার বেয়ে পাহাড়ের টুই। আমি সেই ঘাস বনের দিকে তাকাতেই মানুষের মুখ দেখতে পেলুম। আমারই সমান বয়সের একটি মেয়ে অবাক কৌতূহলে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।

আমার বিস্ময় যেন আরো বেশী গাঢ় হল। এখানে ও কে! শুনেছি, হিমালয়ের নির্জন কন্দরে যক্ষ নারী-পুরুষেরা ঘুরে বেড়ায়। চতুর্দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, গুরুমশাই যে যক্ষ দেশের বর্ণনা করতেন আমাদের কাছে, এ যেন ঠিক তেমনি। কোথাও বড় বড় পাথরের চাপ। কোথাও বা ছড়ানো গৈরিক মাটী। ইতস্ততঃ ঘাস বনের বিপুল বিস্তার। কত নাম না জানা গাছ। কত লতানো গাছের মাথায় মাথায় অজস্র ফুল। বড় বড় উর্দ্ধশির শালের শ্রেণী। আমাদের জগৎ থেকে কত পৃথক! আমার মনে হল, আমি যেন দেবলোকের কোন এক প্রবেশ পথে এসেছি। দূরে, বহু দূরে, সেই অরণ্য শুধু চলে গিয়েছে, চলে গিয়েছে।

আমি রাখাল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললুম: ও কে?

সে আমার অজ্ঞতা দেখে হেসে বলল: পাহাড়ী মেয়ে।

—এখানে কেন?

—বা রে! ওরা তো এখানেই থাকে!

—এখানেও মানুষ থাকে!

—থাকে না! ওই তো ওপারে ওদের বস্তী, দেখবে, চল।

সেই বস্তী দেখবার জন্য আমি ওর সঙ্গে এগিয়ে গেলুম।

শীর্ণধারা সেই পাহাড়ী নদী অতিক্রম করেই ওপারে ওদের বস্তী।

রাখাল যাই বলুক, আমার মনে হল, ঐ ক্ষীণকায় ঐ নদীই হল মর্ত্যলোকের শেষ সীমা। তার পর আর এক জগৎ।

একটা কাঁকড় বিছানো গৈরিক পাহাড়ী পথ দিয়ে সেই জগতে গিয়ে ঢুকলুম। শত শত অলস শূয়রেরা মাটীতে গড়িয়ে আছে। চঞ্চল বন্যকুক্কুট ব্যস্ত পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ী ছাগলেরা অবাক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালো। পাহাড়ী কুকুরগুলো আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে কি দেখল। শেষে কাছে এগিয়ে এসে নাক দিয়ে আমাদের শুঁকল।

আমি প্রথমটা ভয় পেলুম। কিন্তু রাখাল আমাকে অভয় দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেল। একেবারে পাহাড়ী বস্তীর মধ্যখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। উঁচু পাহাড়, অরণ্যের বিপুল পরিবেষ্টনের মধ্যে মানুষের ঘরবাড়ী। আমাদের চেয়ে কত পৃথক, কত সুন্দর। আমার মনে হল, আমি যদি এখানে থাকতে পারতুম! দিনে অজস্র পাখীরা কত নৃত্য করত এখানে। সূর্যের কাছাকাছি থেকে আকাশের দিকে তাকাতুম আমি। লতায় জড়ানো ফুলের গন্ধ পেতুম। আর লাল আলো ছড়িয়ে সূর্য ডুবে যাবার পর কেমন মোহময় নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যা নামতো। ঘন অন্ধকারের মধ্যে তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্রের চেয়েও আমার মনে রোমাঞ্চ জাগতো। আমার মনে হল, আমি সেখানে থাকি, আর কখনো নীচে নামবো না।

বস্তীর গা বেয়ে আবার পাহাড়ের চুড়ো উঠে গিয়েছে। ঐ পাহাড়ের মাথায় না জানি আরো কত অজ্ঞাত সুন্দর জগৎ আছে। আমি রাখালকে বললুম, ওখানে যাব চল।

সে যেতে রাজি হল না। কারণ তখন আকাশের সূর্য পাহাড়ের চুড়োর আড়ালে হেলে পড়ছিল। সূর্য প্রথম-আকাশের গায় থাকতে আমরা পাহাড়ে উঠেছিলুম! এবার সে দ্বিতীয়-আকাশের গায়

পশ্চিমে হেলে পড়ছে। ওখানে উঠতে গেলে আরো সময় যাবে। নামতে নামতে সন্ধ্যা হয় তো বয়ে যাবে। তাই সে বলল: আর যাব না।

আমি বললুম: ওটাই বুঝি পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চুড়ো?

সে বলল: জানি না। পাহাড়ের চুড়োর আবার শেষ আছে নাকি! একের পর এক আছে, আছেই।

একের পর এক অজস্র চুড়ো আছে। সে কোথায় কোন্ অসীম রাজ্যে গিয়ে মিশেছে কে জানে। পাহাড়ের সর্বশেষ চুড়োর কাছে আকাশের না জানি কত বিপুল বিস্তার। সেখানে হয়তো দেবতারা থাকেন। আর এই পাহাড়ী বস্তীর ধারে এই টিলার গৈরিক পথ দিয়েই বুঝি সে দেশের দিকে এগুতে হয়। আমি হিমালয় দেখিনি। কিন্তু আমার মনে হল, মহারাজ যুধিষ্ঠির বুঝি এমনি কোন পথের রেখা ধরে সেই স্বর্গ রাজ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আমাকে ফিরতে হল। একটা অজানা জগতের ঈশারা আর শিহরণ নিয়ে আমি ফিরলুম।

আমার বিষণ্ণ মুখ দেখে রাখাল জিজ্ঞেস করল: কিগো, তুমি এমন মুখভার করলে কেন?

আমি বললুম: পাহাড়ের শেষ চুড়োটা আমার দেখা হলনা। আমার বার বার মনে হচ্ছিল সেই শেষ চুড়োর ধারে স্বর্গ আর মর্ত্ত মিশে গেছে। আর সেই সঙ্গমস্থলে দেবতারা দাঁড়িয়ে আছেন মানুষকে স্বর্গে নেবার জন্য। সেখানে না জানি কত উজ্জল আকাশ আলোয় ঝলমল করছে। দিন শেষে আকাশ ঘুরে সূর্য ঠাকুরও গিয়ে সেখানে বসবেন।

রাখাল আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল: ভুর, বোকা, শেষ পাহাড়ের চুড়োতে কি কেউ গিয়ে কখনো পৌছুতে পারে?

কিন্তু আমার মন সে কথা মানল না। কেন পারবে না? কে বললে পারবে না? মহারাজ যুধিষ্ঠির গিয়ে সেখানে পৌছান নি? কিন্তু সে কথা ওকে আমি বললুম না। ও তো টোলে পড়েনি। গুরু মশাইয়ের মুখে সে কুরুপাণ্ডবের কাহিনীই বা ও জানবে কি করে!

মনোক্ষুন্ন হয়ে ওর সঙ্গে আবার নামতে লাগলুম। পাহাড়ী ঝর্ণা পার হয়ে নীচে নামবার পথের মুখে এসে দাঁড়ালুম। হঠাৎ রাখাল আমাকে বলল : ঐ দেখ।

সে হাত দিয়ে আমাকে নীচের দিকটা দেখিয়ে দিল!

এই বুঝি স্বর্গ আর মর্ত্ত্যের পার্থক্য! আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলুম।

নীচের গাছগুলি মাঠের বুকে লেপটে গিয়েছে। বড় বিলখানাকে ছোট্ট একটি ডোবার মত দেখাচ্ছে। আর বিরাট প্রশস্ত গঙ্গা যেন পাহাড়ের কোল বেয়ে শুভ্র এক খণ্ড সুতার মত চলে গিয়েছে। নীচের গরুগুলোকে পাখীর মত দেখাচ্ছে। যেন অজস্র পাখী পৃথিবীর বুকে বসে আছে। কৌতুহল হল বটে, কিন্তু নীচের জিনিষের মধ্যে আমি যেন কোন সৌন্দর্যের স্বাদ পেলুম না। আমার মনে হল, ওরা সব অবজ্ঞার। অনাবিল সৌন্দর্য রয়েছে উর্ধ্বে, বহু উর্ধ্বে।

গঙ্গার ওধার থেকে আমি এসেছিলুম! আমি সেই দিকটায় তাকালুম। কিন্তু কিছু নেই। সব ধূসর একাকার হয়ে গেছে। ঐ সমস্ত লোকালয়, মানুষ, কিছু-ই যেন আর আমার কাছে কোন মূল্য থাকল না। আমার মনে হল, ওরা অত তুচ্ছ বলেই বুঝি দেবতারা উর্দ্ধে থাকেন।

দেবতার স্বর্গের কথায় আমার ৺ মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। বাবা বলেন, আমাদের ছোট্ট বাগীচার ঘর ছেড়ে তিনি নাকি এই স্বর্গে এসেছেন। তবে কি পাহাড়ী বস্তী অতিক্রম করে, বহু দূরে পাহাড় আকাশের সীমান্ত অঞ্চল পার হয়ে, তিনি এদিক দিয়েই গিয়েছেন! আমি যদি অনলস পরিশ্রমে হাটতে পারি, তবে হয়তো সেখানে তাঁর দেখা মিলবে। তাই নীচে তাকিয়ে আমার আরো খারাপ লাগল। মনে হল নীচের মাটীতে নেমে আমি আর সেখানে কোন আনন্দ খুঁজে পাবনা।

বক্তার উজ্জ্বল চোখ মুখ আবেগে অতিন্দ্রিয়। মধুর বাল্যের স্মৃতিতে তা মধুরতর হয়ে উঠেছে। স্বর্গের প্রান্তে তার কল্পনা এখন ছুটোছুটি করছে

বৃদ্ধ শ্রোতা হেসে বলল : আহাঃ, হবেই তো! বাছা আমার!

বুড়ী কৃষক-পত্নী বলল : তুমি স্বর্গের শিশু, ভুল করে নেমে এসেছ।

আর একজন বলল : সত্যি তুমি গোপীবল্লভ।

বক্তাকে মানুষের জগতে নামিয়ে আনবার জন্য সেই বাল্যে তিনি যে দুঃখ পেয়েছিলেন, সেই দুঃখের স্মৃতি বুঝি মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠল তাঁর মধ্যে। তিনি থামলেন। একটু ভাবলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন : তারপর বহুবার আমার আবার সেই পাহাড়ের চূড়োতে উঠে অলৌকিক আনন্দ উপভোগ করবার ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু আমি তা পারিনি। কেন পারিনি, সে কথা আজ বুঝি আমি। সেদিন তা বুঝতে পারিনি। পারিনি এই কারণে যে, ঈশ্বর তা চাননি। জী.নের মধ্য দিয়ে জীবনাতীতের সন্ধান না পেলে যে সত্যানুভূতির কোন অর্থ নেই। তাই বুঝি তিনি আমাকে তখনই কোন রহস্যময় পবিত্র নীরবতার মধ্যে তাঁর আনন্দঘন নির্বিকার প্রশান্তির স্পর্শ দেননি। তিনি আছেন, সেটা বুঝতে গেলে তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে, তাঁর ইচ্ছার মধ্য দিয়ে তাঁকে বুঝতে হয়। তাঁর সেই মঙ্গলময় ইচ্ছাকে জীবন দিয়ে উপলব্ধি করবার জন্য তিনি আমাকে জীবনে এনে দিলেন নতুন দিক।

রাত্রি আরো রহস্যময় মনে হল শ্রোতাদের কাছে। বাস্তব জগৎ ত্যাগ করে তিনি এবার বুঝি অবশেষে সেই ঈশ্বরের কাহিনী আরম্ভ করলেন। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি আরো গাঢ় হয়ে তাঁর উপর ঝরে পড়ল। কিন্তু ?....

কিন্তু, না। তিনি তখনো প্রত্যক্ষ ঈশ্বরদর্শনের কোন কথা বললেন না। আবার সেই জীবনেই নেমে এলেন তিনি। বলতে আরম্ভ করলেন : পাহাড়ের চূড়োতে আমি আর উঠতে পারলুম না বটে, কিন্তু পাহাড়ের কোলে গিয়ে বসতে লাগলুম।

ঝর্ণার জল যে কালো পাথরের কোল বেয়ে সাঁওতাল বস্তীর ধার দিয়ে চলে গেছে—আমি সেইখানে বসতে লাগলুম। সেখানে ছোট্ট পাখীরা সব লতার বুকে বসে দোল্ খেত। প্রজাপতি আর ভ্রমর উড়তো। সকালে আর বিকেলে আসতো সাঁওতাল রমনীরা কলসী নিয়ে জল নিতে।

পাহাড়ের সজীবতার মত অকৃত্রিম সজীব সেই সব মেয়েরা।

বনের ফুল, বনের ফল, বনের পাখীর মত তাদেরও দেখতে ভাল লাগত। ভাষা বুঝতুম না; কিন্তু কলকণ্ঠে যে আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাস তাদের মুখে ফুটে উঠত, আমি তাই শুনতুম। বনের বুকে পাখীর আপন কণ্ঠের মত সেই কলোচ্ছ্বাসও আমার ভাল লাগত। কৃষ্ণ দেহের উপর ডোরা-কাটা ছোট শাড়ী, বুকের উপর ওড়না, মাথার ঘন কালো কেশে বন কেতকীর গুচ্ছ, পাহাড়ের সেই রহস্যময় পটভূমিতে কেমন সুন্দর লাগত আমার। তাদের সারি বেধে জল নিয়ে যাওয়া দেখে, সাঁওতাল রাখালের উদাস বাঁশীর সুর শুনে, আমার সেই পটে আঁকা ব্রজের কৃষ্ণের কথা মনে পড়ত। তিনি বুঝি এমনি ছেলেই ছিলেন। আর এমনি করে আসত ব্রজের গোপবালারা। সমতল ভূমিতে কতবার তাদের কথা শুনেছি। আমি যেন পাহাড়ের ছায়াতে প্রত্যক্ষ তাদের দেখতে লাগলুম। সেই ঢলঢল যৌবন লাবণ্যে সাঁওতাল মেয়েরা যখন ছন্দ তুলে হেটে জল নিয়ে চলে যেত—আমি শুধু দেখতুম। আর আমার মনের মধ্যে অব্যক্ত এক আনন্দ আর রোমাঞ্চ অনুভব করতুম আমি। ওরা চলে গেলে সেই ঝর্ণার ধারে মলিনতা নেমে আসতো। আমি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতুম।

পাহাড়ের চুড়োতে এক ব্যাখ্যাতীত হাতছানী দেখেছি। সেই গৈরিক প্রবেশ পথ পার হয়ে কোথায় দেবতাদের দেশ আর ইন্দ্রের পারিজাত কানন আমাকে বৈরাগী উদাসীনতায় আবিল করে তুলতো। ওখানে আমি পেতাম নিস্তরঙ্গ উদাসীন এক শান্তি, আর এখানে বুক মোচ্‌ড়ানো এক উত্তাপিত রোমাঞ্চ।

ঐ মেয়েদের সঙ্গে আসতো একটি কিশোরী শ্যামাঙ্গী তন্বি। তার সেই বিস্তৃত চোখের ভ্রূর নীচে আয়তচোখ-হরিণের চোখের চেয়েও বেশী মায়া জড়ানো ছিল। আমার দিকে তাকাতো রোজ সে, আর আমি সেই চোখের ভিতরে তাকালে—পাহাড়, পর্ব্বত, নদী, মানুষ, সব ভুলে কোন্ দূরে চলে যেতুম। সেখানে শুধু ময়ূরপুচ্ছ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতুম না আমি। আমার বুকের মধ্যে হৃদপিণ্ড কাঁপতো। আমার সর্ব্বাঙ্গে কি এক বেদনা হত। আমি যেন কি চাইতুম। সেই আমার অব্যক্ত কামনাকে আমি বুঝতুম না। সে চলে গেলে আমি

যেন আস্তে আস্তে শান্ত নদীর মত নিরুত্তেজ বোধ করতুম। একটা অবসাদ আসতো। মাথার উপর সেই সময় নাম-না-জানা পাখী মিষ্টিস্বরে ডাকতো—আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতুম। ঝর্ণার সেই শীতল জলে হাত দুটো ডুবিয়ে দিতুম। অঞ্জলি ভরে জল তুলতুম। আর মনে হত, এই জল সেই সাঁওতাল রমণীদের ঘরে চলে গিয়েছে।

বস্তীতে ফিরে গিয়ে আমার মনে সেই শিহরণ লেগে থাকতো। কেন যেন আমার মনটা সবকিছু থেকে ফিরে গিয়ে হঠাৎ মানুষের মনের মধ্যে গিয়ে বিঁধতে চাইল। আমার মনে হল, ঐ সব সাঁওতাল রমণীদের মধ্যে পাহাড়ের চেয়েও বড় রহস্য আছে। সেই রহস্যকে নিয়েই ব্রজের রাখাল খেলেছিলেন। শুধু সাঁওতাল রমণী নয়, প্রতিটি মেয়ের মধ্যে আমি সেই রহস্যের ইঙ্গিত পেতে লাগলুম। মাটীর মাঠে কাজ করা ঐ যে বস্তীর মেয়েরা, আমি তাদের দিকে তাকালুম। দেখলুম—সুন্দর। ওরা সব সুন্দর। সবার মধ্যেই যেন জীবনের স্রোত, প্রবল জীবনের স্রোত। আমার মনের মধ্যে পাহাড়ের ছায়াকে ছেড়ে অন্য কোন চিত্র ফুটে উঠতে চাইল।

শ্রোতাদের মনে আবার যেন হতাশা দেখা দিল। পর্ব্বতের উত্তুঙ্গ চূড়া থেকে তিনি আবার কোথায় নিয়ে আসছেন তাদের! এ কেমন তাঁর ঈশ্বর দর্শন! নারীর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান কবে কে পেয়েছে? সাধু-সন্তরা রমণী-কাঞ্চন পরিত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন। হতাশ হল তারা। কিন্তু হতাশ হয়েও যেন সম্পূর্ণ হতাশ হতে পারল না। তাঁর চোখের মধ্যে কি এক প্রবল আকূতি আছে, কি এক নির্মল সত্যের ছোঁয়া আছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না।

শুধু সেই কালো মেয়েটি দিদিমার পাশ থেকে উজ্জল চোখে তাকালো বক্তার দিকে। বক্তা একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন: আমি তখনো বুঝিনি যে, এই পৃথিবীর স্তনপুষ্ট আমি তখন বেড়ে উঠছি। আমার দেহ প্রান্তরের মুখে তখন জীবন নদীর স্রোত জোয়ার সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে।

ইতিমধ্যে অনেকটা দিন কেটে গিয়েছিল আমার সেই নতুন দেশে। সময় চলে গিয়েছিল অনেক দূর। দেশ কালের মধ্যে আবার এসেছিল পরিবর্ত্তন। ওধারে আমার সেই ছোট গ্রামের বুকের উপর থেকে দুর্ভিক্ষের ছায়া নেমে গিয়েছিল। একদিন আবার আমার বাবা এলেন সেই ছেড়ে আসা গ্রাম থেকে। তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন। বহুদিন পরে তিনি এসে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন: তুমি এত বড় হয়ে গেছ! চল, আবার ফিরে চল।

ফিরে! কোথায় ফিরে যাব? আমার মন বলল: না। শত শত গো-বৎসের মিছিলের মধ্যে, গাভীর কণ্ঠে ঘণ্টার ধ্বনি আমাকে মুগ্ধ করেছে, পাহাড় আমাকে হাতছানী দিয়ে মুগ্ধ করে পাহাড়ের অন্তরালবর্ত্তী মানুষের জীবনে আকৃষ্ট করেছে, নতুন জীবনের ইসারাতে আমি তখন কাঁপছি। আমার সেই প্রিয় জগৎ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু তবু আমাকে ফিরে আসতে হল।

একদিন অপরাহ্ণের ম্লান রৌদ্রে, নীরব পাহাড়ের বিষণ্ণ দৃষ্টিকে ছেড়ে, পাহাড়ে লতার আড়ালে সাঁওতাল গোপবালাদের সেই জগতের হাসি থেকে অনেক দূরে, আবার আমাকে রওনা হতে হল। আমি ফিরে এলাম।

বক্তা থামলেন।

বাইরে অন্ধকার স্নিগ্ধতর হয়ে উঠেছে। গাছের মাথার উপর দিয়ে একটা উদাস হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের প্রদীপের শিখা কাঁপছে। একটা লাবণ্যের প্লাবন স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে বক্তার সর্ব্বাঙ্গে। তিনি কোথায়? কোন্ জগতে চললেন? সেখানে বুঝি ঈশ্বর ছিলেন? সেই নতুন জগতের দিকে তাকাতে ইচ্ছে হল শ্রোতাদের।

কিন্তু না, রাত গভীর হয়ে চলেছে। দিনের ক্লান্তি দেহের তন্ত্রীতে আকুতি জানাচ্ছে, যেন অদৃশ্য এক নীরব সঙ্গী আহ্বান করছে, এসো ফিরে এস।

বক্তা সেখানে এমন করে থামলেন যে, তিনি আর বলবেন বলে মনে হল না। তিনি নিজের মধ্যে ডুবে গেলেন। তাঁকে দেখে সবার মনে হল, তিনি দূরে সরে গেছেন আপনার নিজের জগতে। সবার জন্য

এখন আর তিনি নন। তাই আসন ছেড়ে একে একে উঠতে লাগল সবাই। অভ্যস্ত চরণে অন্ধকারের আবরণে ঢাকা মমতা মাখানো পথ দিয়ে যে যার নিজের গৃহের দিকে চলল।

শুধু সেই কালো মেয়েটি আরো একটু বেশী আগ্রহের উজ্জল দৃষ্টি ফেলে দিয়ে এল সেখানে। আর সেই প্রথম কৃষকটি সর্ব্ব শেষে বিদায় নিল তাঁর কাছ থেকে।

মন্দিরের আঙিনায় একা একটি মানুষের সন্তান বসে থাকলেন।

তিন

সকালে উঠে মানুষের সন্তানদের সঙ্গে তিনি যথারীতি কাজ করলেন। নিষ্কলঙ্ক মাঠের হাওয়ার মতন তিনি। আর যাই হোক কৃষকদের নিতান্ত পরিচিত আপন জনের মত। তাঁর কাছ থেকে ঈশ্বরের কোন্ সন্ধান পাওয়া যাবে কে জানে! তা না হোক, একটি পবিত্র মানুষের সন্ধান তারা পেয়েছে, এটা ঠিক। তিনি কারো মনে ভয় ধরিয়ে দেন না? কারো সারল্যের সুযোগে অর্থ ব্যয় করান না। কোন দাবীদাওয়া কিছু নেই তাঁর। সাধারণ মানুষের মত কাজ করেন, কিন্তু অসাধারণ দীপ্তিতে ভরে থাকেন। ধর্মের নামে কোন ভাণ নেই। তিনি কাউকে দূরে সরিয়ে রাখেন না। আর কিছু না থাক, তিনি এই যে সকলের মনের প্রান্তে এসে পৌঁছুতে পেরেছেন, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। সন্ধ্যাবেলা জীবনের কাহিনী বলতে বলতে তিনি যদি শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সন্ধান নাও দিতে পারেন, এটা ঠিক যে, একটা অকৃত্রিম সহানুভূতিশীল পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় দেবেন। একটি পবিত্র হৃদয় ঈশ্বর-ব্যবসায়ী ভণ্ড সন্ন্যাসীদের চাইতে কম কিসে? তাই তাঁর জীবনদর্শন সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস মানুষের না থাকলেও, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস নেই। এটা সকলের দৃঢ় বিশ্বাস—ঈশোপদেশের গভীর বিস্ময়ের ব্যবধান তিনি রচনা না করলেও. ভালবাসার নৈকট্য রচনা করবেন ঠিকই।

এটা হল অনেকের বিশ্বাস, প্রত্যেকের নয়। তাঁর সেই নির্ম্মল উজ্জল সুন্দর মুখখানি মূল্যহীন হতে পারে না। দৈবকৃপার অধিকারী না হলে এই মুখ মানুষ কোথায় পাবে? শেষ পর্যন্ত তিনি সেই পরম সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেনই, এটা তারা বিশ্বাস করে।

আবার, কেউ কেউ আকৃষ্ট তাঁর প্রতি হৃদয়ের মমতায়। যেন তিনি তাদের নিজেদেরই সন্তান। আবার কেউ কেউ অজ্ঞাত আকর্ষণের জন্য তাঁর অনুরক্ত।

মানুষের মধ্য দিয়ে দিন গেল তাঁর। মানুষের গৃহে মানুষের মত তিনি আহার করলেন—শ্রেণী বর্ণ বা জ্ঞানীর ব্যবধান রচনা করলেন না।

সন্ধ্যা এল নম্র ছায়া নিয়ে। মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রদীপ জ্বলল। বর্ণ-সচেতন পুরোহিত পূজো সেরে নিজেকে বাঁচিয়ে বেরিয়ে গেলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে শান্ত একটি স্নিগ্ধ আত্মার পাশে প্রাণময় মানুষের ভীড় হতে লাগল—যেন আকাশের চন্দ্রের চতুর্দিকে ধীরে ধীরে বসল নক্ষত্রের সভা।

বক্তা তাঁর জীবনের কাহিনী আরম্ভ করলেন: আমি ফিরে এলুম সেই পুরানো জীবনে। পাহাড়ী দেশের গাম্ভীর্যময় সৌন্দর্য সেখানে না থাকলেও আকর্ষণ তারো কম নেই। পাহাড়ের দেশে যদি একটা ভারি পাখীর মত আমি উড়েছি—এখানে লঘু প্রজাপতির মতন অনুভব করলুম নিজেকে। কিন্তু কি একটা অস্ফুট বেদনা আমি নিয়ে এসেছিলুম নতুন দেশ থেকে। আমার অন্তরের মধ্যে জড়িয়ে জড়িয়ে সেই বেদনা আমাকে কেমন যেন একটা অভাব বোধ দিতে লাগল। মনে হল, এই বিপুল সৌন্দর্যের মধ্যে কি যেন একটা আছে, তাকে অন্তরের মধ্যে আপন করে ধরতে না পারলে তৃপ্তি নেই। সে যে কি, কেমন তার চরিত্র, আমি তখনো তা বুঝতে পারিনি।

আমি কিন্তু আগের মত দায়িত্বহীন একটা কৌতূহলী মন নিয়ে আর ঘুরে বেড়াতে পারলুম না। বাবার মতে নতুন শিক্ষা নেবার আর কোন প্রয়োজন আমার ছিল না। যেটুকু জীবিকার জন্য আমার প্রয়োজন, সেটুকু আমি অধিকার করেছিলুম, অর্থাৎ প্রথম পাঠ। মন্ত্র-পাঠ করতে পারলেই যথেষ্ট ছিল। পুরোহিতের পুত্র, যজমানি করাই ছিল আমার পেশা, বাবা এটাই ধরে নিয়েছিলেন। তাই নতুন করে আবার টোলে পাঠিয়ে ন্যায়, দর্শন, বৈশেশিক কিছু পাঠ করতে না দিয়ে তিনি আমাকে তখনি পাঠালেন জীবিকার পথে।

রাজবাড়ীর বিগ্রহ-মন্দিরে ছিল পূজারীর প্রয়োজন। বাবা আমাকে সেখানেই পাঠালেন।

আমি জটিল জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে চললুম।

একদিন শুভদিন দেখে দূরের গাঁয়ে রাজবাড়ীতে বাবা আমাকে নিয়ে চললেন।

নতুনের মোহ আছে। কিন্তু অপরিচিত নতুনকে চিরকালই আমার বড়-ভয়। কোথায় যাব, আবার কোন্ অপরিচয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ব, সেই ভেবে আমি মলিন হলুম। আমার বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু বাবার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমার কোন কথা ছিল না। আমি জানতুম, কোনপ্রকার অজুহাত আমার চলবে না। সেই মুহূর্তে নিজের পিতাকে আমার অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছিল। আর আমার দুই চোখের পাতার নীচে অশ্রুসিক্ত স্বাদ অনুভব করেছিলুম আমি।

অপরাহ্ণের রৌদ্র যখন কমলা রঙ ছড়িয়েছিল, তখন রওনা হয়েছিলুম আমরা। বাবার মতে সেই ছিল শুভমুহূর্ত। রাজবাড়ীতে পুরোহিতের কাজ পাবার মত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে বেরুতে হলে শুভক্ষণ দেখে যাবার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু বাবার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার চিন্তার মিল হয়নি। আমার মনে হয়েছিল, এর চেয়ে অশুভ মুহূর্ত আমার জীবনে আর কখনো আসেনি বা আসবে না।

একটা ম্লান দৃষ্টি মেলে আমি আমার নিজের গৃহের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। তাকে ছেড়ে যাচ্ছি দূরে, কবে ফিরব কে জানে! পথের পরিচিত তরুশ্রেণী, আমি তাদের দিকে সমস্ত অন্তর উজার করে দিয়ে তাকিয়ে ছিলুম। শান্ত ছায়া পড়েছিল সেই সব গাছগুলির আড়ালে। উদাস হয়ে দু-একটা ঘুঘু ডাকছিল। আমি লক্ষ্য করে ঠিক দেখতে পেয়েছিলুম, গাছের পাতার নীচে নিবিড় হয়ে বসেছিল এক ঝাঁক হরিতাল। মাঠের বুকে শালিক আর দোয়েলেরা খাবার খুঁটছিল। ওরা সবাই আমার অত্যন্ত পরিচিত। আমি ওদের ছেড়ে যাচ্ছি।

অন্তরের স্পর্শ দিয়ে মেশানো সেই পরিচিত জগৎকে ছেড়ে এগুতেই আমার বুক ভেঙে কাঁদতে ইচ্ছে করল। আমি বার বার করে ফিরে ফিরে আমার নিজের গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু অবশেষে

চলতে চলতে সেই সবুজ কুঞ্জ লতাগুল্মের সীমান্তদেশ ছাড়িয়ে অগ্রসর হলুম আমরা।

আমার পরিচয়ের ব্যাপ্তি তো খুব বেশী ছিলনা। আমার গ্রামের বাইরে শুধুমাত্র গঙ্গা অতিক্রম করে জীবনের প্রথম আমি অপরিচিত দেশে গিয়েছিলুম! কিন্তু সে দেশ যতই অপরিচিত হোক না কেন, সেখানে আমার আত্মীয় ছিলেন অত্যন্ত আপন—আমার মায়ের বাবা নিজে। তাই অপরিচয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে সেদিন আমার এতটা ভয় হয়নি।

কিন্তু আজ ভয় হল। আজ আমি যাচ্ছি কোন আত্মীয়ের কাছে বিপদের দিনে ঠাঁই পেতে নয়, বরং যাচ্ছি ভৃত্য হয়ে। ভৃত্য বই কি! বিরাট রাজার বাড়ীতে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান ভিক্ষুকের চেয়ে বড় কোথায়?

মাঠ আমার কাছে আপন, আকাশ আমার কাছে আপন। তরু লতা পাতা পশু পাখী সব। যে জগতে কৃত্রিমতা নেই, সে সবই আমার আপন। কিন্তু যেখানে ঐশ্বর্য্যের বিলাস মানুষকে মানুষের চেয়ে বড় করেছে, যেখানে প্রতিপদে রীতি আর নীতির শাসন, সেখানে আমার বড় ভয়। তাকে আপন ভাবতে আমার বড় ভয় ছিল।

একজন বৃদ্ধ বলে উঠলো: আহা:, বাছা আমার সত্য বলেছে। তুমি যে আমাদের আপন সন্তান।

একজন বৃদ্ধা কৃষক-গৃহিনী বলল: বাছা তোমার মঙ্গল হোক।

ভগবানের প্রত্যক্ষ করুণার অধিকারী একজন মানুষকে তারা যে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, এ কথাটা অনেকেই ভুলে গেল।

বয়স্করা ভাবল, তিনি তাদের আপন মানুষ। অল্প বয়স্করা তাকিয়ে থাকল একজন মস্ত বড় কথকের মুখের দিকে। আর বৃদ্ধেরা তাকাল মমতা মাখানো দৃষ্টি নিয়ে।

বক্তা তখনো বলে চলেছেন: পরিচিত পথ শেষ হল। আরম্ভ হল নতুন মাঠ। অপরিচিত, কিন্তু তবু আমার মনে হল আমার দিকে একটা সমবেদনার দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে তারা। যত নতুন হোক, মাঠঘাট, পশুপাখী, তবু তারা যেন পর নয়। আমার মনে হল, এই

চলাটা যদি আমার অনন্ত কালের জন্য হত! কখনো যদি এ চলা আমার না ফুরাতো! আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলুম—তুমি দীর্ঘ হতে দীর্ঘ হও পথ। কারণ, যে বিরাট প্রাসাদানুপম অট্টালিকার কাছে আমাকে যেতে হবে, তার কথা চিন্তা করতেই আমার বুক কাঁপতে লাগল। আমি কখনো অট্টালিকাতে প্রবেশ করিনি। যে আপন-বোধে আমি মাটির গৃহকে ভালবাসি, তেমনি আপন কখনো কি মনে হবে তাকে? সেই নিষ্প্রাণ অট্টালিকা যাই হোক, কিন্তু তার অধিবাসি সেই প্রাণীগুলো! তাদের কথা কল্পনা করতেও আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলুম। বাবার উপর আমার অভিমান হল। এই গাঁয়ের আশে-পাশে সাধারণ মানুষের গৃহে তিনি তাদের গৃহদেবতার পুঁজো করে ফিরবেন, কিন্তু আমাকে এমন নিষ্ঠুর দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন কেন!

কিন্তু কোন উপায় ছিল না। আমাকে যেতে হবেই, তাই চলতে লাগলুম। হঠাৎ চলতে চলতে বাবা একবার বলে উঠলেন: আমরা এসে গেছি। ঐ রাজবাড়ী।

আমার হৃদপিণ্ডটা একটা হোচট খেয়ে চমকে উঠল। আমি তাকিয়ে দেখলুম, শেষ সূর্যের রক্তিম আলো রাজবাড়ীর প্রাসাদ চুড়োতে পড়েছে। আর পিতলের একটা শূল উর্দ্ধে সেই রক্তিম আলোতে ঝক্‌মক্ করছে। আমার মনে হল, ওটা আমার মৃত্যুর জন্যেই অপেক্ষা করছে। ওখানে আমাকে শূলে দেওয়া হবে।

বাবা বললেন: ঐ গোবিন্দজীর মন্দিরের চুড়ো। ওখানেই তোকে পুঁজো করতে হবে।

আমি আর নিজের চোখের জল রোধ করতে পারলুম না। মনে মনে বললুম: হে গোবিন্দ তুমি আমাকে রক্ষা করো, নির্জনতা দিও। রাজার মানুষ থেকে আমাকে দূরে রেখো।

একজন বৃদ্ধ বলল: আহা বাছা আমার! কোন্ প্রাণে বাবা ছেলেকে উপার্জন করবার জন্য পাঠালেন। গোবিন্দ তোমাকে রক্ষা করুন।

সেই কালো মেয়েটিও যেন একটু বিমর্ষ হল।

সমস্ত অন্তরের আবেগ-ঢালা এমন বর্ণনা যে, সেই ঘনিষ্ঠ অন্ধকারের

আবেষ্টনীর মধ্যে মৃদু প্রদীপের আলোতে প্রত্যেকেই যেন নিজের অন্তরে সেই যন্ত্রণা অনুভব করল।

বক্তা বলে চললেন: অবশেষে সেই রাজবাড়ীর দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হলুম! সশস্ত্র রাজার প্রহরী দুয়ার পাহারা দিচ্ছিল। তার সেই ভীমদর্শন চেহারা দেখে আমার বুকের রক্তটুকু জল হয়ে গেল।

বাবা প্রহরীর কাছে রাজদর্শনের কথা জ্ঞাপন করতেই প্রহরী পথ ছেড়ে দিল। আমি শুধু এইটুকু দেখলুম যে, ব্রাহ্মণের জন্য সে বাড়ীর দোর অবারিত। তাই মনে মনে একটু সাহস পেলুম আমি।

রাজার দবরারে আমাকে নিয়ে গিয়ে আমার পিতা উপস্থিত হলেন। পাত্রমিত্র সবাইকে নিয়ে রাজা বসেছেন। তাঁর অঙ্গরাখাতে জরির কাজগুলো জ্বল্ জ্বল্ করছে। শুভ্র মাথার উষ্ণীষে বুঝি মুক্তা বসানো। কিন্তু সেই দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখবার সাহস আমার ছিল না। রাজা উঠে আমার পিতাকে প্রণাম করলেন না, কিন্তু স্বাগত জানালেন। পরিচারক এসে ব্রাহ্মণের আসন দিলো আমার পিতাকে। বাবা শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে রাজপ্রশস্তি গান করলেন। একটা স্বর্ণমুদ্রা হাতে দিলেন তিনি আমার পিতাকে। পিতা তাঁর শতায়ু জীবন কামনা করে আসন গ্রহণ করবার পূর্বে আমাকে রাজার কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন: এই আমার পুত্র। মহামান্য রাজার মন্দিরে একেই গোবিন্দজীর পূজারী করে গ্রহণ করুন মহারাজ।

কোন্ সূত্রে, কেন, কি ভাবে, আমি সেই রাজার প্রয়োজনীয় পূজারী হলুম জানি না। কারণ, কুলপুরোহিত ব্যতীত রাজমন্দিরে কারো পূজার অধিকার নেই। তবে কি কুল পুরোহিতদের শেষ বংশদীপও নির্বাপিত হয়েছিল তখন? সে প্রশ্ন সেদিন আমার মনে হয়নি। কিন্তু যখন আমার মনে এসেছিল, তখন তা জানবার আর উপায় বা ইচ্ছা কিছুই আমার ছিল না।

এ দুনিয়া ঠিক মাঠে খেটে খাওয়া শ্রোতাদের নয়। সেই তরুণ পুরোহিত শিশুর মত এরাও সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতের সামনে এখন। তাদের চোখে সেই হতবাক বিস্ময়ের দৃষ্টিই ফুটে উঠেছে।

বক্তা সেই দৃষ্টির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন কি? না। সে

অভ্যেস তাঁর নেই। জীবন-সত্য লাভ করে তিনি এক নিরাগ্রহ দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন বোধ হয়। তিনি কাজ করেন, কিন্তু আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায় না। তিনি গল্প বলেন, কিন্তু তা শ্রোতার জন্য হলেও অন্তরের কোন্ এক গভীর অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়। তিনি সেই অনুভবের সঙ্গে এত একাত্ম হয়ে যান যে, পারিপার্শ্বিক অন্য কোন কিছুর প্রতি বুঝি তাঁর লক্ষ্য থাকে না।

তিনি স্বপ্নাচ্ছন্ন সেই দিনটির মধ্যে প্রবেশ করে বলে যেতে লাগলেন: রাজা আমার দিকে তাকালেন। সূর্য কুমুদের দিকে তাকালে যেমন তার পাপড়ী মুদে আসে, আমিও ভয়ে সঙ্কোচে তেমনি জড়িয়ে গেলুম যেন।

রাজা কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ তুললেন না। বললেন: বেশ তাই হবে। কাল থেকে গোবিন্দজীর মন্দিরে এ পুজো করবে।

বৃদ্ধ কৃষক বলে উঠল: আহা, রাজা ঠিক চিনেছিলেন!

বক্তা সে কথা শুনলেন না বোধ হয়, কারণ তিনি এতটুকু না থেমে বলে চললেন: আমার পিতা এতটা বুঝি প্রত্যাশা করেন নি। তাই রাজার মনে যাতে ভবিষ্যতেও কখনো সন্দেহ উঁকি দিতে না পারে, তার জন্য জিজ্ঞাসা না করা হলেও কৈফিয়ৎ দিয়ে চললেন: মহারাজ আমরা বংশ পরম্পরায় পূজারী। আমার পুত্রও সেই ধারা লাভ করেছে, পূজাবিধি এর করায়ত্ত। নির্বিঘ্নে এবং পূর্ণোপচারে এ পুজো করতে পারবে, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন! আপনার বংশের গৌরব বৃদ্ধি হবে, কল্যাণ আসবে।

খেয়ালী রাজা ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ করলেও তার স্তোকবাক্য অযথা শুনতে রাজী ছিলেন না বোধ হয়। তাই দেওয়ানকে দিয়ে আমার পিতাকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি সন্তুষ্ট।

আমার পিতাকে রাজাদের মর্জির সঙ্গে অপরিচিত বলে বোধ হল না। তিনি তৎক্ষণাৎ থেমে গেলেন এবং রাজাকে আশীর্বাদ করে বেরিয়ে এলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলুম।

আমি জানতুম, আমার পিতা এবার রওনা হবেন। আমি আর থাকতে পারলুম না, কেঁদে ফেললুম। এই অপরিচয়ের মহাসমুদ্রে এতক্ষণ

তিনি তবু পরিচিত একখণ্ড আশ্রয়ের মত ছিলেন। তিনি চলে গেলে আমি অকূল সমুদ্রে হারিয়ে যাব।

আমার চোখে জল দেখে এমন যে কঠোর প্রকৃতির পিতৃদেব তিনিও ব্যথা পেলেন বোধ হয়। তিনি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন: ভয় পেও না। লজ্জা এবং সংকোচ বোধ কোরো না। তোমার নেহাৎ সৌভাগ্য যে রাজার তোমাকে এক দৃষ্টিতে পছন্দ হয়েছে। রাজমন্দিরে পূজা করবার অধিকার সকলে লাভ করে না। তুমি নিতান্ত ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই পবিত্র দায়িত্ব লাভ করলে। সুতরাং মনে কোনপ্রকার দুঃখ না করে তুমি পূজোতে মন দাও।

সূর্য বেশীক্ষণ আর আকাশে থাকবে না। আমার পিতা তাই আর দেরী না করে বেরিয়ে পড়লেন। আমি শুধু আমার অন্তরের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলুম। সেবার দূরের হাট থেকে আমার পিতা ধেনু-বৎস কিনে এনেছিলেন। সারা রাত সেই ছোট্ট গোরুটি হাম্বা হাম্বা করে চেঁচিয়েছিল। আমার মনে হল, এমনি অপরিচয়ের সমুদ্র দেখে সেও বুঝি আমার মত ভীত হয়েছিল। আমারও চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হল, কিন্তু আমি কাঁদতে পারলুম না। ভয়ে আমি নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলুম। শুধু বেদনার্ত দৃষ্টি মেলে তাঁর চলে যাবার পথে তাকিয়ে থাকলুম।

এমন সময়, রাজবাড়ীর কোন ভৃত্য বোধ হয়, আমার পাশে এসে বলল: পুরোহিতমশায়, আপনাকে মন্দিরে নিয়ে যেতে এসেছি চলুন।

আমি চলবার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললুম। সেই রাজার কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে কি না কে জানে। কিন্তু না, প্রাসাদের সেই পথে সে চলল না। সে এল বাইরের দিকে। মন্দির প্রাসাদের বাইরেই। তা দেখে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। লোকালয়ের বাইরে এইখানে অনেক ভাল। আমি যেন বহু মানুষের মুখ না দেখি এখানে। লোকালয়ের বাইরে অপরিচিত মানুষকে আমার বড় বেশী ভয় করে।

অনেক উঁচু মন্দিরের বারান্দা। সেই উঁচু বারান্দার উপর থেকে ঊর্দ্ধে মন্দিরের দেহ উঠে গিয়েছে। তার উপর বহু ঊর্দ্ধে শীর্ষদেশ। বিরাট কয়েকটি গাছ সেই মন্দিরের আঙিনায়। তারা ছায়া ফেলেছে।

সেই ছায়ার নীচে মন্দিরের অভ্যন্তর থেকে সুরভি ধূপের ঘ্রাণ আসছে। একটা বিরাট গম্ভীর ধর্ম্মীয় পরিবেশ। মন্দিরের ঠাকুর সম্পর্কে আমার ভয় জন্মে গেল। এমন বিধি নিষেধের বাধা দিয়ে আবদ্ধ ঠাকুরের সামনে আমি আগেতো আর কখনো যাইনি। কিন্তু তবু এইটুকু ভরসা যে ঠাকুরতো আর মানুষ নন!

সেই ভৃত্যটি বলল: আপনি স্নান করে গিয়ে মন্দিরে বসুন। এখনি রাজমাতা আসবেন, তিনি আপনাকে দেখবেন, প্রণাম করবেন।

আর এক পরীক্ষা। বিপদের শেষ কোথায়! আমি গোবিন্দজীর দিকে তাকিয়ে মনে প্রাণে বললুন: ঠাকুর আমাকে তুমি রক্ষা কর।

অত্যন্ত লাবণ্যময় মূর্ত্তি। ঠাকুরের মুখে তাঁর মৃদু মৃদু হাসি। পাশে শ্রীরাধিকা। কিন্তু সে সমস্ত কিছুই তখন আমার নজরে পড়ল না। একটা অজ্ঞাত ভয়ের ছায়া আমার মনের মধ্যে গুমরাতে লাগল।

মন্দিরের প্রাঙ্গণেই স্নানের ব্যবস্থা আছে দেখলুম। আমি স্নান সেড়ে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলুম। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমার মনে হল, এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই।

বক্তার মুখে কি একটা রিক্ততার বেদনাভরা ছায়া ফুটে উঠেছে?

একটা গভীর স্নেহে বুড়ি কৃষক গৃহিণী তার মুখের দিকে তাকাল।

তিনি বলে চললেন: আমি কি করব ভেবে না পেয়ে মন্দিরের ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকালুম। দীর্ঘশির গাছগুলির মাথার উপরে পাতলা যে সব মেঘেরা ভেসে রয়েছে, অপরাহ্ণ-দিনের সূর্যের আলো পড়েছে তার উপর। সমস্ত আকাশটাকে একটা পোড়ামাটির মত দেখাচ্ছে। আমি সেই তাম্রাভ আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলুম, আমার নিজের গ্রামের প্রান্তে দিন শেষের আকাশের কথা। এমন অপরিচয়ের ছবি নেই সেই আকাশে। মনে পড়ল, রাজমহল পাহাড়ের উপরে রহস্যময় আকাশের কথা। বর্ণচ্ছটায় সেও উজ্জল হত। কিন্তু এই তাম্রাভ আকাশ যেন আমার অপরিচিত। আমি সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে কোথায় ঈশ্বরের সিংহাসন আছে, তাই খোঁজ করতে লাগলুম। বললুম: হে ঈশ্বর আমাকে ব্যথা দিও না তুমি।

ঈশ্বরের লাবণ্য বুঝি ফুটে উঠল বক্তার চোখে মুখে।

বৃদ্ধা কৃষক গৃহিনী বললো : আহা! ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে করুণা করেছিলেন।

অধিকাংশই তখন গল্পের পরিণতির লোভে মুগ্ধ বোধ হয়। তারা কিছু না বলে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কোন ঈশ্বরজ্ঞানী পুরুষকে তারা ধরে এনেছে, তিনি তাদের ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সন্ধান দেবেন, সে কথা আর কারো মনে থাকল না। তারা ভাবতে লাগল, এক নতুন কথক। গল্প বলবার ঢংয়ের নতুন দিক তিনি তাদের কাছে খুলে দিয়েছেন। সেই বিশেষ ঢংয়ে ব্যাখ্যা নেই, সুর করে কোন কিছু বলা নেই, আছে শুধুমাত্র কথা। মনের আবেগ ভরা কথা। সে কথা তাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মেশানো কথা। তারা বক্তার মুখের দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

বক্তা কিন্তু তখনো বসেই চলেছেন। তার অন্তরালবর্তী মনের গোপন গল্পের উৎস দুয়ার খুলে দিয়েছে। নদীর অনাবিল স্রোতের মত সেই স্রোত বেরিয়ে আসছে। তার কুলুকুলু শব্দ শুনছে শ্রোতারা। তিনি বলে চলেছেন : আমি বললুম, হে ঈশ্বর আমাকে ব্যথা দিওনা তুমি। এই অপরিচিত দুনিয়াতে তুমি এসে আমার পাশে দাঁড়াও।

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কিছু ভাবছিলুম। এমন সময় ভৃত্য গোছের কেউ হবে, এসে বলল : মা আসছেন।

মা শব্দটা আমার কাছে খুব বেশী পরিচিত নয়। আমার জ্ঞানোন্মেষের প্রাক্কালেই আমার মা—ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমি আর কাউকে মা বলে ডাকি নি। 'মা' কথাটি শুনে চমকে উঠলুম। 'মা' শব্দটির মধ্যে যে অনন্ত লাবণ্যের প্রবাহ আছে—আমি তা ধরতে পারলুম না।

একজন বলল : আহা, বাছারে আমার।

তিনি সে কথা নিশ্চয়ই শুনতে পাননি। কারণ তিনি কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে তখনো বলে চলেছেন : আমি সেই কথা শুনে ফিরে তাকালুম। দেখলুম একজন বৃদ্ধা আসছেন। তাঁকে চারিদিকে ঘিরে রয়েছে পরিচারিকারা। পট্টবস্ত্র পরিধান করে এসেছেন তিনি। তাঁর মুখের দিকে তাকাবার সাহস হল না আমার। মুহূর্তে যতটুকু দেখলুম—

তাতে বুঝতে পারলুম না—সে মুখে আমার জন্য কোন আশ্রয়ের ইঙ্গিত আছে কি না। আমি মাথাটা নীচু করে নিলুম। কিন্তু সেই নীচু করে নেবার ফাঁকে বৃদ্ধার পাশে দেখলুম আর একটি মুখ। ঝাঁউবনের মধ্যে একটি মাত্র পদ্ম যেন। হঠাৎ চোখে পড়ে যায়। ছোট, অত্যন্ত ছোট। বর্ণ তার স্নিগ্ধ সোনার মত। কাজলের পারে আঁকা অদ্ভুত লাবণ্য ভরা চোখ। কোকিলের মত কালো মাথার চুল বিনুনীবদ্ধ। নাকে নথ। দেহে জড়ানো নীলাম্বরী। হাতে তার নৈবেদ্যের থালা। পায়ের মল ছুটিও মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না।

আমি স্থান কাল পাত্র সব ভুললুম। প্রাণের কোন অবশিষ্ট অংশ নিজের বুকের মধ্যে আছে কিনা—ভাবতে পারলুম না। কিছুই মনে এল না। শুধু সেই রাজমহল পাহাড়ে পাহাড়ী নদীর ক্ষীণ স্রোতের ধারে সেই কালো কিশোরী সাঁওতাল মেয়েকে দেখে নির্জ্জন অবসরে আমার সমস্ত মনে প্রাণে যে অব্যক্ত উত্তেজনাময় শিহরণ অনুভব করতুম—একটা পাগলা ঝড়ের বিরাট দোল্‌না দিয়ে যেন সেই শিহরণ আমার বুকের মধ্যে উচ্ছল তরঙ্গের খেলা শুরু করে দিল। আমি নিজের দেহের মধ্যে একটা অজ্ঞাত কম্পন অনুভব করতে লাগলুম। সেই সৌন্দর্য্যের প্রথম ছটা আমার মনের মধ্যে কী যে ভাবের সঞ্চার করল, আমি বলে বোঝাতে পারব না। শুধু মাথা নীচু করে আমার নিজের মনের মধ্যে সেই ব্যাখ্যাতীত অনুভবের স্পর্শে চমকিত হতে থাকলুম।

শুধু আমি শুনলুম—কে যেন বলছে: বাঃ, ঠাকুর তো বেশ, ব্রজের রাখালটি যেন। কি গো মা—পছন্দ হল আপনার?

সেই গম্ভীর রাজমাতার কোন কণ্ঠ শুনতে পেলুম না আমি। তাঁর সেই বংশগত বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রসার নীরব দৃষ্টি হেনে আমাকে প্রাণহীন করে ফেলল যেন। তখন কিছুকাল আমি নড়তে পারলুম না, ভাবতে পারলুম না। শুধু মাথা নীচু করে আমার দুই কানে একটানা একটা দীর্ঘ ঝিল্লি রব শুনতে পেলুম। কিন্তু একবার প্রবল কৌতূহলে সেই মুখের দিকে আমাকে তাকাতে হলই। তাকালুম,—সঙ্গে সঙ্গে আমার তুচ্ছ ব্যক্তিত্ব তুচ্ছাতিতুচ্ছ হয়ে গেল যেন। আমি সেই বিপুল

বংশ-গরিমার পাশে বিন্দুমাত্রও নই। কিন্তু সেই আপন দীনতার পাশেও আমার ভাল লাগল—যখন সেই প্রস্ফুটিত সুন্দর ছোট মুখখানি আমি আবার দেখলুম। লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, শুধু বিস্ময়ে ভরা দুটি চোখে আমার দিকে সে তাকিয়ে আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নীচু করে নিলুম। সে নিশ্চয়ই রাজকন্যা। অনেক অনেক উপরে। কিন্তু চন্দ্র অনেক উপরে থাকলেও, তাকে তো—সকলেই তাকিয়ে দেখে, দেখতে ভাল লাগে তাই।

আমি সেই মুহূর্ত্তে শুনলুম, মধুর, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন বলছেন: সত্যি তুমি রাখালঠাকুরের মতন গো। কিন্তু এত শান্ত আর লাজুক কেন তুমি? ব্রজের রাখাল তো ছিলেন দুর্দ্দান্ত। নির্লজ্জ। কই, মুখ তুলে তাকাও?

আমি একটা ভীত হরিণ শিশুর মত মুখ তুলে তাকালুম। আজ মনে পড়ে, রাজমহল পাহাড়ের ছায়াতে ভয়ার্ত হরিণ শিশুকে যেমন করে আমার দিকে তাকাতে দেখেছি আমিও বুঝি তেমনি তাকিয়েছিলুম তাঁর দিকে।

আমি তাঁর (রাজমাতার) মুখের দিকে তাকাতেই তিনি পার্শ্ববর্তিনীকে লক্ষ্য করে বললেন: গোবিন্দজী খুশি হবেন, না কানাইয়ের মা? আমি তার খেলার সাথী এনে দিয়েছি।

বৃদ্ধা কৃষক পত্নী বলল: আহাঃ, তিনি সত্য বলেছিলেন গো।

কিন্তু সে কথা বক্তা তখন কি শুনতে পেয়েছেন? তিনি যেন একটা মধুর স্মৃতিতে ডুবে আছেন। তিনি সেই স্বপ্নের প্রান্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে তখন শ্রোতাদের উপহার দিচ্ছিলেন: আমাকে তিনি বললেন, ঠাকুর তোমার এত ভয় কিসের? ঐ দেখ মন্দিরে গোবিন্দজীর দিকে তাকাও। দেখ কেমন দুষ্টু দুষ্টু হাসি হাসছে।

এ যেন আমার কাছে আদেশ। আমি মন্দিরের ভিতর তাকালুম। আয়তচক্ষু কৃষ্ণ, শিখিচূড়া মাথায় তাঁর। মুখে দুষ্ট হাসি। রাধাকে বামে নিয়ে বাঁশী ধরে আছেন।

সত্যি যেন জীবন্ত বিগ্রহ।

রাজমাতা বললেন: কিগো ঠাকুর, আমার গোপীবল্লভকে দেখলে?

গোপীবল্লভ নাম শুনে আমি চমকে উঠলুম।

তিনি বললেন : কেমন লাগল ?

ক্ষীণ কণ্ঠে বললুম : ভাল।

তিনি প্রায় ধমকে উঠলেন : ভাল কি ? খুব ভাল বল।

আমি বললুম : হ্যাঁ, তাই।

তিনি শুধালেন : ঠাকুর তোমার নাম কি ?

আমার বলতে সাহস হল না। আমি চুপ করে থাকলুম।

তিনি স্নেহের বিদ্রূপে একটু হাসলেন বুঝি : কি গো, তোমার নাম নেই নাকি। নাকি ব্রজের রাখালের মত হাজারো নাম নিয়ে বসে আছ ?

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম : আমার নাম গোপীবল্লভ।

যেন একটু আশ্চর্য হয়ে তিনি তাকালেন আমার মুখের দিকে।

পার্শ্বচারিনী বললেন : দেখলেন! দেখলেন!

ঠাকুরের সঙ্গে আমার নামের মিল হবার জন্য তিনি আমাকে ধমকে উঠবেন বলে আমার ভয় হল। কিন্তু না, তিনি কিছু বললেন না। শুধু বললেন : সত্যিই তুমি গোপীবল্লভ। আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার গোপীবল্লভ এমনি এক গোপীবল্লভের পূজা চেয়েছিলেন।

ভাবভোলা দৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন :

—আহা, তোমার মা তোমাকে ছেড়ে দিলেন ?

আমি কিছু বললুম না।

—তোমার মা তোমার জন্য কাঁদলেন বোধ হয় ?

আমি নীরব থাকলুম।

—কি গো কথা বলছ না যে।

আমি মাথা নীচু করে বললুম—আমার মা নেই।

তিনি ব্যথিত হয়ে বললেন : সে কি গো! কবে স্বর্গে গেলেন তিনি ?

আমি বললুম : আমার ভাল করে মনে নেই।

তিনি বুঝলেন, ছোটবেলাতেই আমার মা মারা গেছেন। তাঁর অন্তরের মাতৃ-মন বুঝি তাই একটু হাহাকার করে উঠল। কিছুকাল

থেমে থেমে তিনি বললেন : ঠাকুর নিজের মাকে পছন্দ করেন না গো—বিশ্বজননীর কাছে আসবার জন্য। তাই দেবকীর পুত্র নিজের মার কোল শূন্য করে এলেন যশোদার কোলে। ওগো ঠাকুর, তোমার মায়ের অভাব কি ?

তিনি মনে মনে কি পরিকল্পনা করে একথা বললেন—তিনিই জানতেন।

মায়ের কথা শুনতেই হঠাৎ আমার যেন মনে হল, কি আমার বিরাট একটি অভাব রয়েছে জীবনে। সে অভাব আর কোন দিন পূরণ হবার নয়। আমার চোখ দুটো যেন ছল ছল করে উঠতে চাইল।

ততক্ষণে সেই মেয়েটি মন্দিরে উঠে গিয়ে তার পুজোর থালা নামিয়েছে।

তার দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে গেল। বিরাট আয়ত দুটি চক্ষু নিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে চোখে লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, আছে বিরাট একটি কৌতূহল। কিন্তু সেই কৌতূহল কি গভীর অসীম দেশের ইঙ্গিতে ভরা। সেই চোখের দিকে তাকাতেই আমি কেঁপে উঠলুম। আমার মনে হল, আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা যেন ওখানে মূর্ত্তি ধরে দাঁড়িয়েছে।

আমার অন্তরের মধ্যে একটা অভাব বোধের হাহাকার সেই রাজমহল পাহাড় থেকে ফিরে আসবার পর আমি যে অনুভব করছিলুম—সেই অভাবের কারণ আমি যেন তখন অনুভব করলুম। সেই রাজমহল পাহাড়, সবুজ অরণ্যানীর শ্যামলের বিশালতা, সাঁওতাল রমণীর রঙিন দেহভঙ্গী, সোনালী সূর্যের আলো, পাখী, সব যেন এক জায়গায় এসে মিশেছে। সেই অবাক দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে আমি মুগ্ধ হতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু তখন নিজেকে যেন কিছুটা বুঝতে শিখেছি। তাই সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার একটা উত্তাপ অনুভব করলুম আমার চোখে মুখে। আমি আমার মুখটা নীচু করে নিলুম।

সূর্য তখন তাম্রাভ বর্ণ থেকে আকাশের বুকে গাঢ় রক্তরংয়ের পোচ লাগিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যার বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

কাকের দল কুলায় ফিরে চলেছে।

রাজবাড়ীর অন্তঃপুর থেকে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে রাজমাতা নিজে যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর পার্শ্বচারিনী এগিয়ে গিয়ে মন্দিরে স্বর্ণপ্রদীপ জ্বালিয়ে দিল।

তিনি বললেন: ঠাকুর সূর্য অস্ত যায়। সন্ধ্যারতিতে বোস তুমি।

আমি পূজারী হয়ে এসেছি—সে কথাটা আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল। স্নেহের একটা আকাঙ্ক্ষাকে বুকে প্রশ্রয় দিচ্ছিলুম তখন। একটা স্বপ্ন দেখবার চেষ্টা করছিলুম মনে মনে।

রাজমাতার আদেশ শুনে চমকে উঠলুম। পূজারী হলেও আমি ভৃত্য হয়ে এসেছি।

আমি মন্দিরে গিয়ে আসন গ্রহণ করবার জন্য এগুলাম। কিন্তু সেই বিপুল বিলাসের উপকরণে সাজানো আসন দেখে থমকে গেলুম। মাটীর ঘরে বাস আমার। মাটীই ঠাঁই। রাজদত্ত আসনের চেয়েও আমার মূল্য অনেক কম। কিন্তু সে আসন পূজারীর জন্য। আমাকে বসতেই হবে। ভয়ে ভয়ে আমি সেই আসনে গিয়ে বসলুম।

মন্দিরের ঠিক দুয়ারের ধারে বসলেন রাজমাতা। তাঁর কোল ঘেষে আমার অত্যন্ত নিকটে বসল সেই অনিন্দ্যসুন্দরী রাজকন্যা।

আমি পূজো করলুম। আরতি দিলুম।

অনেকক্ষণ ধরে আরতি করলুম আমি। অগুরু ধূপের গন্ধে দেউল অমোদিত হয়েছিল। সেই বিরাট বিস্ময়ের দুটি চোখ আরতি দেখছে। সুতরাং আমি মনপ্রাণ দিয়ে আরতি করতে লাগলুম। অনেকক্ষণ আরতি করলুম।

তারপর আমার নিজের দেহে ক্লান্তি এলে আরতি বন্ধ করলুম।

প্রদীপের আলোর গা বেয়ে ধূপের ধুঁয়া জড়িয়েছে। রহস্যময় মনে হচ্ছে মন্দিরের বিগ্রহকে। রহস্যময় মনে হচ্ছে, রাজমাতা আর রাজকন্যাকে। আমি তাদের দিকে তাকালুম।

সেই দুইটি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের মধ্য দিয়ে কতদূরে, কি যে দেখলুম, জানি না।

সেই রাজমহল পাহাড়ের ঊর্দ্ধে, পাহাড়ী বস্তীর ধারে, গৈরিক পথের রেখা ধরে, দূরে অনন্ত স্বর্গের যে ইঙ্গিত আমাকে সেদিন মুগ্ধ করেছিল,

তেমনি এক অনন্ত জগতের ইঙ্গিত আমি যেন পেলুম সেই দুইটি চোখের মধ্যে।

রাজমাতা পার্শ্বচারিনীকে বললেন: আজ মনে হয় পূজা প্রাণ পেয়েছে, ঠাকুর আরতি গ্রহণ করেছেন।

তিনি গলায় অঞ্চল জড়িয়ে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন। সেই আশ্চর্য রাজকন্যাও প্রণাম করল।

মন্দির ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রাজমাতা। প্রসাদের থালা নিয়ে গেলেন তিনি রাজকন্যার হাতে করে।

আমি তাদের দিকে তাকালুম। সেই বালিকা রাজকন্যাও তাকাল আমার দিকে।

রাজমাতা বললেন: ওর বড় ভক্তি, রোজ মন্দিরে আসে।

সে কথার কোন জবাব আমার দেবার ছিল না।

একটা সোনার প্রতিমার মত রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু তখনো পরিচারিকা থেকে গেল।

রাজমাতা অন্দরে চলে গেলে, সে আমার দিকে তাকাল: তোমার ভাগ্য ভাল ঠাকুর, মায়ের মনে ধরেছে। আহা কচি ছেলে!

আমি সেই সব সহানুভূতি মেশানো কথার জবাব দিতে শিখিনি কখনো।

পরিচারিকা বলল: আমার মেয়ে কুন্দ আজ নেই। থাকলে সেও আসত। আমাদের প্রিয়দর্শিনীর সঙ্গে ওর বড় ভাব। সে থাকলে মন্দিরে তোমাকে দেখে আনন্দ পেত।

আমি বললুম: প্রিয়দর্শিনী কে?

সে বলল: কেন, এই তো এতক্ষণ তোমার পাশে বসেছিল। আমাদের রাজামশাইর একমাত্র কন্যা।

আমি নিজের মনের মধ্যে সেই মুখখানা আবার কল্পনা করলুম।

সত্যি, প্রিয়দর্শিনীই বটে সে।

পরিচারিকার মনের মধ্যে তত আবেগ নেই। মানুষের হুকুম তামিল করতে করতে নিজেকে অনেকটা যন্ত্রের মত করে ফেলেছে। আমাকে দেখে

তার মনের মধ্যে মুহূর্তের জন্য একটা ভাব আসতে চেয়েছিল—কিন্তু অভ্যাসের তাড়নার কাছে তার মনের স্বাভাবিক চরিত্র চাপা পড়ে গেল। সে একটু ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে বলল : নাও, তাড়াতাড়ি বসে যাও।

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম : কেন ?

—কেন, তাও জান না। তোমাকে পরিচর্যা করবার ভার যে আমার উপর! তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দিয়ে তবে আমাকে যেতে হবে। তখনো জাতের গণ্ডি তো আমি অতিক্রম করতে পারিনি। হঠাৎ মনে প্রশ্ন এল—'ওর হাতে খাব, ও কোন্ জাত ?'

আমি যেন কোন প্রকার আগ্রহ দেখালুম না।

আমার মধ্যে সন্দেহের যে দোলা লেগেছিল—তার ছবি বোধ হয় চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল। সেটা ধরতে তার অনেকক্ষণ বিলম্ব হল না। সে একটু হেসে বলল : কি গো ঠাকুর, মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে ? ভয় নেই। আমিও বামুনের মেয়ে গো। কপালগুণে রাজবাড়ীর ফাই-ফরমাস খাটি। নইলে জাতে আমি রাজার চেয়েও বড় গো। স্বামী পঙ্গু হয়ে পড়ে আছেন। নইলে···।

আমি নির্ভাবনা হলুম।

আর কোন রকম দ্বিধা না রেখে আসন গ্রহণ করলুম।

গোবিন্দজী স্বয়ং ব্রজের কৃষ্ণ—রাজার রাজা। বিলাসের তাঁরই বা অন্ত কি! হাজারো রমণী নিয়ে লীলা করেছেন তিনি। দ্বারকার রাজা হয়েছেন। তাঁর ভোগের জন্য কখনো সামান্য জিনিষ নিবেদিত হতে পারে না, বিশেষ করে কোন রাজার কাছ থেকে নয়। বহু ব্যঞ্জনে ভোগ তাঁর। আমি পুরোহিত, প্রসাদ পেলুম। কিন্তু প্রসাদের অমন বিপুল পরিমাণ এবং বিচিত্রতা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলুম। আমি অত বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য আর একসঙ্গে কখনো দেখিনি, স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু দেবতার প্রসাদ হিসাবে সে ছিল আমার পাওনা। আমি তাই গ্রহণ করলুম।

সারাদিনের পথশ্রমে আমি ছিলুম অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। আমি আকণ্ঠ সেই প্রসাদ গ্রহণ করলুম। কিন্তু তথাপি নিঃশেষে সব শেষ করতে পারলুম না।

আহার শেষে মন্দির সংলগ্ন একটি গৃহে আমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরিচারিকা আমাকে সেখানে নিয়ে গেল। আমি দেখলুম, দুগ্ধফেননিভ শয্যা। কিন্তু তাতে আমার প্রচুর সঙ্কোচ দেখা দিল। ভয় করতে লাগল সেই শয্যা স্পর্শ করতে। শুধু মনে হতে লাগল, আমার মত দরিদ্র ব্যক্তি কি এই শয্যার উপযুক্ত!

কিন্তু আমার সেই সঙ্কোচ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করবার মত সময় পরিচারিকার ছিল না। সে আমাকে শয্যা দেখিয়ে দিয়েই যাবার জন্য প্রস্তুত হল। যাবার আগে বলে গেল: ভয় পেওনা, মন্দিরের দাওয়াতে দারোয়ান থাকবে।

রাজবাড়ীর কোন মানুষ এখানে থাকবে না এই আমার সান্ত্বনা। অপরিচিত উঁচু সমাজের মানুষকে আমি বড় ভয় করি। তারা না থাকলে আমার কোন ভয় নেই।

আমি অসঙ্কোচে সেই শয্যায় নিজের দেহ এলিয়ে দিলাম। বাইরে রাত্রি ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে বাড়ছে। দিনের ক্লান্তি আমার দেহের তন্ত্রীকে দুর্ব্বল করে দিয়েছে। আমার চোখ দুটি মুদে এল। কিন্তু দুই চোখে অন্ধকার ঝাপিয়ে পরবার আগে, দুইটি আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি দেখলুম আমি—সে দৃষ্টি রাজকন্যা প্রিয়দর্শিনীর।

এইটুকু বলেই বক্তা থামলেন।

সেই কালো মেয়েটিকে যেন অগ্রসরমান কোন এক দেবতার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হল।

আর অন্য শ্রোতারা তখন নিজেদের কথা ভুলে গেছে। বক্তার আসল পরিচয়ের কথা আর মনে নেই। রাজপুরুষ আর রাজকন্যা তাদের জীবন থেকে যতই পৃথক হোন না কেন—সে জগতের একটা আকর্ষণ আছে। নিজেদের পরিচিত জীবনের পটভূমিকাতে যদি বক্তা গল্প আরম্ভ করতেন, যদি রাজগৃহ না হয়ে কোন সাধারণ কৃষকের গৃহ হোত, আর রাজকন্যা প্রিয়দর্শিনী হতেন কৃষকের মেয়ে—গল্পের কোন আকর্ষণ থাকতো না। গল্পে তো আকর্ষণ থাকতোই না—আর সেই সঙ্গে বিশেষ অতিথির সাধারণত্ব এত সহজে ধরা পড়ে যেত যে—তাঁর উপর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকতো না কারো।

তিনি সত্যের সন্ধান দিতে এসেছেন। কাহিনী গেছে জীবনকে ঘিরে। তার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতো না কৃষকদের কাছে। কিন্তু যেহেতু জীবন উঁচু সমাজকে কেন্দ্র করে চলেছে—আর রয়েছে স্বয়ং রাজকন্যা সেই গল্পের পাশে পাশে—জীবনের এ গল্প কখনো ঈশ্বরের পাশে গিয়ে পৌঁছুতে পারেও তো! আর যদি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের সন্ধান নাও পাওয়া যায়—একটা সুন্দর গল্প তো তারা শুনবে—যে গল্প কথক ঠাকুরের গল্পের চেয়েও রমণীয়!

সুতরাং আপাততঃ তারা তাদের প্রথম উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে গল্পের জালে জড়িয়ে পড়ল। এমন কি সেই বৃদ্ধেরা—যারা নবাগন্তুকের মুখে স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখতে পেয়েছে, তারাও গল্পকার হিসেবেই তাঁর চিত্র মনে গেঁথে নিয়ে চলল।

গল্পের রাত্রির মত বাইরেও অন্ধকার ক্রমশঃ তার বিপুল প্রবাহ বিস্তার করে এগিয়ে আসছিল। ক্লান্ত পেঁচার কিচির মিচির আর শেয়ালের রব জানিয়ে দিচ্ছিল, রাত্রি গভীর হয়েছে। শুধু রাজমন্দিরের শয়নকক্ষে বালক-পুরোহিতের চক্ষে নয়—শ্রোতাদের চোখেও ঘুমের জড়িমা শির্ শির্ করছে। আজ আর গল্প হবে না, হওয়া উচিতও নয়—একথা সবারই মনে হল। সবাই উঠে দাঁড়াল।

তারপর আর বিশেষ কোন কথা না বলে, অভ্যস্তচরণে যে যার নিজের গৃহের দিকে এগিয়ে চলল।

বক্তা কি অতীত দিনের কোন স্মৃতির রেশ ধরে টানতে লাগলেন? কিম্বা সমস্ত সুখ দুঃখের সত্যই তিনি অতীত হয়েছেন?

চার

নতুন অতিথি গ্রামের জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। দিনের বেলায় তাঁর যেন আর বিশেষ কোন অস্তিত্ব নেই। মানুষের সন্তানদের সঙ্গে মিশে তিনি মানুষের মত মাঠঘাটে কাজ করেন, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার গৃহেই অন্ন গ্রহণ করেন। কিন্তু সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণে তিনি গল্পের এক বিশেষ আমেজ সৃষ্টি করেছেন। যখন তাঁর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে—তখন তিনি যেন স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার আগমনে সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বে তিনি আবার সকলের সামনে বসলেন। ঈশ্বরের কথা সকলের আর মনে আছে কিনা বোঝা যায় না— কিন্তু এক কথকের কাছে গল্প শুনবার জন্য সকলকে আসতে হয়। সকলে তাই আজো এসেছে। বক্তা তার অসমাপ্ত গল্পের রেশ ধরে আবার বলতে আরম্ভ করেছেন : পরদিন অতি প্রত্যূষে আমি ঘুম ভেঙে উঠলুম। রাত্রিতে আমার অজ্ঞাতেই আমি যদি কোন স্বপ্ন দেখে থাকি, তবে তা আমার মনে ছিল না। ঘুম ভেঙে উঠতেই প্রথম আমার মনে পড়ে নি যে আমি নতুন দেশে এসেছি। পাতলা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আমি তেমনি পরিচিত পাখীর গান শুনতে পেয়েছিলুম। কিন্তু হঠাৎ অন্ধকারের পাতলা আচ্ছাদন কেটে গেলে নতুন শয়নকক্ষের দেওয়ালে আমার দৃষ্টি পড়লে আমি বুঝতে পারলুম, আমি নতুন দেশে এসেছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরিচয়ের সঙ্কোচের আঘাত এসে লাগল আমার বুকে। কিন্তু সেই আঘাতের তীব্রতা কম বোধ করলুম আমি—যখন গত সন্ধ্যার সেই বিরাট লাবণ্য ভরা আয়ত চক্ষু দুটির কথা মনে পড়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল—আবার কি তাকে দেখতে পাব? আমার চেতনার মধ্যে সেই অব্যক্ত যন্ত্রণাটা আবার আমি অনুভব করলুম। শুয়ে থাকতে আর আমার ভাল লাগল না। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। হাত মুখ ধুয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকালুম। আকাশের নক্ষত্রেরা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। পৃথিবীর ওপার থেকে আলো উঁকি দেবার চেষ্টা করছে আকাশের গায়।

আমি তখন আমার সম্মুখে মন্দিরের আঙিনায় তাকালুম। চতুর্দ্দিক ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা। প্রজাপতির লঘু পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন ফুলের বুকের উপর।

সেই পরিচিত সহজ প্রকৃতি আমাকে ডাক দিল। আমি মন্দিরের বারান্দা থেকে নেমে পড়লুম। সেই মিষ্টি স্নিগ্ধ আলোকে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। মন্দিরের পথে সেই বাগানের উপর দিয়ে যেন দু'জন কাকে আসতে দেখলুম। অত্যন্ত ছোট্ট দু'জন। তাদের পায়ের নুপূরের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ আমি চিন্তা করলুম—তাহলে! তাহলে এও কি সম্ভব! সেই রাজকন্যা আসবে?

হ্যা, সে-ই এসেছিল—আর তার সঙ্গে এসেছিল সমবয়সী একটি মেয়ে। আমি বুঝলুম—সঙ্গিনী সেই কুন্দ! ওরা এগিয়ে এল—এগিয়ে এল আমারই কাছে।

প্রিয়দর্শিনীর মুখে হাসি,—সে হাসি পরিচয়ের। আর তার সঙ্গিনীর চোখে কৌতূহলের দৃষ্টি। রহস্যটা তখনই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। রাজকন্যার কাছেই আমার বর্ণনা শুনেছে কুন্দ।

আমার তখন ভাল লাগল—খুব ভাল লাগল। ভাল লাগল এই ভেবে যে, সেই প্রিয়দর্শিনী, যার আয়ত চক্ষু দুটি আমার চেতনার মূল প্রদেশ পর্য্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে, আমি তারি আলোচ্য বিষয় হয়েছি।

বক্তা একটু থামলেন। বললেন: হায়রে আমার কৈশোরের সেই দিনগুলি! কি অবুঝ কল্পনাই না ছিল তখন আমার মনে!

রাজকন্যার তখনো অষ্টম বর্ষ নিশ্চয়ই পার হয়নি। সে বয়স অতিক্রম করলে গৌরীদান হয়ে যেত তার। কিন্তু তার সীমন্তে তো প্রভাত সূর্য্যের মত কোন প্রগাঢ় লাল রেখা ছিল না! আর তার সঙ্গিনী! সেও তো তারই সমান বয়সী। অথচ তাদের দেখেই আমি কত না বিব্রত বোধ করলুম। আর সেই আয়ত দুটি চোখের জন্য ততক্ষণে আমার মনের মধ্যে কতই না সলজ্জ অর্থহীন কল্পনা করে ফেলেছি।

আমি স্পষ্ট সেই রাজকন্যার মুখের দিকে তাকাতে পারলুম না। চুরি করে বার বার তার সেই আয়ত চক্ষু দুটি দেখবার চেষ্টা করলুম। আমারই মত লজ্জার কোন মৃদু শিহরণ তার মনে লেগেছিল কি?

হয় তো বা, কারণ সেও বোধ হয় একটু সংকোচ বোধ করছিল। কথা বলতে চাচ্ছিল আমার সঙ্গে, কিন্তু সহজে পারছিল না। তার দুই চোখের কাজল রেখার পাশ দিয়ে কুঞ্চনের রেখা ফুটে উঠেছিল। সে ঘাড়টাকে একটুকু দুলিয়ে ছিল, তারপর আদূরে ভঙ্গীতে আমাকে তার সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

তখন যদি দিনের আলো অত্যন্ত স্পষ্ট হত, তবে হয় তো আমি দেখতুম, সেই কষিত কাঞ্চনবর্ণের উপর রক্ত গোলাপের ছায়া পড়েছে। পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা যে আমারই সঙ্গে ভাব করবার প্রস্তাবনা মাত্র, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না আমার।

আমি সৌজন্য বোধে তার বান্ধবী কুন্দের দিকে তাকিয়েছিলুম। সাধারণ ঘরের মেয়ে সে। মা বাপের আদর তা'রো আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু রাজকন্যার সঙ্গে সেই আদরের পার্থক্য আছে অনেক। তাই সেই বিশাল আদরের পাশে তার ক্ষুদ্র আদূরে মুখের ভাবখানাকে একটা ঈর্ষাকাতর সন্দিগ্ধ দৃষ্টির মত মনে হয়েছিল আমার।

রাজকন্যা বলেছিল : আমার সই, নাম কুন্দ।

গাঢ় কালো না হলেও রং তার কালো। আর চোখ দুটি আয়ত হলেও মুখের মধ্যে সেই পরম লাবণ্যের ছায়া ছিল কি? ছিল না।

আমি রাজকন্যার দিকে তাকালুম। মনে হল, যদিও জানি, তবু আর একবার তার নাম খানি জিজ্ঞেস করি।

কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করতে হল না। তার পরিচয় দেবার জন্য এগিয়ে এল রাজকন্যা : আমার নাম জানেন?

আমার মনে হল, বলি : জানি। আর বলি : সত্যি তুমি প্রিয়দর্শিনী। কিন্তু বলতে পারলুম না।

বলল কুন্দ : ওর নাম প্রিয়।

পূর্ণ নাম সে বলল না।

রাজকন্যা শুধ্‌রে বলল : না, ও জানে না; আমার নাম প্রিয়দর্শিনী। আমি একটু মৃদু হেসেছিলুম মাত্র। আর মনে মনে বলেছিলুম তুমি দু' নামেই সত্য। তুমি শুধু প্রিয়দর্শিনী নও, প্রিয়ও।

কিন্তু সে কথা কি আমি কখনো বলতে পারতুম? না। সেই ঝর্ণার

ধারে কালো সাঁওতাল মেয়ের বিরাট চক্ষু দেখে, নির্জনে আমার বুকে যে অব্যক্ত ভাবের যন্ত্রণা জাগতো, সেই যন্ত্রণা অনুভব করা ছাড়া আর আমার কোন দিনই কিছু করবার ছিল না।

আমি তাই অন্য কথা পেড়েছিলুম : এত সকালে তোমরা এখানে ?

কুন্দ বলল : আমরা রোজ আসি ফুল তুলতে।

আমি দেখলুম, দুয়ের মধ্যে আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য যেন প্রতিযোগিতা।

আর সেই প্রতিযোগিতায় আমার অন্তর ছিল রাজকন্যার দিকেই। তাই তার কথার দিকেই আমার ঝোঁক ছিল বেশী।

প্রিয়দর্শিনী কুন্দের চেয়ে আরো বেশী এগিয়ে এল। একটি বড় পদ্মফুল দেখিয়ে বলল : আমায় পেরে দিন্।

সহস্রবার কাম্য সেই অনুরোধের জন্য প্রাণ দেওয়া যেতে পারে। আমি হাসিমুখে সেই উর্দ্ধশাখায় প্রস্ফুটিত পদ্মের দিকে এগিয়ে গেলুম।

সেই স্থলপদ্ম ছিল দুর্ব্বল গাছের অনেক উপরে। সেখানে উঠতে গেলে একটি পেলব শাখা আরোহীর ভার সহ্য করতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ উঁকি দিল না। সে কথা ভাববার অবসর আমার ছিল না। আমি তখন এগিয়ে গিয়েছিলুম উদ্দেশ্যের দিকে।

নিজে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আমি সেই পদ্ম এনে হাতে দিলুম—প্রিয়দর্শিনীর। কিন্তু তখন দেখলুম, কুন্দের সমস্ত মুখে ঈর্ষামিশ্রিত অভিমান। সহজে পরাজয় স্বীকার করতে রাজী ছিল না কুন্দ। তার দৃষ্টি, পদ্ম নয়, গিয়ে পড়ল গোলাপে। কাঁটার আড়াল রচনা করে একটি লাল গোলাপ ফুটে আছে ওদের নাগালের বাইরে। কুন্দ বায়না ধরল, তাকে সেই গোলাপ এনে দিতে হবে।

আমি তাকালুম প্রিয়দর্শিনীর মুখের দিকে। সেখানে অনুমতির আভাষ আছে কিনা সেটাই লক্ষ্য করতে চাইলুম। কিন্তু সেখানে ঈর্ষার কোন রেখা আছে বলে মনে হল না। আমি অনেক কষ্টে গায়ের আঁচড় বাঁচিয়ে সেই গোলাপটি এনে দিলুম—কুন্দের হাতে। সেই রক্ত গোলাপটি হাতে নিয়ে সে যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। দেখলুম—প্রিয়দর্শিনীর দিকে

তাকিয়ে সে দেখল। দেখল নয়—তাকে দেখাতে চাইল বুঝি যে, সেও অবজ্ঞার পাত্রী নয়।

কিন্তু প্রিয়দর্শিনী হেসে বলল: জানিস, তোর ও ফুল পূজোয় লাগবে না।

মুখটা মুহূর্তে ভার হয়ে গেল কুন্দর। বলল: না লাগুক, তাতে কি?

– বারে, ফুল পূজোয় না লাগলে তার মূল্য হল কি?

কুন্দ তার কোন জবাব না দিয়ে ফুলটা শুঁকতে লাগল। এবং সেই মধুর ঘ্রাণ নেবার পর তৃপ্তির একটা ভঙ্গীতে প্রিয়দর্শিনীর দিকে তাকিয়ে বলল: কি মিষ্টি গন্ধ। তোর ফুলে গন্ধ নেই।

গন্ধের দিকে প্রিয়দর্শিনীর তেমন কোন ঝোঁক ছিল না। সে সোহাগ করে নিজের পদ্মটির দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ধারনাতে, তার পদ্মেরই জয় –কারণ সে পূজোয় লাগবে।

সেই তৃপ্তির স্পর্শ নিয়ে প্রিয়দর্শিনী বাগিচার অন্য ফুলগুলি সংগ্রহ করে নিতে লাগল। আমি এক দৃষ্টিতে তার সেই ফুল চয়ন লক্ষ্য করতে লাগলুম। আমার মনের মধ্যে, বুকের অন্তরালে, প্রবল এক ঢেউ আছড়াতে লাগল। আমার শুধু সেই এক অনিন্দসুন্দরী মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হল। আমার সেই গ্রামের অনাড়ম্বর সৌন্দর্য, রাজমহল পাহাড়ে গম্ভীর রহস্যময় সুন্দরের ইঙ্গিত, সব ভুল হয়ে গেল। শুধু তন্ময় দৃষ্টিতে সেই রাজকন্যার দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

অপরিচিত এক দেশের গল্প। রহস্যময় অন্ধকারের আচ্ছাদনে এতটুকু প্রদীপের আলোর প্রান্তর। সকলের মনে হল, যেন তেপান্তর পেরিয়ে এসে রাজপুত্র স্বয়ং তার গল্প বলছেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তারা সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। আর সেই কালো মেয়েটি গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল সত্যি—তবু তার অন্তরের মধ্যে বুঝি একটা যন্ত্রনার দংশন ছিল।

গল্প তখনো শেষ হয়নি। এই গল্পের মধ্যে শেষের কোন ইঙ্গিত কল্পনা করে নেওয়াও যায় না এখন। গল্পকার বলে চলেছেন: সকাল বেলার প্রজাপতির মত ফুলের বুকে উড়ে উড়ে যেন ওরা নিজেদের গায় রেণু মাখল। তারা সুধা সঞ্চয় করে ভরা সাজি নিয়ে ফিরে গেল।

যাবার আগে তার সেই অতুলনীয় চোখ দুটি দিয়ে রাজকন্যা আমার

দিকে তাকালো। আমার বুকখানি কেঁপে উঠল—দুরু দুরু করে কাঁপল শুধু। আমার নিজেকেই আবার ভুলতে ইচ্ছে হল।

ওরা বাগান পার হয়ে অন্দরের পথে অদৃশ্য হল। কুন্দ শেষপ্রান্ত থেকে আমার দিকে ফিরে তাকালো—কিন্তু সে দৃষ্টি আমার কাছে বাঞ্ছিত ছিল না। আমি তাকিয়েছিলুম প্রিয়দর্শিনীর দিকে।

কুন্দ সেটা বুঝতে পেরে ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত করে একবার আমার, আর একবার রাজকন্যার দিকে তাকালো।

ওরা চলে গেল।

এতক্ষণ যেন আমার সমস্ত একাকিত্ব—পরম প্রাপ্তির আনন্দে পূর্ণ হয়েছিল। ওরা চলে যেতে আমি এক শূন্যতার ব্যথা অনুভব করলুম। কিন্তু সেই শূন্য হৃদয়ে আমার অতীত দিনের স্মৃতিরা এসে আর বাসা বাঁধতে পারল না। শুধু একটা মূর্ত্তি, দুটি চোখ, আর পরম রমণীয় এক আকুলতা সেখানে এসে ঠাঁই নিল।

আমি প্রিয়দর্শিনীর কথা ভাবলুম, আর ভাবতে লাগলুম।

সেই কল্পনা আমাকে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করলে তো চলবে না। সে কথা কিছু কালের মধ্যেই আমার মনে পড়ল। আমি উঠে গিয়ে মন্দিরের ধারে সরোবরে স্নান করলুম। গায়ত্রী পাঠ করলুম। তারপর পট্টবস্ত্র পরে পূজার জন্য প্রস্তুত হলুম।

কিছুকাল পরেই সূর্যের হাসিটি উজ্জ্বল হলে, পূজো আরম্ভ হবে। কুন্দের মা এসে মন্দির পরিষ্কার করল। ভৃত্য নিয়ে এল বিল্বপত্র। কুন্দের মা ঘসল সৌরভময় চন্দন। আমি ভাবলুম—গোবিন্দজীর সামনে আসনে যখন আমি পূজো করতে বসব, তখন গতকালের মত প্রিয়দর্শিনী আসবে কি? মন্দিরে দাঁড়িয়ে গোবিন্দজীর দিকে তাকিয়ে আমি সেই রাজকন্যার কথা ভাবতে লাগলুম।

শ্রোতারা তখনো তার মুখের দিকে তাকিয়ে। তাদের অধিকাংশেরই মনে নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত নেই তখন। কিন্তু বৃদ্ধ দু'একজন কৃষকের মনে হল—ভালবাসার মধ্য দিয়ে পরম লাবণ্যময় প্রেমের দিকে গোবিন্দজী বোধহয় এখানে টেনেছিলেন ওকে। এখানেই বোধহয় ঈশ্বরের করুণা

লাভ হয়েছিল তাঁর। সে কথা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। সেই করুণাময়ের খেলার অন্ত নেই। মনে প্রাণে মানুষ হয়ে, মানুষকে যে ভালবাসতে পারে, সেও তাঁকে লাভ করে।

সুতরাং সকলেই গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকল তাঁর দিকে।

তিনি তখনো থামেন নি। তখনো বলেই চলেছেন: আবার ঠিক পুজোর মুহূর্তে তার দেখা পাব সেটা আমি ভাবি নি। আমার মনে হয়েছিল, আমি দুরাশা করেছি মাত্র। কিন্তু আমাকে চমকিত করে দিয়ে সে এল—গতকাল সন্ধ্যার মত তেমনি সোনার থালায় ফুল সাজিয়ে রাজমাতার সঙ্গে। আমি তাকে দেখতে পেয়েই চমকে উঠলুম। এক তাল ননি দিয়ে গড়া দেহ, আকাশের মত নীল শাড়ী পরনে। ঘন কালো রেশমী চুল মাথায়। ডাগর ডাগর গড়ন। একটা স্বাস্থ্যের রসে টস্ টস্ করছে সমস্ত দেহ। বয়সকে অতিক্রম করে তখনই যেন সে অনন্ত নারীত্বের জগতে প্রবেশ করেছে। আমার দেহের মধ্যে কিসের একটা অব্যক্ত ভাবে আমি শুধু চমকিত হয়ে, মৃদু মৃদু কম্পন অনুভব করতে লাগলুম।

সেই বিহ্বল উত্তেজনার মধ্যেই আমাকে পূজোয় বসতে হল। আমি গোবিন্দজীর দিকে তাকালুম বটে, কিন্তু আমার চেতনার দৃষ্টি থাকল আমার পাশে বসে থাকা রাজকন্যা প্রিয়দর্শিনীর দিকে। রাজমাতার সম্মুখে আমি বার বার সেদিকে তাকাতে সাহস করলুম না। কিন্তু আমার মনে হতে লাগল, সেই রাজকন্যার স্নিগ্ধ অস্তিত্ব থেকে কিসের একটা উত্তাপ উঠছে—আর আমি তাই অনুভব করছি।

আচমন করে প্রথম মন্ত্রোচ্চারণ করলুম। চোখ বুজলুম, কিন্তু গোবিন্দজী নয়—প্রিয়দর্শিনীর মুখ আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল। আমার সামনে যেন বিগ্রহের বেদীতে সে-ই বসে আছে, আর তাঁর অবাক বিস্ময়-ভরা দুটি দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

কখনো কখনো আমি মন্ত্র ভুলে যেতে লাগলুম যেন। কিন্তু পাশে রাজমাতার উপস্থিতির কথা স্মরণ করে যথাসম্ভব স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্র পাঠ করবার চেষ্টা করলুম। ফুলের পর ফুল দিতে লাগলুম গোবিন্দজীর আসনে। কিন্তু সেই ফুলটি, যেটি আমি নিজে হাতে তুলে দিয়েছিলুম রাজকন্যাকে, সেটিকে সহজে স্পর্শ করলুম না। সেই ফুলটিকে ছিন্ন করবার

ইচ্ছা ছিল না আমার। মনে হচ্ছিল, যতক্ষণ সেটি আমার থালার উপর থাকবে, ততক্ষণই শান্তি। তাই কিছুতেই আমি সেই ফুলটিকে গোবিন্দজীর পায়ে ছুড়ে দিতে পারলুম না।

পুজো ছেড়ে যখন আশীর্ব্বাদীর ফুল, বিল্বপত্র, দিতে হল—তখন প্রিয়দর্শিনীকে আমি সেই ফুলটি আস্ত ফিরিয়ে দিলুম। আমি মনে মনে এই যে ছলনাটুকু করলুম—সে কি তা বুঝতে পারল? কিন্তু তার সেই বিপুল দুটি চোখ নিয়ে সে যখন আমার দিকে তাকালো—সেখানে আমি যেন এক পরম সন্তুষ্টির চিহ্নই লক্ষ্য করলুম। তার চোখে ছিল ফুলের লাবণ্য, আর দৃষ্টিতে ছিল—লঘু রৌদ্র। তাকে সেই ফুলটি দিতে পেরে আমার মনের মধ্যে আমি অনুভব করলুম এক বিরাট প্রসাদ। মনে হল, একটি পাথর যেন এতক্ষণ আমার বুকের উপর চেপে ছিল। সেটা আমার হৃদপিণ্ডের সহজ রক্ত সঞ্চালনকে আটকে রেখেছিল। সেই পাথরটা নেমে যেতে তরল রক্তপ্রবাহ সমস্ত দেহের কূলে কূলে আছড়ে পড়ল। আমাকে নিতান্ত হালকা আর তৃপ্ত মনে হল।

রাজমাতা বললেন: জান, স্বপ্নে গোবিন্দজী কয়েকদিন বললেন—আমাকে একজন কিশোর পূজারী এনে দে। তাকেও যেন তিনি দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই মুখটি আমি জাগরণে কখনো স্পষ্ট মনে আনতে পারি না। তথাপি আমি সেই কিশোর পুরোহিতের খোঁজ করেছি। এলে তুমি। তোমার মুখ দেখে আমার মনে হল—যেন তুমি, তোমাকেই ঠাকুর দেখিয়েছেন আমাকে। তোমারই মত এমন স্নিগ্ধ লাবণ্যভরা মুখ। গোবিন্দ এবার সন্তুষ্ট। আমিও সন্তুষ্ট। তুমি যখন পূজোয় বস, তখন তোমাকে সত্যি ভারি সুন্দর দেখায়।

আমি তাকিয়ে দেখলুম, সেই রাজকন্যার মুখেও একটা লজ্জার লাল রেখা পড়েছে।

পূজা শেষে ওরা চলে গেলেন।

আমি মন্দিরের বারান্দায় তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখলুম। আমার মনে হল, আহা! যদি রাজকন্যা না যেত, সে থাকত!

রাজকন্যা চলে গেল। কিন্তু আমি শুধু তারই কথা ভাবতে লাগলুম।

কি আশ্চর্য! আমার মনে হতে লাগল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার

একান্ত আর চিরকালের পরিচিত শুধু একজন আছে, সে প্রিয়দর্শিনী। আর সেই প্রিয়দর্শিনীর কথা ভেবে আমি আমার গ্রাম, আত্মীয়, রাজমহল পাহাড়, বনের কোলে শতেক সাঁওতাল রমণীর রমণীয় সমাবেশ, সব ভুললুম।

শ্রোতারা কিছু ভাবল না, শুধু তাকিয়ে থাকল তার দিকে। একমাত্র সেই কালো মেয়েটির ভ্রূ-যুগলে ঈর্ষার একটা কুঞ্চন পড়ল বোধ হয়। বক্তা বলে চললেন: মনের একান্ত তদ্গত আহ্বানের শক্তি অসীম। সে কথা সেদিন আমি তত বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝি। সেই প্রাণের অসীম শক্তি সম্পর্কে নিতান্ত অজ্ঞ আমি, সমস্ত মনপ্রাণ ভরে তাকে ডাকতে লাগলুম।

সেই আহ্বান অদৃশ্য তরঙ্গ তুলে বুঝি রাজকন্যার মনকেও স্পর্শ করল। অন্তঃপুর বাসিনী রাজন্যাকেও আমি অহরহ দেখতে লাগলুম মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে। কেন, কি উদ্দেশ্যে, আমারই মত কোন কামনা নিয়ে কি সে আসতো? সেই সজ্ঞাত কামনা সে মুহূর্তে তার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল কি?

কিন্তু তবু সে আসতো। একদিন এসে সে আমার অত্যন্ত নিকটে দাঁড়ালো। মন্দিরের উচু বারান্দা থেকে দূরে, বহু দূরে, একটা অস্পষ্ট গৃহের চুড়া দেখিয়ে বলল: বলুনতো কি?

তার সেই নিকট সান্নিধ্য একটা জলভেজা বাতাসের মত এসে আমার দেহে লাগল। আমি নিজেকে নিতান্ত কৃতার্থ বোধ করলুম। দূরের ঐ মিনারশীর্ষ তুচ্ছ। সে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি তার মুখের দিকে তাকালুম।

সে আবার প্রশ্ন করল: কৈ, বললেন না?

কি সুন্দর অপরূপ ভঙ্গীতে এই প্রশ্ন! সেই রক্তিমাভ লজ্জা জড়ানো প্রশ্নের কাছে বিজয়ী সেনাপতির মিনারশীর্ষ তুচ্ছ।

আমি তাকে বললুম: আমি জানিনা।

সে অবাক হল, আর কৌতুকও বোধ করল। বলল: ওতো গৌড়ের চুড়ো।

পূর্ব দেশের মহানগরী গৌড় অভ্রভেদী চুড়ো নিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে

আছে। কিন্তু সেই গর্বের মূল্য আমার কাছে নেই! তার চেয়ে বহু, বহু মূল্যবান, বহু উর্দ্ধের, এই রাজকন্যা।

আমার মনে হল, বিশ্বের প্রতিটি জিনিষ সম্পর্কে থাক আমার এমনি অজ্ঞতা। আর এই নিষ্পাপ প্রশ্নের মুখে আমার অপারগতাকে সে শত শতবার তার ক্ষুদ্র জ্ঞানের পরিধি দিয়ে ভরে দিক। পৃথিবীতে জয়েরই আনন্দ। এমন পরাজয়ের আনন্দ কি জয়ের আনন্দের চেয়েও বেশী না?

সেই ছোট্ট রাজকন্যাকে আমার কিছু শেখাবার ছিল না। বহু কিছু সে-ই শেখালো আমাকে। তার দুনিয়া আমার দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেখানে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। আমার সেই জ্ঞানের দীনতা দেখে তার চক্ষে করুণার সঞ্চার হত। আমি সেই করুণার স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করতুম।

একদিন সে আমায় বলল: আমি তো তোমায় কত বললুম, তুমি তো কিছু বললে না?

আমি বললুম: কি বলব?

—তোমার বাড়ীর কথা!

আমি বললুম: আমার বাড়ীর কথা, সে কি বলবার! আমার তো ছোট্ট মাটীর ঘর।

রাজকন্যা অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে বলল: তাই বুঝি?

আমি বললুম: হ্যাঁ।

—তোমার মা নেই?

আমি বললুম: না।

অবিশ্বাসে রাজকন্যা বলল: যা! তা হতে পারে?

আমি বললুম: কেন নয়! সত্যি আমার মা নেই।

একটু গম্ভীর হয়ে থাকল সে। তারপর বলল: তা হলে তুমি এখান থেকে আর কখনো যেয়ো না।

আমি চুপ করে থাকলুম।

সে শুধালো: কৈ, বললে না ত'?

—কি বলব?

—যাবে না কখনো, বল!

আমার যে কি ভাল লাগল কি করে বোঝাব। আমি বললুম: আমি যাব না।

তা শুনে প্রিয়দর্শিনীর মুখে হাসি ফুটে সে মুখকে আরো সৌন্দর্যের ছটায় উজ্জল করে তুলল।

আমি সর্ব্বক্ষণ সেই প্রিয়দর্শিনীকে কামনা করতুম। আর অধিকাংশ সময় কামনা করতুম একা। কিন্তু সকালের দিকটাতে তাকে একা পাওয়া যেত না, সঙ্গে আসতো কুন্দ। আর বিকেলেও প্রায়ই সে আসত সঙ্গে। তাই কুন্দকে আমি ঈর্ষা করতে আরম্ভ করেছিলুম। তাকে আমি দেখতে পারতুম না। আর কুন্দ যখন আমার সঙ্গে রাজকন্যার মত ভাব করতে এসে ব্যর্থ হত, তখন সে প্রিয়দর্শিনীকেও হিংসা করত। দু' একদিন রাগ করতো, আসতো না।

সেই দু' একদিন আমি শুধু নিজের কাছে পেতুম তাকে।

সেদিন সরোবরের জলে নইতে নেমেছিলুম। রক্ত পদ্ম ফুটে আছে সরোবরের গভীরে। সরোবরের ধারে ওরা দুজন বসে আমার স্নান দেখছে।

আমার কি মনে হল, নিজেই সাঁতার কেটে গিয়ে জলের গভীর থেকে একটি রক্ত পদ্ম তুলে নিয়ে এলুম। একটি মাত্র পদ্ম। এবং সেটি দিলুম প্রিয়দর্শিনীর হাতে। সঙ্গে সঙ্গে কুন্দের মুখ ভার হল। কিন্তু সহজে পরাজয় স্বীকার করবার পাত্রী সে নয়। তাকেও একটি পদ্ম এনে দেবার জন্য সে আমাকে ধরলো। সে অনুরোধ না রাখাটা নিতান্তই অনুচিত হবে বলে আমি সাঁতরে গিয়ে তার জন্যও একটি পদ্ম নিয়ে এলুম। কিন্তু রাজকন্যাকে হারানোই তার উদ্দেশ্য। সে বলল: আর একটি এনে দাও।

আমি তখন একটু শ্রান্ত। ভাবলুম, কি করব।

এমন সময় প্রিয়দর্শিনী বলল: না, ও আর যাবে না!

কুন্দ বলল: কেন?

—ওর অসুখ করবে।

—করবে না।

—করবে।

কুন্দ আমার দিকে তাকিয়ে বলল : যাও, নিয়ে এস।

প্রিয়দর্শিনী বলল : যাবে না তুমি।

কুন্দ রাগ করে বলল : কেন, ও কি তোর একার ?

প্রিয়দর্শিনী বলল : হ্যাঁ।

আমার কি ভাল লেগেছিল তখন !

ওদিকে কুন্দ রাগ করে চোখের জল ছেড়ে দিয়েছিল। ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল পদ্মের কুঁড়িটি। তার পর দৌড়ে নিজের ক্রোধের আবেগ সামলাবার জন্য চলে গিয়েছিল।

আমি একটু দুঃখ পেয়েছিলুম।

চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম জলে।

রাজকন্যা বলল : ওঠ।

আমি উঠলুম।

সে বলল : কুন্দটা বড় হিংসুটে।

আমি শুধু তার চোখের দিকে তাকালুম।

প্রিয়দর্শিনী বলল : বল, তুমি শুধু আমার ?

আমি বললুম : হ্যাঁ।

ফুল নিয়ে প্রিয়দর্শিনী চলে গেল।

এমনি কতদিন, কত মান-অভিমান করল দুই সখী। আর আমি মনেপ্রাণে শুধু ভালবেসে চললুম প্রিয়দর্শিনীকে।

বছর প্রায় ঘুরে এল। বসন্তের হাওয়া লাগতেই আমার প্রাণে এল হাহাকার। আর প্রিয়দর্শিনীকে কেমন দেখলুম শ্লথ।

কমলবনে রাজহংসের জলক্রীড়া দেখত সে প্রায়ই আমার সঙ্গে। সেদিন উদাস বসন্তের হাওয়ার খেলা চলছিল। সে আর আমি বসেছিলাম পাশাপাশি। তার মাথার নিবিড় কালো অথচ লঘু চুলগুলিকে আমি নাড়িয়ে দিচ্ছিলুম। আর আমার বুকের মধ্যে উন্মাদ হৃদয় ব্যাকুল হয়ে লাফাচ্ছিল যেন। আমার মনে হচ্ছিল, প্রিয়দর্শিনীকে আমি আমার নিজের বুকের মধ্যে ভরে রাখি। আমার মনের বহু অকথিত কথা শুধু তাকে বলি, বলি, আর বলি।

আমি চিবুকে হাত দিয়ে তার মুখটি আমার নিজের দিকে তুললুম।

তার ছুটি চোখের লাবণ্য সে আমার দিকে তুলে ধরল।

আমি কি বলতে যাচ্ছিলুম—সে কথা ভুলে গেলুম।

—সে বলল : কি ?

আমি বললুম : সত্যি তুমি প্রিয়দর্শিনী।

সে কথার অর্থ কি সে ভাল করে বুঝল ?

আমি বললুম : তোমার নামের অর্থ তুমি জান ?

সে কোন কথা না বলে, সলজ্জ দৃষ্টি মেলে ধরল আমার দিকে।

আমি বললুম : তোমার নামের অর্থ, তুমি দেখতে খুব সুন্দর।

—ধ্যেৎ ! বলে সে মুখটা নীচু করে নিল।

অনেকক্ষণ সেইভাবে কি ভাবল. তারপর বলল : তুমিও সুন্দর।

—কে বললে ?

সে আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গীতে বলল : হ্যাঁ, তাই। মা বলেন, পূজোয় বসলে তুমি ভারি সুন্দর হও দেখতে।

আমি তাকে বললুম : জান, তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।

সে লজ্জিত হল।

আমি আবার বললুম : আমাকে ভাল লাগে তোমার ?

সে লজ্জায় আমার কোলে মুখ লুকালো।

আমি তার মুখ তুলে ধরবার চেষ্টা করলুম : বল।

অবশেষে সে মুখে এক ঝলক রক্ত উঠিয়ে বলল : হ্যাঁ।

আমি বললুম : আমার কথা তোমার মনে থাকবে ?

—ও বলল : হ্যাঁ।

—সব সময় ?

—হ্যাঁ।

আমি আর কোন কথা বললুম না। নিজের হৃদপিণ্ডের মধ্যে উন্মাদ তরঙ্গ ছুটেছে, তাই অনুভব করবার চেষ্টা করলুম।

কিছুকাল পরে সে বলল : আমি সব সময় তোমার কথা ভাবি, জান ?

আমি আগ্রহে তার মুখের দিকে তাকালুম। আমার বুকের স্পন্দনটা দ্রুততর হল। বললুম : কেন ?

সে বলল : এমনি।

আমার কৈশোর তখন সবুজ চেতনার তরঙ্গে জাগ্রত। আমি নিজের সমস্ত সত্তার মধ্যে সে কথা শুনে, লাবণ্যের স্নিগ্ধতা অনুভব করলুম। হঠাৎ বক্তা একটু থামলেন।

তাঁর শান্ত, দুঃখ সুখের অতীত সেই শাশ্বত তৃপ্তির মুখখানার মধ্যেও যেন হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখা দিল। যেন এক স্বপ্নময় শ্যামল কৈশোরের মধুর অনুভব সেখানে ফুটে উঠতে চাইছে।

শ্রোতারা সেদিকে না তাকিয়ে পারল না। তাদের গভীর আগ্রহ, কিন্তু…! কিন্তু সর্ব্বকালের সংবেদনশীল মানব হৃদয় যা কামনা করে, মানুষের শিল্প তাকে রূপ দিতে চাইলেও বিধাতার শিল্প সে নিয়ম মানে না। সুতরাং বক্তা যা বললেন—তার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল কি? তাদের উষ্ণ স্বপ্ন ইতিমধ্যে এ গল্পের এক মধুর সমাপ্তি কল্পনা করে ফেলেছে—অথচ…।

বক্তা আবার বলতে লাগলেন : আমার অবুঝ মন তখন শুধুমাত্র অনাবিল সুখের কল্পনা ছাড়া আর তো কিছু করতে পারেনি।

আর কিছুই মনে পড়তো না তখন। আমি ভাবতে পারতুম না, আমার কোন অতীত ছিল। আমি মনে করতে পারতুম না, কোনদিন রাজমহল পাহাড়ের প্রগাঢ় ইঙ্গিত আমাকে মুগ্ধ করেছিল। শুধু আমার যেন ছিল সেই স্বয়ম্ভু বর্ত্তমান, আমি আর রাজকন্যা প্রিয়দর্শিনী।

কিন্তু হঠাৎ সেই অনাবিল জীবনের মধ্যে প্রচণ্ডতম আঘাত এল আমার। একদিন প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘুম ভেঙে বারান্দায় এসে যখন সেই প্রিয়তম মুখখানা দেখবার আশা করছিলুম, এই প্রথম হঠাৎ তাকে দেখতে পেলুম না। কিছুকাল আমি অপেক্ষা করলুম। ভাবলুম, আজ বুঝি তার ঘুম ভাঙতে দেরী হয়েছে। এই এখনি সে আসবে। আমার কথা মনে পড়তেই সে ছুটে আসবে। কিন্তু সময় কাটতে লাগল, তবু সে এল না। আমার প্রথম প্রথম তীব্র অভিমান হচ্ছিল। তখনো সে কেন এলনা তাই ভেবে। সে শুধু আমারই জন্য। আমি যখন তাকে আকাঙ্ক্ষা করব, তখন তাকে না পেলে তার উপর আমার রাগ করবার অধিকার আছে। একটা সদ্য প্রস্ফুটিত পুষ্পকে বৃন্তচ্যুত

করে নিজের হাতে ধরে ছিলুম আমি। কিন্তু সময় হয়ে গিয়েও যখন সে এল না, তখন সেই ফুলের উপরই আমার রাগ হল। আমি ছুঁড়ে ফেলে দিলুম সেই ফুলকে। তারপর আরো কিছুক্ষণ সাগ্রহে অপেক্ষা করলুম। সতৃষ্ণ নয়নে বার বার অন্তঃপুরের দিকে তাকাতে লাগলুম।

মনে হল, আমি সেই অন্তঃপুরে নিজে যাই। তিরস্কার করি গিয়ে কেন সে এল না, সেইজন্য। একটা নিতান্ত ব্যহত ক্ষোভের দৃষ্টি ফেলতে লাগলুম সেই রাজপুরীর দিকে। পাষাণ প্রাচীরের ব্যবধানকে পুড়ে ভস্মীভূত করে দেবার ইচ্ছে হল আমার। বিরাট অভিমানে চোখে জল আসতে চাইল।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে নিজের মনের মধ্যে অন্য সন্দেহ দেখা দিল। সে অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো! তার কোন অসুখ করেনি তো! ব্যাকুল চিত্তে মনে হল, অন্দরে ছুটে যাই। কিন্তু সে অন্দরকে আমি বড় ভয় করতুম। দুয়ারে থাকতো ভীম দর্শন ফৌজ। রাজমাতার গম্ভীর্য্যের অন্তরালে আমি মনের স্পর্শ পেয়েছিলুম, কিন্তু রাণীকে আমি খুব অল্পই দেখেছি মাত্র।

অপূর্ব্ব সুন্দরী তিনি এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু কেমন যেন অত্যন্ত গম্ভীর। তাঁর কাছে যাবার সাহস আমার নেই। কখনো নেই। রাণীর সেই নিষ্ঠুর গাম্ভীর্যের কারণ কি, আমি জানতুম না। সুতরাং অন্দরের ভিতরে যাবার প্রশ্ন ছিল আমার সাহসের সীমার বাইরে। আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় যত উত্তেজিতই আমি হই না কেন, আমি তো জানতুম, আমি পূজারী। এবং আমার গাতিবিধি সীমাবদ্ধ শুধু এই মন্দির আর প্রাঙ্গণ, বাগিচা আর সরোবর পর্যন্ত। তার বাইরে নয়।

সে কথা ভেবে আমার বুকটা দমে গেল। আমি কোন উপায় দেখলুম না। মনে পড়ল কুন্দের কথা। সেও আসেনি। রোজ আসে সকালবেলা। আজ প্রয়োজন আছে বলে তারো দেখা নেই। কুন্দের উপরই আমার রাগ হল তখন। সে এলে তার কাছে অন্ততঃ জিজ্ঞেস করে জানতে পারতুম প্রিয়দর্শিনীর না আসবার কারণ। কিন্তু সে এল না।

আমার বুকের মধ্যে দারুণ অস্থিরতা অনুভব করে মন্দিরের বারান্দাতে

পায়চারী করতে লাগলুম। কিন্তু স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়িয়ে নিজের মনের সঙ্গে অনবরত কথা বলবার সময় আমার ছিল না। আমাকে পূজো করতে হবে। কুন্দের মা এল। মন্দির ধুয়ে পূজার উপকরণ সাজাতে লাগল। মনে হল, তাকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু তার কথা যেন কাউকে কিছুতেই বলা যায় না। কেন যায় না, কে বলবে। আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলুম না।

স্নান সেরে আমি পূজার জন্য প্রস্তুত হলাম।

রাজমাতা এলেন যথাসময়ে পূজাসম্ভার নিয়ে।

আমি একান্ত মনে আশা করেছিলুম—তাঁর সঙ্গে প্রিয়দর্শিনী নিত্যকার মত আসবেই। কিন্তু একক ভাবে তাঁকে আসতে দেখে আমি চম্‌কে উঠলুম। আমার মনের মধ্যে অসীম যন্ত্রণা হল।

কি আশ্চর্য! সকলই কি মন্ত্র বলে পরিবর্তিত হয়ে গেল! যে নিত্য এখানে আসত সে আজ এল না। তার সম্পর্কে কোন কথাও কেউ বলছে না। অথচ আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে তার সংবাদ পাবার জন্য।

কিন্তু তারা কেউ স্বতস্ফূর্ত্ত ভাবে সংবাদ আমাকে দিল না, বা দেবার প্রয়োজন বোধ করল না।

একটা যন্ত্রণা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি আসনে বসে গোবিন্দজীর পূজা করতে লাগলুম। কিন্তু অভিমানের একটা কান্না আমার বুক ঠেলে বার বার উঠতে লাগল। শুধু বুকের দীর্ঘনিঃশ্বাসে সেই যন্ত্রণা প্রকাশ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না।

পূজো শেষ হল।

মন্দির ত্যাগ করে ওরা সব চলে গেলেন।

আমি নিজেকে একা পাবার জন্য হাঁফিয়ে উঠছিলুম। আর বিলম্ব না করে বাগিচায় গিয়ে আমি পরিচিত সেই ঘাসের উপর বসে পড়লুম। আর অনবরত ভাবতে লাগলুম সেই পরিচিত ছুটি চোখের কথা।

কিন্তু আমি যতই ভাবতে লাগলুম, ততই আমার মনের মধ্যে যন্ত্রণা হতে লাগল। আমার মনে হল, আমি ঐ ঘাসের বুকে শুয়ে পড়ি, বুক চেপে ধরি মাটির উপর। করলুমও তাই। মাটীতে বুক রেখে আমি

পৃথিবীর বুকে কান রাখলুম। আমার কিছুই ভাল লাগতে লাগল না। আমি স্থির হয়ে কোথাও ছদণ্ড থাকতে পারলুম না।

ঘাসের বুক ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। মন্দিরে এলুম। গোবিন্দজীর পায়ের কাছে পড়ে প্রার্থনা করলুম: ঠাকুর আমার তুমি ব্যথা দিও না।

প্রার্থনা করলুম তার কাছে: প্রিয়দর্শিনীকে তুমি আবার এনে দাও।

সময় গেল। তবু সে এল না। আমি বার বার ঠাকুরের কাছে তার জন্য প্রার্থনা জানালুম। বললুম: ঠাকুর তুমি অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন, তবে তাকে এনে দিচ্ছ না কেন?

একদিন গেল। দুদিন। তিনদিন।

আমার বুকের ভিতর যেন আগুনের হল্কা লেগে পুড়ে গিয়েছে এমন যন্ত্রণায় আমি ছট্‌পট্‌ করতে লাগলুম। আমার কিছু ভাল লাগল না। মুখের রুচি থাকল না। খেতে ইচ্ছে হল না। শুধু সেই এক অন্তর্দাহের প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলুম। বার বার ঠাকুরের পায় মাথা কুটে বলতে লাগলুম: ঠাকুর তুমি তাকে এনে দাও।

তবু সে এল না। ঠাকুরের উপর রাগ হল: কেন, কেন তুমি তাকে এনে দিচ্ছনা? তোমার এত শক্তি, অথচ তুমি নীরব নিষ্ক্রিয় থাক কেন?

ঠাকুর আমার কথা শুনলেন না।

অবশেষে চতুর্থ দিনে আমি কুন্দর মাকে জিজ্ঞেস করলুম। কিন্তু স্পষ্ট প্রিয়দর্শিনীর কথা আমি তাকে বলতে পারলুম না। ও নাম বলতে যেন আমার বুক কেঁপে উঠত। শুধু আমি আমার মনে, নিজের মনের মধ্যে সে নাম স্মরণ করতুম। তাই বললুম: কুন্দ আসছে না কেন? কুন্দর মা বলল: ঐ দেখ; তুমি জান না বুঝি! তুমি বাপু কচি ঠাকুর, পুজো আচ্ছা নিয়েই আছো, রাজ্যশুদ্ধো লোক জানে।

আমি বললুম: কি?

আমার মনে তখন একটু আশা হল। ভাবলুম, বুঝি প্রিয়দর্শিনী কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। বুঝি রাজামশাই কোথাও গিয়ে থাকবেন।

কিন্তু কখন, কি ভাবে কোথায় গেল—আমি জানতে পারলুম না! কৈ, প্রিয়দর্শিনী তো সে সম্পর্কে আমাকে কিছু বলে গেল না!

কিন্তু আমি যা শুনতে চাইনি, আমার মনের গোপন অন্তঃপুরেও আমি যে সন্দেহ করিনি—আমাকে তাই শুনতে হল। আমি শুনলুম না, যেন নিষ্ঠুর অপ্রত্যাশিত আঘাতে ভেঙে গুড়িয়ে গেলুম।

কুন্দর মা বলল: রাজকন্যার বিয়ে গো। অন্দর থেকে তাই বেরুনো নিষেধ। কুন্দ ছাড়া সঙ্গে থাকবে কে। তাই কুন্দ এই তিনদিন অন্দরে বন্দী।

আমার হৃদপিণ্ডে প্রবল আঘাত অনুভব করলুম আমি। আমার পা দুটো টলতে লাগল। আমার মুখ কালো হয়ে এল। কিন্তু মনের সেই যন্ত্রনা বাইরে প্রকাশ করবার উপায় নেই। সে যে আমার নীরব মনের একান্ত কথা!

বক্তা থামলেন।

তার ঈশ্বরোপলব্ধির স্বরূপও বুঝি তাকে মুহূর্ত্তের জন্য অতীত-স্মৃতি স্মরণে চঞ্চল করে তুলল।

তিনি বললেন: হায়রে অবুঝ কৈশোর! তখনো সে সম্ভব অসম্ভবের বিচার করতে পারেনি।

আবার একটু থামলেন তিনি।

শ্রোতাদের মধ্যে কোন কথা নেই। এ অপ্রত্যাশিত আঘাত যেন তাদেরও। শুধু সেই কালো মেয়েটি সে-ই বুঝি একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বক্তা আবার বলতে আরম্ভ করলেন: আমি যথাসম্ভব কুন্দর মার কাছ থেকে নিজের মনের ভাবটাকে লুকোবার চেষ্টা করলুম। অনেকক্ষণ বক্‌বক্ করল কুন্দর মা।

আমি তখন শুধু নীরবে একা হতে চাইছিলুম। আমার দুই চোখের জলকে ছেড়ে দিতে না পারলে বুকের যন্ত্রনাতে আমি মরে যেতুম নইলে।

আমি শুধু মনে মনে বললুম: তুমি যাও। তুমি যাও। আমি কাঁদব।

কুন্দর মা চলে গেল। আমি গোবিন্দজীর মুখের দিকে তাকালুম। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলুম। তারপর তার পায়ের কাছে পরে হাহাকার করে কেঁদে উঠলুম।

অনেকক্ষণ শুধু কাঁদলুম। তারপর কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে নিজের শয়ন কক্ষের দিকে এগোলুম। বিছানায় ঝাপিয়ে পড়লুম সেই দিনের বেলাতেই।

বাইরের পৃথিবীর আর আমার কোন আকর্ষণ ছিল না।

নীরবে চোখ বুজে গভীর অন্ধকারের মধ্যে শুধু কাঁদতে আমার ভাল লাগল। আকাশ নয়, বাতাস নয়, পশু নয়, পাখী নয়, মানুষ নয়, আমার শুধু কাঁদতে ভাল লাগল।

সারাদিন কাঁদলুম আমি।

আর উঠবার ইচ্ছা ছিল না—, তবু কিসের এক প্রলোভনে অপরাহ্নে আমি উঠে বাইরে এলুম। কিন্তু না। সে আসে নি। আমার মনে হল, আবার আমি শুয়ে পড়ি। আবার কাঁদি।

কিন্তু কাঁদবার অবসর সর্ব্বক্ষণ আমারও নেই।

সন্ধ্যারতি করতে হবে আমাকেই। সুতরাং আমি প্রস্তুত হয়ে নিলুম।

সন্ধ্যাবেলা সেদিন রাজমাতাও এলেন না। আগত বিবাহের জন্য অন্তঃপুরের নানা কাজে তিনিও হয়তো ব্যস্ত।

আমি কুন্দর মার পাশে দাঁড়িয়ে আরতি করলুম। কিন্তু বিরাট অভিমানে গোবিন্দজীর মুখের পানে তাকিয়ে আমার চোখে শুধু জল আসছিল।

কিন্তু সে জলকে গোপনে রাখতে হবে, লুকিয়ে রাখতে হবে, অপরে যাতে না দেখে, সে বড় লজ্জার।

কুন্দর মার আড়ালে আমি চোখের জল মুছলুম।

কিন্তু কুন্দর মা আমাকে আরো আঘাত দিল, বলল: জান, মেয়ে বড় ভয় পেয়েছে। বিয়ের নাম শুনে মুখ এতটুকু হয়ে গেছে। শুধু বলছে, বাগানে বেড়াতে যাব। ওরা বাগানে আসতে দিচ্ছে না বলে কান্নায় ভেঙে পড়ছে।

শুনে আমার আরো কান্না পেল।

আমি শেষবার সরোবরের পাশে তার দেহের সেই জীবন্ত স্পর্শকে যেন অনুভব করলুম। কত কথা সে বলেছিল আমাকে।

আমার চোখে আবার অশ্রুর প্লাবন ছুটতে চাইল।

তাড়াতাড়ি আরতি শেষ করে আমি শয়নকক্ষে ফিরে এলুম।

কুন্দর মা বলল : খাবে না?

আমি বললুম : না! শরীর ভাল নেই।

আমি খেতে পারতুম না সেদিন। কিছুতেই নয়। কিছুতেই নয়।

রাতে ঘুমাতে পারলুম না। অনেক রাত অবধি জেগে জেগে চিন্তা করলুম। আবার আমার সেই নিজের গ্রাম, সহাস্য শ্যামল মাঠ, দূরে রাজমহল পাহাড়ের গাঢ় ছায়া, সব মনে পড়ল।

আমার মনে হল, যাই, সেই মুহূর্তে ছুটে যাই সেই ফেলে-আসা দিনগুলির কাছে।

একবার ভাবলুম : না, কাল ভোরে উঠেই চলে যাব, নিজের গ্রামে। কাউকে না জানিয়েই চলে যাব।

কিন্তু? কিন্তু বাবার সেই ভীষণ মেজাজের কথা মনে পড়ে গেল। আমাকে এ মন্দিরের পুরোহিত করে দিয়ে তিনি প্রতি মাসে রাজার কাছ থেকে মাহিনা নিয়ে যান। অর্থের প্রতি তার দারুণ লোভ। জানি না সে অর্থ দিয়ে তিনি কি করেন।

আমি যদি হঠাৎ এই পুরোহিতের কাজ পরিত্যাগ করে তাঁর কাছে চলে যাই, তিনি আমাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তাঁর সেই ক্রোধকম্পিত মূর্ত্তির কথা চিন্তা করতে আমার ভয় হল।

কিন্তু এখানে যে থাকা যায় না! আমাকে যেতে হবে। কোথায় যাব?

নতুন অপরিচিত মানুষের মধ্যে আমি আবার কোথায় যাব?

আমি কিছুই ঠিক করতে পারলুম না—। অন্তরের যন্ত্রনাতে ছট্‌পট্‌ করতে লাগলুম।

বক্তা থামলেন।

শ্রোতারা বিমর্ষ।

গল্পের প্রামাণ্য কি? ঈশ্বরের সঙ্গে এ গল্পের কি সম্পর্ক, সে সব কথা তাদের মনে এল না। এ কয়দিনে ঈশ্বরের কথা তারা ভুলেই গেছে বোধ হয়। শুধু একটা গল্পের আকর্ষণে মেতে আছে। সেই গল্প যে এমন বেদনার মধ্যে এসে শেষ হতে চাইবে, কে জানতো।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে গল্পের সেই বিষণ্ণ নীরবতা তখনো যেন বাজছে। তারা সব উঠে দাঁড়ালো। একটা আচ্ছন্ন ভাবে গৃহের দিকে পা বাড়াল। আজ শুধু সর্ব্বশেষে উঠল সেই কালো মেয়েটি। বক্তার একটু নিবিড় কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল সে। বিরাট একটা সমবেদনার দৃষ্টি তুলে তাকালো তাঁর দিকে। তারপর পথে নামল।

অন্ধকারের মধ্যে নেমেও দুবার সে পিছন ফিরে দেখল।

কিন্তু কোনদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। অতীত দিনের স্মৃতির মধ্যে কি তিনি ডুবে রয়েছেন ?

পাঁচ

রাত্রিটা সকলের একটা বেদনার নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটল। সকালে যখন ঘুম ভেঙে উঠল, ওরা দেখল—সেই বিষণ্ণ বেদনার স্মৃতি তখনো যেন মনের উপর লেগে রয়েছে তাদের।

কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই গল্প বলার মানুষটি প্রত্যূষের আলোতে অত্যন্ত শান্ত। তেমনি সুন্দর এবং লাবণ্যময় মুখ। সেখানে কোন দুঃখ বেদনার চিহ্ন আছে বলে মনে হয় না। উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনার আনন্দ নয়, এক ভাললাগা স্নিগ্ধতায় ভরে আছেন তিনি।

জীবনে সত্যানুভবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান—সে কথাই বলতে এসেছেন তিনি। অথচ সে কথা সকলে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। শুধু জীবনের কথাই শোনা গিয়েছে—ঈশ্বরের কোন ইঙ্গিত তো তখনো আসেনি! গত রাত্রির গল্পই যদি শেষ হয়—তবে সব ভুল। এই বেদনার মধ্যে ঈশ্বর কোথায়? নেই। অন্ততঃ যেন ঈশ্বরের বিশাল জগতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

যদি তার আকুল আবেদনে গোবিন্দজী কান দিতেন, যদি অসম্ভবকে সম্ভব করতেন সাধারণ মানুষের হাতে রাজকন্যাকে সমর্পন করে, তবে হয়তো তাঁর অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস জন্মাতো। কিন্তু তখনো তো গল্প শেষ হয় নি! হয় তো ঈশ্বর এসে সেই রাজকন্যাকে এরই হাতে দিয়েছিলেন—। সন্দেহ দানা বাঁধতে পারে না। শেষ পর্যন্ত একটা কিছুর আশায় আবার সকলে তাঁর প্রতি আগ্রহ অনুভব করে।

কোন চিন্তা, কোন ভাবনা, কোন দুঃখের প্রশ্ন এই মানুষের সন্তানের সেই গল্পের বাইরে নেই বোধ হয়। তার শেষ স্মৃতিটুকুকে নিজের মধ্য থেকে মুছে ফেলে দিয়ে দিনের আলোতে তিনি মানুষের সঙ্গে আবার মাঠে নামলেন। কষ্টের মধ্যে তার—আর এক সপ্রেম প্রকাশ।

সারা দিন মানুষের সঙ্গে কর্ম করবার পর মন্দিরের প্রাঙ্গনে তিনি যখন ফিরে এলেন; দেখলেন সেই কালো মেয়েটি বসে আছে।

তিনি সহাস্য মুখে তার দিকে তাকালেন : কি খবর ?

দুটো চোখকে সমবেদনায় বিস্ফারিত করে যেন সে তাকাল তাঁর দিকে।

তিনি হাসলেন, কি ?

অঞ্চলের আড়াল থেকে সেই মেয়ে দুটি ফল বের করল।

তিনি বললেন : কার জন্য ?

তোমার জন্য।

—আমার জন্য ?

—হ্যাঁ।

—দাও।

হাত পেতে নিলেন তিনি। পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কোন্ ঘর।

—ঐ সেদিকে, বলে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল মেয়েটি।

তিনি বললেন : তোমায় কবে শ্রম দিতে হবে আমাকে ?

—কেন ?

—তুমি আমাকে ফল দান করলে।

সে নিয়ে কোন বাদানুবাদ করল না মেয়েটি। শুধু আর একবার তাকিয়ে দেখল তার দিকে। কি যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখবার চেষ্টা করল।

তিনি হেসে বললেন : কি দেখছ ?

সে বলল : তোমার খুব দুঃখ, তাই না ?

—কেন ?

—তুমি যে কাল গল্প করলে।

তিনি একটু হাসলেন। বললেন : না। দুঃখের মধ্যে আনন্দ আছে। দুঃখের মধ্য দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়।

মেয়েটি বলল : না, তুমি মিছে বলছ—, তোমার অনেক দুঃখ।

তিনি আবার হাসলেন। বললেন : গল্প তো আমার শেষ হয় নি। তুমি গল্প শোন।

সে বলল : আমার দিদা বলল—তোমার দুঃখ, তুমি একা।

তিনি বললেন : আমি একা নই, দুঃখের মধ্যে আমি সবাইকে পেয়েছি।

মেয়েটি বলল : আমি তোমার জন্য কি করতে পারি ?

তিনি বললেন : গল্প শুনবার পর তোমার যা ইচ্ছে।

আর একবার তাঁর মুখের দিকে ঘনিষ্ঠ ভাবে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করল মেয়েটি,—তার পর চলে গেল। সে তার নিজের মনের মধ্যে কি সিদ্ধান্ত নিয়ে গেল সেই জানে।

সাধারণ মানুষের গৃহে আহার করলেন নতুন অতিথি। সন্ধ্যা নামল। মন্দিরের আরতি শেষ হলে—প্রদীপ বাইরে এল। লোকেরা জড় হল মন্দিরের বারান্দায়। কাহিনী এখনো শেষ হয় নি, কাহিনী শুনতে হবে। ঈশ্বর আড়ালে রয়েছেন। এখনো তাদের কাছে শুধু কাহিনীর আকর্ষণ।

কাহিনী দুঃখের। শুনতে ব্যথা লাগে। কিন্তু দুঃখের কাহিনী শুনবার জন্য যেন বেশী আগ্রহ জন্মে মনে। কেন যে এরকম হয় ওরা বুঝতে পারে না। আকাজ্ক্ষার সেই অজ্ঞাত রহস্য তাদের নিয়ে এল আবার সেখানে—যেখানে সেই নতুন অতিথি জীবনের মধ্য দিয়ে জীবনাতীতের কাহিনী শোনবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সকলে এসে যে যার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অতিথিকে ঘিরে বসল। অন্ধকার জগতের দৃশ্যাবলীকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। শুধু প্রদীপের আলোতে সেই গল্পকারকে দেখা যায়। তিনি ভূমিকা না করে অসমাপ্ত গল্পের রেশ ধরে কাহিনী আরম্ভ করলেন : আমি পালাতে চাইলুম। কিন্তু কোথায় যাব ঠিক করতে পারলুম না। পরিচিত কোন আশ্রয়স্থান আমার দৃষ্টিতে পড়ল না। হাজারো বেদনা বুকে জমা হলেও অপরিচয়ের ভয়কে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারলুম না আমি।

এই ভাবে রাত্রি কেটে আবার দিন এল। আমি একটা মৌন বেদনায় নিতান্ত ম্রিয়মান হয়ে গিয়েছিলুম। এই পৃথিবীতে আমার কিছু নেই। আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ এই কথা ভেবে শুধু আমার চোখ দিয়ে জল আসছিল। সেই সকালেই করুণ সুরে সানাই বাজছিল রাজবাড়ীর প্রবেশ পথে। আমি প্রাণহীন নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তির মত নিজের তুচ্ছতার কথাকে স্মরণ করে দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলুম।

উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ জীবনের একটা মৌন ব্যথা নিয়ে নিতান্ত ম্লান ভাবে আমি মন্দিরে পূজার জন্য অগ্রসর হলুম। মাঝে মাঝেই কেঁপে কেঁপে

আমার মধ্য থেকে অশ্রুর আবেগ বেরিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু আমার সেই অশ্রুর প্রবাহকে লক্ষ্য করবার জন্য সেদিন কেউ ছিল না। আর সেই না থাকাতে আমার বেদনা অত্যন্ত লাঘব হয়েছিল, কারণ বুকের জমানো বেদনা অনর্গল অশ্রু হয়ে ঝরে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল।

সেই কুন্দের মা কখন মন্দির ধুয়ে দিয়ে পূজা উপকরণ সাজিয়ে চলে গিয়েছিল। আমি শূন্য মন্দিরে চোখের জলে ভিজে ভিজে পুজো করলুম।

তিন দিন কত প্রার্থনা, আকুল আবেদন জানিয়েছি ঠাকুরকে। আজ আর কোন আবেদন জানালুম না। শুধু বললুম: কাঁদাও, কাঁদাও আমাকে তুমি, যত পার কাঁদাও।

সেই সানাইয়ের করুণ আঘাতের নীচে সারা দিন এক উদাস বেদনায় আমি ভেঙে যেতে লাগলুম।

সন্ধ্যায় আরতির মুহূর্তে আমি রাজগৃহে কেঁদারাতে সানাইয়ের রব শুনলুম। আমি কেঁদে কেঁদে আমার ঠাকুরকে আরতি করলুম।

দুটো দিন প্রবল আনন্দ আর উচ্ছাসের মধ্য দিয়ে রাজবাড়ী কাটল। সেই বিপুল উচ্ছাসের মধ্যে নগণ্যতম প্রাণের সন্ধান নেবার জন্য কেউ ছিল না। আনন্দের উচ্ছাস কাটল। নব বধূকে নিয়ে ভিন দেশের রাজার ছেলে চলে গেলেন।

আমি ব্যর্থ, উদ্দেশ্যহীন একটা শূন্য মনে আবার কাজ করে চললুম। কিছু চাইবার ছিল না। কিছু জানবার ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে অকারণে অশ্রুর ঝর্ণা নামতো দুই চোখের কোণ বেয়ে।

সেদিন সকালে উদ্দেশ্যহীন আকাশের গায়ে তাকিয়ে থাকলুম; কখন সেই কুন্দ এসে ছিল বাগানের পথে মন্দিরে, আমি জানতুম না।

হয়তো সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখেছিল 'আমাকে—আমার দৃষ্টি পড়ে নি॥ আমার দৃষ্টি তখন কোথাও ছিল না—ঐ আকাশের দিকে তাকিয়ে আকাশেও নয়! মাঝে মাঝে শুধু বিস্ফারিত লাবণ্য ভরা চোখ আমার মনে ভেসে উঠছিল আর সেই মুহূর্তে নিজের মধ্যে একটা অশ্রুর আবেগ অনুভব করছিলুম আমি।

একবার পাশে মুখ ফেরাতে কুন্দকে দেখলুম। আমার বেশ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

আমার ভাল লাগল না। মানুষকে আমার ভাল লাগে না তখন। শুধু ভাল লাগে নীরব একাকিত্ব।

কুন্দ কি তখন কিছু বুঝতে পারত ?

সেকি আমার মধ্যে অস্থির যন্ত্রণাটা ধরতে পেরেছিল ?

সে বলল : প্রিয়টা কেমন চলে গেল, তাই না! সত্যি, ভারি মনটা খারাপ লাগছে।

সে মুহূর্তে কুন্দকে আমার অত্যন্ত বিশ্রী লাগল! তার কথাগুলোকে অত্যন্ত হিংসুটে আর ঝগড়াটে বলে আমার বোধ হ'ল। আমি প্রিয়দর্শিনীকে ভালবাসতুম, এটা ও জানতো। ওকে বাসিনি। তাই এখন ও আমাকে বিদ্রূপ করতে এয়েছে। সে নাম আমার মনের মধ্য থেকে আমাকে ব্যথা দিচ্ছে, বাইরে থেকে আবার ব্যথা দিক .এ আমি চাই না।

হঠাৎ কুন্দের মুখে সেই নামটা যেন একটা তীক্ষ্ণ শরের মত এসে আমার হৃদপিণ্ডে লাগল।

আমি পরাজিত।

পরাজয়ের পরে এ চূড়ান্ত অপমানের আঘাত।

আমি কুন্দের কথার কোন উত্তর দিলুম না। প্রিয়দর্শিনী সম্পর্কে কোন রকম কৌতূহল দেখালুম না। সে নাম নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি শুধু চাইছিলুম—ভুলতে। সব কিছু ভুলতে।

কিন্তু নাছোড়বান্দা পুঁচকে মেয়েটা যেন আমাকে যন্ত্রনা দেবাব জন্য ইচ্ছে করেই এসেছে।

এতদিন আমি ওকে অবজ্ঞা করেছি, আজ ও তার প্রতিশোধ নিতে চায়।

ও বলল : আহা! বিয়ের সময় তো তোমাকে দেখলাম না গো ?

আমার রক্তাক্ত হৃদয় আঘাতে আঘাতে আরো সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

আমি বললুম : আমি তখন পুজো করছিলুম।

—সে কি গো ? তুমি সব সময়েই পুজো করলে ?

আমার মনে হ'ল, আমি ওকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিই। এত কৈফিয়তে ওর কি প্রয়োজন! অত্যন্ত কুৎসিত, কুৎসিত ও মেয়েটা।

কিন্তু ও আমাকে যন্ত্রনা দেবার জন্যই এসেছিল বুঝি। বলল: জান, এ কয়দিন ও কি কান্নাটাই না কেঁদেছে।

হায়! কে শুনতে চায় এ কথা! আমার হৃদয় হাহাকার করছে, তবু ও আমাকে শোনাচ্ছে। আমাকে ব্যথা দেবার জন্যই বোধহয়।

আমি নীরবে চুপ করে সেই ব্যথা সহ্য করলুম।

এক সময় আমার নীরবতা দেখে ও বুঝি ক্লান্ত হল। বলল: কি গো, তুমি যে একটিও কথা বলছ না! আমার উপর রাগ করে আছ বুঝি? বেশ, তবে চললুম—তবে আর আসব না।

আমি মনে মনে বললুম: যাও, যাও, তুমি গেলে আমি বাঁচি। আমি এখন একা থাকতে চাই।

ও চলে গেল। আমি চোখের জল ছেড়ে দিলুম।

আমার কি হ'ল। সেই থেকে আমি কুন্দকে দারুণ ভয় করে চলতে লাগলুম। এইজন্য ভয় যে—ও প্রিয়দর্শিনীর কথা তুলবে। অথচ আমি তাকে ভুলতে চাই। ও রাগ করে চলে গিয়েছিল। আমি ভাবলুম: ও আর আসবে না। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে একা ঘুরে বেড়াব বলে বেরোলুম। কিন্তু আমি যা আশা করিনি—সেই অপ্রত্যাশিত জিনিস আমি দেখলুম। দেখেই আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আমি দেখলুম: কুন্দ দাঁড়িয়ে। গোবিন্দজীর ওপর রাগ হোল। বললুম: শুধু দুঃখ দিয়ে তোমার হয় না। দুঃখের উপরও তুমি কেন দুঃখ দিতে চাও?

আর যাই হোক, কুন্দকে সেই মুহূর্তে সহ্য করার ক্ষমতা আমার ছিল না। আমার সমস্ত চেতনা মন্থন করে যে আমার মনে একটা জলন্ত যন্ত্রনার স্মৃতি হয়ে আছে—আমি কিছুতেই সেই মুহূর্তে কেউ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেই নাম মনে করিয়ে আমাকে কষ্ট দেবে তা সহ্য করতে রাজি ছিলুম না। রাজি ছিলুম না মানে কি? সহ্য করার মত ক্ষমতা আমার ছিল না। সে নাম শুনলে আমার হৃদয় কাঁপতো—বুকে অসীম যন্ত্রনা হোত।

তাই কুন্দকে দেখে আমি পালিয়ে গেলুম। আমি শিরিষ গাছের আড়ালে—যেখানে কুন্দ আসবার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে গিয়ে বসে থাকলুম।

অনেকক্ষণ বসে থাকলুম আপন মনে। উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস একের পর এক আমার বুক থেকে বেরুতে লাগল। কথনো সহ্য করতে না পেরে বলে উঠতে লাগলুম: হে ঠাকুর, তুমি আমাকে এ ব্যথা কেন দিলে?

অনেকটা বেলা হ'ল। তখন কুন্দের থাকবার কোনরকম সম্ভাবনা ছিল না। আমি উঠলুম। দেখলুম, কুন্দ চলে গেছে। আমি সরোবরে স্নান সেরে পুজোর জন্য প্রস্তুত হলুম।

সর্বত্র সবাই যেন যন্ত্রনা নিয়ে অপেক্ষা করছে আমার জন্য। সরোবরে স্নান করতে গিয়ে পদ্মকলির দিকে তাকাতেই প্রিয়দর্শিনীর কথা মনে পড়ে গেল আমার। কতদিন আমি তাকে রক্ত পদ্ম তুলে এনে দিয়েছি। সেই পদ্মকলিগুলোর দিকে তাকাতে প্রবল আঘাত পেলুম মনে। ফেরার পথে বাগিচার যে ফুলের দিকেই তাকাই, দেখি প্রিয়দর্শিনী রাজকন্যার স্মৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। কবে, কখন তাকে কোন্ ফুল তুলে দিয়েছি—মনে পড়ে যেতে লাগল আমার।

আমি তাড়াতাড়ি বাগিচা এড়িয়ে ঘরে এলুম।

মনে করলুম—আর কখনো ওদিক দিয়ে চলব না।

মন্দিরে এলুম পূজা করতে—কিন্তু চোখ বুজতেই মনে হল ঐ পাশে ওখানটায় বসে থাকতো সে।

আমি কেঁদে ফেলে বললুম: ঠাকুর তুমি যদি আমায় এত যন্ত্রনা দেবে তবে আমাকে এখান থেকে আর কোথাও নিয়ে যাও। তোমার অসীম শক্তি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমাকে তুমি আর দুঃখ দিওনা ঠাকুর।

কত ডাকলুম ঠাকুরকে—কিন্তু অন্য কোনখানে যাবার পথের সন্ধান তো পেলুম না!

সারাটা দুপুর যন্ত্রনাকাতর মনে আমি নিজের ঘরে শুয়ে থাকলুম। বিকেলের আভা ফুটে উঠতেই ঘর ছেড়ে সেই শিরিষ গাছটার আড়ালে গিয়ে বসলুম। এই একমাত্র জায়গা যেখানে আগে আমি আসিনি। সেখানে কোন স্মৃতি জড়িয়ে নেই। আর সেখানে যাবার কারণ এই যে কুন্দ তার সন্ধান জানে না। কুন্দকে এড়ানোও আমার ছিল তখন নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ কুন্দ এলেই সেই প্রিয়দর্শিনীর কথা তুলতো।

আমি সে কথা শুনতে ভয় পাই। সুতরাং কুন্দকেও আমি ভয় পেতে লাগলুম।

সন্ধ্যার ছায়া নামলে যখন কুন্দর আর বাগানে থাকবার কোন সম্ভাবনা থাকল না—আমি বেরিয়ে এসে মন্দিরে সন্ধ্যারতির জন্য প্রস্তুত হলুম।

অনেকদিন পরে রাজমাতা আবার এলেন। হাতে নিয়ে এলেন পূজাপোকরণ। আমি তার দিকে মলিন দৃষ্টিতে তাকালুম। তিনি কিশোর পূজারীর সন্ধান করে—জানেন না যে আমাকে কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিলেন।

রাজমাতা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: কয়েক দিনের ব্যস্ততায় আমি মন্দিরে আসতে পারিনি। কিন্তু সব সময় গোবিন্দজীর কথা মনে পড়তো। ঠাকুর আজকে মনোপ্রাণ ভরে আরতি কর দেখি।

হঠাৎ ঐ ভাবে কথা বলবার সময়—ম্লান প্রদীপের আলোতে আমার মুখখানি তিনি দেখে ফেললেন। বললেন: তোমার কি হয়েছে? তুমি এত বিষণ্ণ কেন? তোমাকে কৃশ দেখাচ্ছে। আমি আসতে পারি নি। কুন্দর মা বুঝি তোমাকে কোন যত্ন করেনি এতদিন! আহাহা, তোমার সুন্দর মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

আমি নিরালম্ব বঞ্চিত জীবনে কেঁদে কেঁদে নিজের মধ্যে একটা শূন্যতা বোধ আনবার চেষ্টা করছিলুম। আমি অবলম্বনহীন অতি তুচ্ছ, আমার কেউ নেই এই বেদনার মধ্যে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলুম। অনেকটা যেন চোখের জল শুকিয়ে আসছিল আমার।

হঠাৎ আবার তাঁর মধ্যে স্নেহের এতটুকু ছোয়া পেয়ে কান্না উথলে উঠল। আমি প্রায় কেঁদে ফেলতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আমার চোখের জল বের করা উচিত নয় বলে কাঁদলুম না। যদি রাজমাতা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেন, তবে আমি কি জবাব দেব! সুতরাং নীরব অবসরে কান্নার জন্য সেই আবেগ আমার বুকের মধ্যে আমি জমা রাখলুম।

রাজমাতা একটা স্নেহের দৃষ্টি মেলে কিছুকাল আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি শুধু একটা সিক্ত বেদনার ভারে টল্ টল্ করতে লাগলুম।

সেই বেদনার সিক্ততার মধ্যেই আমি আরতি দিলুম। আরতি দিলুম—অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণভরে। আর ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললুম: ব্যথা দাও, ব্যথা দাও, হে ঠাকুর তোমার ইচ্ছেমত আমাকে ব্যথা দাও। আমার কেউ নেই। তুমি যত পার ব্যথা দাও।

আরতি শেষ হল। রাজমাতা বিগ্রহকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে আশীর্বাদী ফুলের জন্য আমার দিকে হাত বাড়ালেন। আমি তাকে ফুল দিতে দিতে বললুম: সকলে সুখী হোক্। দুঃখ শুধু আমার থাক।

এমনি করে অফুরান অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে কাটল আমার আরো কিছু দিন।

বহুদিন শুধু কোন কিছু প্রার্থনা না করে গোবিন্দজীর কাছে কাঁদলুম। আমার তো তখন আর প্রার্থনা করবার কিছু ছিল না। যা ছিল আমার একান্ত কাম্য তা ততক্ষণ চিরকালের জন্য আমার হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। কখনো আর কিছু চাইব না, কখনো আর ভালবাসবো না কাউকে—এই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম।

কতবার এর মধ্যে কুন্দ মন্দিরে এল, বাগানে এল আমার খোঁজ করতে। কিন্তু আমি তাকে দেখলেই পালিয়ে যেতুম। সেই শিরীষ গাছের নির্জ্জন ছায়ার কথা সে জানতো না।

কিন্তু তবু একদিন তার মুখোমুখি আমাকে পড়ে যেতে হলই। কুন্দ এল তার মায়ের সঙ্গে সকাল বেলা মন্দির সাজাতে। আমি তাকে দেখে যথারীতি লুকিয়ে পড়লুম। মুখোমুখী হলে যদি সে সেই প্রশ্ন করে বসে?

অনেকক্ষণ বাইরে আমি সেই শিরিষ গাছটার নীচে অপেক্ষা করলুম। এবং যখন তার চলে যাওয়া উচিৎ সেই সময় হিসেব করে মন্দিরে ফিরে এলুম। কিন্তু এসে যা দেখলুম তাতে আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। দেখলুম কুন্দ বসে আছে—একা।

আমি ভাবলুম—এই মুহূর্ত্তেই সে তার সেই প্রচণ্ড অস্ত্রখানা আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেবে। আমি অত্যন্ত ভীত, ত্রস্ত বোধ করলুম।

কিন্তু না,—সে রাজকন্যার কোন প্রশ্নই তুলল না। শুধু অভিযোগ

তুলল: তুমি কি গো ঠাকুর—, কতদিন তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার বাসা নেই! তুমি কোথায় থাক গো?

আমি শুধু একটু হাসলুম।

কুন্দের প্রতি আমার তো কোন আক্রোশ নেই। শুধু সেই প্রশ্নটি সে করে বলেইতো আমার ভয়!

কুন্দ সে প্রশ্ন এবারও তুললনা। শুধু বলল: এবার যদি আবার এসে তোমায় না পাই, তবে কিন্তু রাগ করব।

আমি নিজের মনের মধ্যে ভাবলুম—কুন্দ কি তবে তার কথা ভুলে গিয়েছে? ভুলে যায়—সেই ভাল। আর যেন কখনো সে কথা আমাকে মনে না করিয়ে দেয়।

কুন্দ একটা ফুল দিল আমাকে: দেখ তোমার জন্য তুলে এনেছি।

আমি সেই ফুল হাতে নিয়ে কুন্দের মুখের দিকে তাকালুম। কুন্দ অনিন্দ্য সুন্দরী নয়! কিন্তু তার, চোখে কই নিষ্ঠুরতার কোন চিহ্নই তো নেই! দারিদ্র্যের মধ্যেও সে প্রচুর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ তার নয়—, কিন্তু শ্যামল স্নিগ্ধতা আছে তার দেহে।

কুন্দ চলে গেল।

এই বহুদিন পরে আমি আর তেমন দুঃখ পেলুম না। কুন্দ সে প্রশ্ন তুলে আমাকে ব্যথা দিল না বলে আমি নিজেকে হাল্কা বোধ করলুম। সেই রাত্রে নিজের শয়ন কক্ষে শুয়ে শুয়ে আমি ভাবলুম: কুন্দকে আমি ভয় পেয়েছিলুম কেন! সেত আমাকে কখনো কটু কথা বলেনি, ব্যথা দেয়নি। তবু কুন্দের প্রতি আমার এত আক্রোশ ছিল কেন! একটু দুঃখ বোধ হল কুন্দের প্রতি অবিচার করেছি বলে। ভাবলুম—কাল ভোরে আমি তাকে আর এড়িয়ে চলব না।

গল্প আবার নতুন কোন দিক নিচ্ছে কি? শ্রোতারা নিজেদের মধ্যেই একটা রোমাঞ্চ অনুভব করল। যাকে শেষ বলে মনে হয়, তা শেষ নাও হতে পারে। তারা নিজেদের মনের মধ্যেই গল্পের সমাধান খুঁজতে লাগল। প্রায় প্রত্যেকেই সমাধান করেও ফেলল যেন—, কুন্দ কম কিসে?—

মানুষের সহানুভূতি মানুষেরই দিকে।

শুধু সেই কালো মেয়েটির মুখে আবার কুঞ্চনের রেখা পড়ল বুঝি।

গল্পকার বলে চললেন: কুন্দ এল পরদিন সকাল বেলা। আমি তাকে দেখে আর ভয়ে পালিয়ে গেলুম না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলুম—কুন্দর বয়স কত! সে কি প্রিয়দর্শিনীর চেয়ে বড়? দেহের গড়নে সে বেশ ডাগর মেয়ে।

কুন্দ আমার দিকে হেসে তাকাল। সে তখন ফুল তুলছিল। আমাকে সে ডাকল: এস।

মনের মধ্যে তখনো আমার একটা বেদনার জড়তা। আমি যেন নিজের জীবনের মধ্যে তখনো চঞ্চল জীবনের সাড়া তখনো কিছুতেই পাচ্ছিলাম না। মনের মধ্যে একটা চিন্তাহীন শূন্যতা নিয়ে গিয়ে আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

কুন্দ আমায় কিছু বলল না। সে ফুল তুলতে লাগল।

আমার সেই হারানো দিনের কথা মনে পড়লো। আজ যদি প্রিয়দর্শিনী থাকতো তবে বোধ হয় কুন্দ এমন নীরবে ফুল তুলতো না। রাজকন্যার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামত সে ফুলের জন্য। আমাকে বারবার এসে সে ফুলের জন্য বিরক্ত করত।

কিন্তু আজকে সে আমায় কোন একটি ফুল তুলে দিতে পর্যন্ত বলল না। বরং সবচেয়ে সুন্দর গোলাপটি তুলে সাজিতে ভরতে গিয়ে সে ভরল না। আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, নাও, কি সুন্দর না?

সেই সৌন্দর্য্য আমার চেতনার মধ্যে কোন তরঙ্গ তুলল না। একদিন এমন একটি ফুল কাউকে দিলেও আমার মধ্যে ঝড় উঠতো। আজ নিজে পেয়েও আমার মধ্যে কোন ঝড় উঠল না।

তবে আমার অজ্ঞাতসারেই আমি যেন কাজে এগিয়ে গেলুম। কয়েকটা ফুল তুলে দিলুম কুন্দকে।

কুন্দর মুখের হাসি সেই ফুল পেয়ে আরো একটু খানি বাড়ল। একদিন ওর হাসির মধ্যে আমি সব সময় একটা বিদ্রূপের ছায়া পেতুম। আজকে সে হাসির মধ্যে তেমন কোন তীব্রতা ছিল না।

ফুল তোলা শেষ হলে কুন্দ যাবার জন্য প্রস্তুত হল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল: আমি আবার বিকেলে আসব কেমন?

আমি শুধু ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালুম।

কুন্দ চলে গেল।

সেই বহু পরিচিত উদ্যানে তখন আমি অপরিচিত একটি আত্মার মত অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালুম। একদিন ঐ সব বহু পরিচিত পুষ্পবৃক্ষগুলি আমার মধ্যে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করত—সে আন্দোলনের কিছুমাত্র আমি নিজের মধ্যে অনুভব করলুম না। যেন আমার মধ্যে কিছু নেই, শূন্য, আমি নিতান্ত শূন্য।

শুধু অভ্যেস বশতঃ আমি স্নান করলুম, পুজো সারলুম। তারপর নিজের কক্ষে বিশ্রাম নিলুম। আমি যেন কিছু ভাবতে পারি না—কেঁদে কেঁদে মনটাকে ভাবনার ঊর্দ্ধে নিয়ে গিয়েছি।

কুন্দ বিকেলে এল।

ফুলের হার তৈরী করে সে নিজের গলায় পরেছে। আমায় দেখে একটু হাসল। সে হাসির মধ্যে লজ্জার আভা।

আমার হয়তো বলা উচিৎ ছিল—আজ তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে কুন্দ। কিন্তু বলবার মত মন আর আমার ছিল না।

কুন্দ বাগানে এখানে সেখানে ঘুরল। আমি যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে তার পেছনে পেছনে ঘুরলুম।

মন থেকে কোন কথাই আমি বলতে পাচ্ছিলুম না। কোন কথাই আমার আসছিল না। এই নীরবতা বোধ হয় কুন্দের ভাল লাগে নি। দুজনে থেকেও কথা বলব না—এটা সে সহ্য করতে পারছিল না হয়তো। আমাকে সে হঠাৎ প্রস্তাব দিল: চল বাইরে যাই।

—কোথায়?

—আমাদের বাড়ী।

আমি হঠাৎ কোন কথা দিতে পারলুম না। এখানে এসে বাইরে কোথাও যাই নি। এই মন্দির প্রাঙ্গণে উদ্যানে আবদ্ধ হয়ে আছি। যেন এটা আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নতুন কিছুর প্রস্তাব তাই আমার মধ্যে সাড়া তুলতে পারল না হয় তো।

কুন্দ আবার বলল : যাবে ?

আমি বললুম : কেন ?

—এমনি। আমাদের বাড়ী যাবে।

অকারণ সঙ্কোচ আমার মধ্যে। তাই বললুম : না।

অভিমানে নয়, যেন একটা বেদনায় মুখখানা ভার করল কুন্দ। আমার দিকে তাকিয়ে বলল : আমরা গরীব বলে বুঝি আমাদের বাড়ী যাবে না ?

আমার ভারি ব্যথা লাগল। আমি তো কখনো কা'রো মনে আঘাত দিতে চাইনি। তা ছাড়া মানুষের দারিদ্র্যে আঘাত দেওয়া অন্যায়। আমিও যে দরিদ্র, দারিদ্র্যের ব্যথা বুঝি।

আমি মনের সমস্ত সংশয় মুছে বললুম : চলো।

কুন্দ বলল : থাক্।

—কেন ?

— তোমার কষ্ট হবে !

আমি এবার একটু হাসলুম। বললুম : না। চল।

কুন্দ কোন কথা বলল না। চুপ্ করে থাকল।

আমি তার হাত ধরে টানলুম : চল।

কুন্দ আমাকে নিয়ে ওদের বাড়ীতে চলল।

রাজবাড়ী ছাড়িয়ে একটু হাটতে হয়। ধূসর পথের উপর দিয়ে চললুম ওদের বাড়ী। সেই পথের ধারে—অসংখ্য ঝোপঝাড়। তা দেখে হঠাৎ আমার হারানো সেই দিনের কথা মনে পড়ে গেল। আমাদের দেশের পথও এমনি।

কুন্দর সঙ্গে ওদের বাড়ী এসে পৌছুলাম। বনকাটার আড়ালে ছোট ছুটি খড়ের ঘর। মাটি মিশানো তক্তকে আঙিনা। উঠানের পাশে লাউ ছিমের গাছ ! সে দিকে তাকিয়ে একমুহূর্তে আমার মনের মধ্যে পরিবর্তন এল। মনে হল, আমি যেন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। আমি যেন আবার আমাকে ফিরে পেয়েছি। এসব আমার, আমার, আমার, আমার সত্যিকারের ছুনিয়া। যে হাসিটি আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম,

মনের মধ্যে যে প্রেরণার অভাব আমি অনুভব করেছিলুম—মুহূর্তে যেন তা আবার ফিরে পেলুম।

বাড়ীর উঠোনে কুঁজো হয়ে যাওয়া রুগ্ন একটা লোক কাজ করছিল. একটা যন্ত্রনায় তার চোখ ছুটি বড় বড়। হাঁই হাঁই করে শ্বাস টানছিল।

কুন্দ বলল: আমার বাবা।

আমার লজ্জা হল। আমি মনের মধ্যে তাকে কি ভেবেছিলুম! আমার নিজের বাবার কথা মনে পড়ল। তিনিও এমনি আমাদের উঠোনে কাজ করেন।

কুন্দ ডাকল: দেখ বাবা কে এসেছে!

যন্ত্রণাকাতর মুখটি তিনি তুললেন: কে?

কুন্দ আমাকে দেখিয়ে বলল: গোবিন্দজীর পুজো করে, সেই যে তোমাকে বলেছি?

যন্ত্রণাদগ্ধ ছুটি চোখ দিয়ে তিনি আমাকে ভাল করে দেখবার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন: বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘজীবি হও। সুখী হও।

আমি নত হয়ে ওর বাবাকে প্রণাম করলুম।

কুন্দ ওখানে আমাকে দাঁড়াতে দিতে রাজী নয়। অনেক অনেক কিছু সে যেন আমাকে দেখাবে। সে আমায় ডাকল, এস।

আমি কুন্দের পিছু পিছু এগিয়ে গেলুম।

ওধারে ছোট্ট ডোবাটার ধারে কুন্দদের পেয়ারা গাছ। ও বলল: আমাদের পেয়ারা গাছ। ফিকে সবুজ পাতায় ছাওয়া সেই গাছটা আমি তাকিয়ে দেখলুম। আমাদের বাড়ীতেও একটি পেয়ারা গাছ আছে। তাকিয়ে দেখলুম: ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা। রসের উচ্ছ্বাসে ভরে আছে।

আমি আর যেন নিজেকে সংযত করতে পারলুম না। আমার অজ্ঞাতসারেই আমার মধ্যে হারানো অতীত জেগে উঠল। আমি কাপড়টা মালসাট মেরে সেই গাছে উঠে পড়লুম। কুন্দর মুখে অনাবিল হাসির ছটা ফুটে উঠল। আমি বেছে বেছে পেয়ারা পেড়ে তাকে দিলুম।

তারপর গাছ থেকে নেমে পুকুরের ধারে সবুজ ঘাসের উপর আমরা বসলুম। কুন্দ আমার গায়ে গায়ে অত্যন্ত কাছে বসল। সেইখানে পুকুরের দিকে তাকিয়ে আমরা পেয়ারা খেলুম।

কুন্দ বলল : জান, আমাদের দুটো হাঁস ছিল—এই পুকুরে ঘুরতো।

আমি বললুম : কোথায়?

কুন্দের মুখ একটু গম্ভীর হল : নেই।

—কেন?

—সেদিন শেয়ালে ধরে নিয়ে গেছে।

আমার দুঃখ হল।

কুন্দ বলল : আমাদের পায়রা আছে। ঐ দেখ বক্‌ম বক্‌ম করছে।

আমি তাকালুম : খয়েরি রংয়ের পায়রা, আমাদেরও ছিল।

আমি বললুম : পায়রা আমার খুব ভাল লাগে। আমাদের ছিল। কতদিন পায়রা উড়িয়েছি।

কুন্দের চোখে বিরাট কৌতুহল : ওড়াবে পায়রা?

আমি বললুম : আজ নয়, এখন আমাকে দেখলে উড়ে পালিয়ে যাবে ওরা।

ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : কবে ওড়াবে?

আমি বললুম : কাল ওড়াবো।

ও চোখ দুটি বড় বড় করে বলল : কাল তুমি আসবে?

আমি বললুম : হ্যাঁ।

কুন্দর চোখে মুখে উচ্ছল হাসি ফুটে উঠল। সে বলল : জান, আমাদের কুল গাছ আছে, কাল তুমি এসো তোমাকে খাওয়াবো।

আমি বললুম : আসবো।

আমি আবার তাকিয়ে দেখলুম চতুর্দ্দিকে,: এই দুনিয়া আমার, আমার, আমার। আমার অত্যন্ত পরিচিত এই সব। আমার আপন।

রাজবাড়ীর গম্ভীর সৌন্দর্য আমাকে প্রতি পদে যেন বেঁধে রেখেছিল। এই বিপুল বিশ্বের কাছে এসে আবার আমি মুক্তি পেলুম।

হলুদ আলোটা গাঢ় হয়ে তখন লাল হচ্ছিল। পাখীরা দল বেঁধে কুলায় ফিরছিল। এখনি সূর্য ডুববে, আমাকে আরতিতে বসতে হবে। আমি উঠলুম।

কুন্দ বলল : চললে?

—হ্যাঁ। আরতি আছে।

ও বলল : আমার মনে হয়, যাই, আরতি দেখি। কিন্তু জান, মা বাড়ী থাকেন না। বাবাকে আমাকেই দেখতে হয়, তাই যেতে পারি না।

এই কুন্দকে দেখে আমার মন বলল—এ আমার নিত্য কালের পরিচিত। রাজবাড়ীর জন্য সে নয়। আমি বললুম : তোমাকে যেতে হবে না। আমি রোজ আসব।

কুন্দের সহজ সরল মনও যেন এ কথাটাকে সহজে বিশ্বাস করতে পারল না। আমার দিকে দুটো অবিশ্বাসী চোখের দৃষ্টি হেনে বলল : সত্যি!

আমি বললুম : কি?

—সত্যি তুমি রোজ আসবে?

আমি বললুম : আসব।

কুন্দ বলল : জান, তাহলে আমি আর ও-বাড়ী যাব না। বাবাকে ফেলে আর যাব না। শুধু তোমার জন্যই আমি যাই। আমার সঙ্গে খেলবার কেউ নেই, তাই তোমার কাছে যাই।

আমার মন আবার যেন উদাসীন হয়ে যেতে চাইল। আমি কুন্দের সেই দুটো চোখের দিকে তাকালুম। মনে হল, কেন আমি ওকে ঘৃণা করতুম! ওর চোখ দুটো ওই সতেজ সহজ পাতার মত। ওর মুখের মধ্যে এই প্রকৃতির মত লাবণ্য।

ওকে একদিন অবজ্ঞা করেছি বলে আবার ব্যথা লাগল। আমি বললুম : আমি আসব। জান, দুবেলা আসবো। পুজো সেরে আসব, আবার বিকেলে আসব।

কুন্দ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল : দুবেলা!

আমি বললুম : হ্যাঁ।

কুন্দ বলল : হ্যাঁ, তাই এসো। জান আমাদের ঘরে তাল পাতার রামায়ণ আছে। তুমি পড়তে জান, দুপুরে পড়বে কেমন? বাবা যখন ভাল ছিলেন আমাকে পড়ে শোনাতেন।

আমি ফিরে এলুম। এই প্রথম কুন্দের কথা ভাবলুম। প্রত্যেক সন্ধ্যায় আরতি করতে গিয়ে গোবিন্দজীর মুখের দিকে তাকাতে আমার কান্না পেত। আমি আর্তনাদ করতুম। আমার চোখ দিয়ে জল পড়ত।

কিন্তু আজ আবৃত্তি দেবার সময় আবার মনের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অভিমান আর ছল ছল করে উঠল না।

অনেক দিন পরে আমি গোবিন্দজীর মুখে হাসি লক্ষ্য করলুম। মুক্ত বিশ্বের উপর, সূর্যের মত, প্রকৃতির মত সে হাসি। আমার মনে হল না, আমি অপরিচয়ের নিষ্ঠুর বন্ধনে, নিরুপায় যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে মরছি।

শ্রোতাদের মুখে সেই সন্ধ্যায় ম্লান প্রদীপের আলোতে একটা হাসির ছটা লক্ষ্য করা গেল। যেন হৃদয়ের এক গভীর যন্ত্রণা থেকে তারাও মুক্তি পেয়েছে। শুধু সেই কালো মেয়েটির মুখের রেখাতে কুঞ্চনটা বাড়ল।

এবার মনের মত গল্প, মনের মত পরিণতি নিশ্চয়ই হবে। ঈশ্বর তখন আর তাদের মনে নেই। জীবনের একটা সুন্দর পরিণতির দিকে তারা তাকিয়ে আছে।

বক্তা সেই অতীত স্মৃতি টেনে তখনো গল্প বলে চলেছেন: পরদিন ঘুম থেকে উঠে আমি আমার মধ্যে একটা লঘু পাখীর আবেগ অনুভব করলুম। সেই বিষাদ আপনিই যেন চলে যেতে চাইছে। মন্দির উদ্যানে আমি এলুম। সম্পূর্ণ চোখ মেলে আমি তাকালুম। আমি একটা প্রস্ফুটিত গোলাপের উপর হাত রাখলুম। সেই মুহূর্তে কুন্দের কথা আমার মনে পড়ল। ভাবলুম, সে আসবে। কিন্তু অবিলম্বেই মনে পড়ে গেল—আজ সে আসবে না। আমারই যাবার কথা। আমার নিজের দুনিয়ার সেই চিত্র—আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল।

আমার মনের মধ্যে প্রেরণা পেলুম। সকাল সকাল স্নান করলুম। পূজো সারলুম। তারপর নদীর একটা স্রোতের মত কুন্দদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললুম। ওদের আঙিনার কুল গাছটায় দুটো কবুতর বসে খেলা করছিল।

উঠানে দাঁড়িয়ে কি যেন করছিল কুন্দ। আমাকে দেখে সে হাসল। বলল: এই যে এয়েছ।

আমি হেসে বললুম: হ্যাঁ। তোমার রামায়ণ কোথায়?

কুন্দ বলল: দাঁড়াও, কাপড়টা ছেড়ে নি। পূজোর ঘরে আছে, আনছি।

আমায় সে বারান্দায় আসন পেতে বসতে দিল। আমি সেই আসনে বসে চতুর্দিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম।

কুন্দ এল কিছুক্ষণ পরে তালপাতার রামায়ণ নিয়ে। বলল: দেখো, খুব সাবধানে খুলো। বাবার রামায়ণ।

আমি সযত্নে তার বন্ধন খুললুম। তারপর প্রথম পাতার লেখাই পড়তে গেলুম।

কুন্দ বলল: না।

—কেন?

—ও সব মুখস্ত হয়ে গেছে আমার। তুমি পড় সেই জায়গাটা।

—কোথায়?

—সেই পঞ্চবটী বন, সেখানে সীতা আছেন, সেই জায়গা।

আমি খুঁজে খুঁজে সেই জায়গা বের করলুম।

ঊর্ধ্ব আকাশে নিষ্কলঙ্ক নীলিমা ঝল্‌মল্‌ করছে। আমি এক ফাঁকে সেই আকাশের দিকে তাকালুম। আমার মনে হ'ল, আমি যেন নিজেই সেই পঞ্চবটীতে চলে গিয়েছি। জানকীর মাথার উপর নির্মেঘ উজ্জ্বল নীল আকাশটা আমি দেখছি। কয়টা কেয়া গাছের ভীড় উঠানটার চতুর্দিকে। আমার মনে হ'ল, দক্ষিণের সেই অরণ্য যেন পঞ্চবটীকে ঘিরে রয়েছে। কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব জগতের সুর বেঁজে উঠল আমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে চতুর্দিক দেখতে লাগলুম। দৃষ্টি পড়ল, মুগ্ধা কুন্দের মুখে। দেখে আমার মনে হ'ল, কুন্দ যেন কুন্দ নয়—সেই পঞ্চবটীর কুটীরে লাবণ্যের ঘনীভূত মূর্তি—জনক রাজকন্যা জানকী নিজে। আমি মুগ্ধ-বিস্ময়ে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম।

কুন্দ আমার মুখের দিকে তাকাল। তার সেই উজ্জ্বল চোখের মণি দুটির মধ্য দিয়ে যেন কোন্‌ অতীত জগতের ইশারা পড়েছে। আমি সেই দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

কুন্দ কিছুকাল পরে বলল: তুমি কি দেখছ?

আমি বললুম: জান কুন্দ!

—কি?

—তোমাকে দেখতে ঠিক জানকীর মত।

কুন্দ লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে বলল : ধ্যেৎ!

আমি বললুম : হ্যাঁ, সত্যি।

সে বলল : জানকীর রঙ তো ফর্সা ছিল। আমি কালো।

আমি কুন্দকে কি করে বুঝাবো যে, ধরিত্রীর মেয়ে জানকীর রূপ শুধু এক প্রবল অনুভূতি। রঙের সীমাকে অতিক্রম করে সে শুধু এক শাশ্বত লাবণ্যে ভরে আছে।

এবার কুন্দ বলল : জানকীর মত দেখতে ছিল প্রিয়দর্শিনী। সেই ফর্সা রঙ, বিরাট চোখ। মা বলতেন : ওকে দেখতে নাকি ঠিক জানকীর মত।

একদিন প্রিয়দর্শিনীর নাম কুন্দের মুখে শুনলে আমার অন্তর কেঁপে উঠতো। কিন্তু আজ উঠলো না। আজ এক নতুন দেশ আমার কাছে। খড়ের ঘরের নীচে, কবুতরের পাখার ঝাপটের শব্দে, কাটাচোরা গাছের আবেষ্টনীর মধ্যে আমি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। এখানে রাজকন্যার কোন মূল্য নেই। এখানে সাধারণ মানুষের কন্যা আজ এক রূপাতীত লাবণ্যে ভরে উঠেছে; প্রিয়দর্শিনীর কথা শুনে তাই আজ আমি মনের মধ্যে তেমন কোন ব্যথা পেলুম না।

আমি কোনরকম বিচলিত না হয়ে বললুম : না; তুমিই জানকীর মত।

কুন্দ বলল : আমার সে রকম রং কৈ?

আমি বললুল : তোমার চোখ দুটি জানকীর মত।

কুন্দ বলল : শুধু চোখ হলেই তো হবে না, রংটাই আসল।

আমি বললুম : জানকীর রং তোমার মতই ছিল। যিনি লিখেছেন তিনি সত্য লিখতে পারেন নি। জানতো জানকী মাটি থেকে উঠেছিলেন। মাটী থেকে উঠলে তার রং কালো ছাড়া হতে পারে! এই দেখনা গাছ-গাছালী, ঘাস সব কেমন সবুজ। জানকী পৃথিবীর মেয়ে, জানকীর রংও শ্যামলা ছিল তোমার মত।

বুঝি বিশ্বাস হল কুন্দের, সে নিজের গায়ের রংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল আবার। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল : জান, তুমি ঠিক দেখতে রামের মত।

আমি হাসলুম : সত্যি!

ও বলল : হ্যাঁ।

ও আরো বলল : জান আমার কি মনে হয়?

—বল।

—তুমি যদি সত্যি রাম হতে, আর আমাকে নিয়ে সেই পাহাড় পর্বতের মধ্যে পঞ্চবটীতে চলে যেতে, কত ভাল হত, না! কত হরিণ দেখতুম, কত ময়ূর, পাখী, সব।

বয়সের ধর্ম অনুযায়ী আমার শেষ কৈশোরে দেহের মধ্যে তখন যে আবেক, কুন্দের নিশ্চয়ই তা ছিল না। তাই নির্দ্বিধায় সে কথা কয়টি বলতে পারল। কিন্তু তা শুনে আমার শেষ কৈশোরের আড়ালে স্বপ্ন-দেখা মনটি চঞ্চল হয়ে নদীর তরঙ্গ তুলতে চাইল। আমার বুকটা কাঁপল। তাই কুন্দের দিকে তাকিয়ে আমি নিজের মনের মধ্যে কেমন উদাস হলুম।

আর পাঠ হল না। কুন্দ বলল : এবার থাক। সে উঠে গিয়ে কুল নিয়ে এল। আমার জন্য সে সংগ্রহ করে রেখেছিল। নুন দিয়ে দাওয়ায় বসে দুজনে সেই কুল খেলুম।

কুন্দ একটা কলকণ্ঠ পাখীর মত আপন মনে কথা বলে খেতে লাগল। শুধু মাঝে মাঝে আমার মনে পড়ে যেতে লাগল—আমি কেন কুন্দকে এত অবহেলা করেছি।

সেই সন্ধ্যায় যখন আমি গোবিন্দজীর আরতি শেষে তাকে প্রণাম করলুম—আমি তার কাছে ক্ষমা চাইলুম। বললুম : প্রভু, তুমি অপরাধ নিও না। আমি একদিন দুঃখ পেয়েছিলুম বলে তোমাকে অভিশাপ দিয়েছি। তোমাকে দায়ী করে কত কেঁদেছি। আজ আমার সে দুঃখ নেই। আমার আবার আজ ভাল লাগছে। তুমি কোন অন্যায় করনি প্রভু।

শুধু বক্তা নয়। শ্রোতাদেরও বুক থেকে একটা মুক্তির নিঃশ্বাস বেরুল।

এবার শুধু সেই সুন্দর রঙিন পরিসমাপ্তি।

গল্প সেই সমাপ্তির পথেই চলেছে, কারণ তিনি তখনো গল্প বলে চলেছেন। তিনি বললেন : এইভাবে আমার দিন চলল। রাজপ্রাসাদের গাম্ভীর্য ছেড়ে সহজ পৃথিবীর সহজ আহ্বান আবার আমাকে অনাবিল

প্রাণের ছোঁয়া লাগিয়ে দিল। আমি রোজ যেতে লাগলুম কুন্দদের বাড়ী। অনাত্মীয় জীবনের তিক্ততা অতিক্রম করে পৃথিবীর সাদর অভ্যর্থনা যেন আমি পেলুম। পৃথিবীর কাছে পর কেউ নেই, সবাই আপন।

কিন্তু একদিন··· ····

শ্রোতারা কেঁপে উঠল। আবার, আবার কি তেমন কিছু······! না, তারা তার জন্য প্রস্তুত নয়।

একজন ভাবল: তেমন হলে আর গল্প শুনবার প্রয়োজন নেই। আমি উঠে যাব।

আর একজন ভাবল: আবার যদি তেমন হয়, সব আজগুবি-বানানো।

একটা ধূমায়িত অসন্তোষ তাদের মুখে চোখে যেন দেখা দিল।

বক্তা সেটা লক্ষ্য করলেন কিনা জানি না। কিন্তু বলে চললেন: এই ভাবে বেশ কিছুদিন গেল। আমার জীবনের প্রথম আঘাত আমি প্রায় ভুলে গেলুম। প্রায় কেন, ভুলে গেলুম বললেই হয়। কারণ, যে প্রাণের পরশ আমার বঞ্চিত জীবনে একান্ত কাম্য, আমি সেই পরশ পেলুম কুন্দের কাছে। তাই আমাকে একা, অসহায় আর বঞ্চিত বলে মনে হ'ল না। কিন্তু তবু······। তবু একদিন হঠাৎ আমি এমন একটা কথা শুনলুম যে আমার পূর্ণ বুকের রক্ত নিঃশেষিত হয়ে মুহূর্তে সেখানে আবার শূন্যতার সৃষ্টি হতে চাইল।

এ ক'দিন কুন্দর মা বাড়ীতে ছিলেন। পর্ণ কুটীরের অভ্যন্তরে স্বামী-পরিচর্যা করছিলেন। সুখ-দুঃখের নানা কথা বলে চলেছিলেন। আমি আর কুন্দ ছিলুম সেই ঘরের পাশে মাধবীলতার কুঞ্জে। হঠাৎ আমি শুনতে পেলুম—কুন্দর মা কুন্দর বাবাকে বলছেন: জান, কুন্দ আর গোপীকে কি সুন্দরই না মানায়। যেন রাধা-কৃষ্ণ—

শ্রোতাদের মুখ উজ্জ্বল হ'ল।

বক্তা বলে চলেছেন: শুনে আমার ভাল লাগল। কিন্তু কুন্দর মা তারপরই থামলেন। আমি সেদিকে কান পেতে ছিলুম। স্পষ্ট শুনলুম, তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। কেন? আমি আগ্রহে কান পাতলুম। কুন্দ বনে হলুদ পাখীর ছানা দেখতে বোধহয় ব্যস্ত ছিল।

আমি শুনলুম কুন্দর মা বলছেন: কিন্তু সগোত্র। নইলে আমি ওকে কাছে রাখতুম। বিধাতার ইচ্ছে নেই।

শুনে মুহূর্তে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এ কথার অর্থ আমি বুঝি।

কুন্দ তখন হলুদ পাখীর ছানা নিয়ে ব্যস্ত। আমাকে সে হাত ধরে টানল। আমি যেন একটা ফ্যাকাসে মরা মানুষের মত তার পেছনে পেছনে এলুম। ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে কুন্দ আমার দিকে তাকালো: ঐ স্থাখো! কিন্তু আমার সেই প্রাণহীন মুখের দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। একি! তোমার কি হ'ল!

আমার অন্তরে যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি কেঁদে ফেললুম।

কুন্দ আশ্চর্য হয়ে বলল: তোমার কি হল?

আমি বয়েস বিচার করতে পারলুম না। হঠাৎ কুন্দকে জড়িয়ে ধরে ডাকলুম: কুন্দ।

ও আমার মুখের দিকে তাকাল: কি?

আমি চোখের জলের রেখা নিয়েই বললুম: বল, তুমি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না?

কুন্দ চমকে উঠল কিছু বুঝতে না পেরে।

আমি আবার বললুম: বল, তুমি যাবে না?

আমার চোখে জল দেখে কুন্দর চোখেও বুঝি জল এল। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল: না।

ও নিজে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিল।

কুন্দ কি আমার কথা বুঝল? কে জানে। ও কি বুঝতে পারে?

কুন্দ কথা দেবার কে। যিনি দিন করেন, রাত্রি করেন, এ বিশ্বসংসার চালান—একমাত্র তিনিই কথা দিতে পারেন।

কুন্দকে ওখানে রেখে আমি প্রায় ছুটে চলে এলুম গোবিন্দজীর মন্দিরে। ঠাকুরের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বললুম: "ঠাকুর, তুমি আর আমাকে ব্যথা দিও না। কুন্দকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। কুন্দকে আমায় দাও।"

বক্তা থামলেন। তার শান্ত মুখের উপর কি বেদনার ছায়া ফুটে উঠেছে? উঠেছে কি না তা দর্শকদের তখন বুঝবার উপায় নেই। কারণ,

দুঃখের একটা অমঙ্গলে যেন ওদের মনের আকাশে জমা হচ্ছিল। সেই বেদনা ভারাক্রান্ত মনের দৃষ্টিতে সব কিছুকেই মলিন দেখায়।

বক্তা নিজেকে মনে করেন সুখ দুঃখের অতীত। তবে তাঁর মুখের উপর বিষাদের ছায়া পড়বে কেমন করে! ওটা তো শ্রোতাদেরই ভুল।

শুধু সেই কালো মেয়েটির চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল হল! যেন কিসের আশ্বাস সে পেয়েছে।

আজ আর কাহিনী নয়। হতে পারে না। বাইরে ঘন অন্ধকার অত্যন্ত নিষ্ঠুর মৌনতা নিয়ে ঝরে পড়ছে। কথা শেষ এখানে। এখন শুধু ভাবনা। শ্রোতারা উঠে দাঁড়ালো। তারপর একটা চিন্তার মধ্যে ডুবে আপন অজ্ঞাতসারেই অভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে চলল।

মন্দিরের শূন্য নীরবতায় সেই নতুন অতিথি থাকলেন একা।

ছয়

পরদিন দিন গেল কাজে। সন্ধ্যা এল আকর্ষণে। গল্পের অকর্ষণ। মন্দিরের যে পুরোহিত পুজো করতেন তিনি নিজের অভিমানে নিজেকে জড়িয়ে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। তার গুরুত্ব যেন ভুলে গেছে মানুষ। এখন সকলের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ একটি প্রাণরসপূর্ণ গল্প লেখকের দিকে। সন্ধ্যার সেই আকর্ষণীয় বস্তুর দিকে তাকিয়ে বসে আছে সকলে। তিনি অসমাপ্ত গল্পের রেশ ধরে বলতে আরম্ভ করে দিয়েছেন: আমি গোবিন্দজীর পায়ের কাছে পড়ে আকুল মিনতি জানালুন। তিনি শুনলেন কিনা জানিনা। তবে কিছু দিন মনে হল তিনি শুনলেন। কুন্দকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার কোন ষড়যন্ত্র আমি লক্ষ্য করলুম না।

দিনের রৌদ্রে, অপরাহ্নের ছায়ায় কুন্দ আকন্দ ঝোপের মমতা মাখানো ভীড়ে ছোট্ট একটি গায়ের কুটীরে আমি কুন্দের সঙ্গে মিশে আমার জীবনের দুঃখ ভুলতে লাগলুম।

কুন্দের মনের গভীর আন্দোলন কি—, তাতো আমি বুঝতে পারলুম না। কিন্তু পেলাম ঐ ছোট্ট মেয়ের কাছ থেকেই এখন এক অনাবিল হৃদয়ের স্পর্শ যার তুলনা নেই।

আমি রাজপুরোহিত, দেবতার ভোগের অনেক মূল্যবান জিনিষ পেতুম। কিন্তু কুন্দর তাতে কি এসে যায়! সামান্য দরিদ্র গৃহের যা কিছু আহার্য, যা কিছু সাধারণের মধ্যে ভাল, কুন্দ তাই রাখতো আমার জন্য। কোন দিন কাঁচা পেয়ারা, কোন দিন কুল, কখনো তেঁতুলের আঁচার। কুন্দর মুখে যা ভাল লাগতো আমার জন্য রাখতো সে। আর আমি? ভোগের প্রসাদ যা পেতুম তা থেকে বেছে বেছে রাখতুম কুন্দের জন্য।

আত্ম সম্মান বোধের কিই বা বুঝতো কুন্দ। তবু যখন তাকে ঐ সব দিতে যেতুম সে গ্রহণ করতে চাইতো না। সে কি তার দারিদ্র্যকে বিদ্রূপ করা হয় বলে? আমি ছলের আশ্রয় গ্রহণ করতুম। বলতুম: আমার এ সব ভাল লাগে না। আমার ভাল লাগে তোমার পেয়ারা, তাই দাও তো!

কুন্দ সহাস্যে সেই সারা দিন সযত্নে সংগৃহীত পেয়ারা এনে আমাকে দিত। আমি গ্রহণ করতুম। কুন্দের মুখে এক পরম তৃপ্তি ফুটে উঠত।

একদিন যাকে হিংসুটে বলে মনে করেছি—তার মত এত বিশাল হৃদয়ের মানুষ আর আমার চোখে পড়ে নি। কুন্দর সেই ছোট্ট বুকের মধ্যে কি বিপুল আত্মীয়তার স্নেহ ছিল। আমি তা পেয়েছিলুম।

আমি কখনো কখনো কুন্দকে বলতুম: আচ্ছা, রাজবাড়ী থেকে যদি আমাকে তাড়িয়ে দেয় কুন্দ?

অর্থনীতির প্রশ্ন কুন্দের মনে তখনো বিন্দু মাত্র দেখা দেয় নি। ছুটো আহার্য বস্তু সংগ্রহের জন্যই যে মানুষের এত শ্রম, কুন্দের মা রাজবাড়ীতে কাজ করে, আমি অনেক দূর দেশ থেকে এসে মন্দিরে পুজো করি, কুন্দের মনে এত সব প্রশ্ন দেখা দেয় নি। সে বলত: ওরা তাড়িয়ে দেয় তুমি আমাদের বাড়ীতে থাকবে।

সহজ, সরল, দ্বিধাহীন উত্তর।

জীবনে বাঁচবার জন্য কুন্দর কাছে কোন সমস্যা নেই। লতা আছে, পাতা আছে, বৃক্ষ আছে, পশু আছে, পাখী আছে: মানুষও আছে। ওদের মতই সহজ আর সরল মানুষের জীবন।

অন্য কিছু ভাবে না কুন্দ।

ওর মনে আমার জন্য ঠাঁই কতটুকু—জানবার জন্য বলতুম: যদি ওরা এসে আমাকে মারে?

কুন্দ ঝাঁঝিয়ে উঠতো: ওঃ! মারলেই হল! মারুক না কেন?

—যদি মারে তুমি কি করবে?

—ওদের কামড়ে দেব।

অর্থাৎ কুন্দ আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে।

আমি বলতুম: কুন্দ, যদি তোমাকে সবাই বিয়ে দিয়ে দেয়?

কুন্দ বলত: দেবে।

হঠাৎ আমার আঘাত লাগতো তখন। তাহলে কি আমি যে ভাবে কুন্দকে গ্রহণ করেছি—কুন্দ সে ভাবে আমাকে গ্রহণ করতে পারে নি!

ঐ ছোট্ট দেহের মধ্যে প্রাণ দোলানো আবেগের সঞ্চার হবে কি করে

আমি বুঝতে চাইতুম না। আমার অবুঝ কৈশোরের আবেগ চাইতো, আমি যাকে ভালবাসি সেও আমাকে বাসবে।

আমি বলতুম : বিয়ে হলে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ?

কুন্দ বলল : তা যাব কেন ?

—বিয়ে হলে তো তোমার বর তোমাকে নিয়ে যাবে।

কুন্দ বলত : তবে আমি বিয়ে করব না।

তখন ভাল লাগতো।

ঐ অবুঝ কুন্দের সঙ্গে আমি আমার অন্তরের ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করতুম।

কুন্দ আমাকে কেমন করে দেখতো জানি না। কিন্তু আমি তাকে অন্ত দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করে দিয়েছিলুম। কুন্দের সুস্থ দেহটিতে রসের সঞ্চার হয়েছিল। চোখের কোলে ভরা নদীর লাবণ্য দেখা দিয়েছিল। আর নিবিড় নীলিমা এসেছিল তার ছুইটি নয়ন তারাতে। কুন্দকে দেখে শুধু আমার ভাল লাগতো না—অন্তরে দোলা লাগতো। আর কুন্দর সেই স্ফুটনোন্মুখ দেহের গন্ধ পেতুম আমি।

দিন এগিয়ে চলল। আমার মনের মধ্যে যে ভয়াতুর সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল তা আবার হারিয়ে গেল। ছুরাশাই কৈশোরের আশা। সেই স্বপ্ন আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল।

কিন্তু একদিন অকস্মাৎ প্রচণ্ড বেগে সেই বিপদের সংবাদ নেমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার উপর।

আরতির আগে মন্দিরে ঢুকতে যাব, হঠাৎ শুনলুম বারান্দার ও প্রান্তে শিউলী গাছের নীচে কারা কথা বলছে।

ছুটি নারী কণ্ঠ।

শব্দ শুনে আমি বুঝলুম, রাজমাতা আর কুন্দর মা।

রাজমাতা বলছেন : আমি এ সম্বন্ধকে ভালই মনে করি। এটা হাতছাড়া করা তোমার কিছুতেই উচিত নয়।

কুন্দর মা বললেন : উনিও তাই বলেন। কবে চোখ বুঝবো, তার আগে মেয়ের একটা হিল্লে করতে হয়।

রাজমাতা বললেন : সে ত' নিশ্চয়ই।

কুন্দর মা বললেন: কিন্তু বয়েসটাতে আমার…। ষাট পেরিয়ে গেছে।

রাজমাতা বললেন: পুরুষের বয়েস নেইগো কুন্দর মা। বিয়েটা ধর্ম। সময় মত দিতে হবে, যেখানেই হোক।

কুন্দর মা কিছুকাল নীরব থাকলেন। তারপর বললেন: মেয়েটা কত কাঁদবে। কিন্তু ওর কপাল—নইলে এই গোপীবল্লভকেই হয়তো আমি পেতে পারতুম। কিন্তু সগোত্র। অথচ দুটির মধ্যে যে কি মিল। আমি মাঝে মাঝে দেখি আর ভাবি। কুন্দটা রাত্রি বেলা ঘুমের ঘোরে ওর নাম ধরে ডেকে ওঠে।

রাজমাতা বললেন: মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এখনি ছেলেদের কাছ থেকে ওকে সড়িয়ে নিতে হবে। মনের কথা বলা যায় না—

কুন্দর মা বললেন: না, গোপী আমার তেমন ছেলে নয়। মনে কালি নেই। ঠিক গোপাল ঠাকুরের মত শুধু মেতে আছে নানা খেলা নিয়ে।

রাজমাতা বললেন: তা জানি। আর সেই জন্যই বুঝি গোবিন্দ ওকে ডেকে এনেছেন স্বপ্নে আমাকে আদেশ দিয়ে। তবু কিন্তু আছে। মেয়েকে আর মিশতে দিও না কাল থেকে।

কুন্দর মা বলল: মেয়েকে আমি কি বলব ভাবছি। ওতো কিছু বোঝে না। ছেলেটার মনেও পাপ নেই, কি বলব। ছেলেটাকে মানা করতে আমার যেন….

রাজমাতা বললেন: তা হলে তুমি এক কাজ কর। কাল থেকে কুন্দকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত….। আর এ বিয়েই হবে। মেয়ের বয়েস পেরিয়ে যেতে পারে না।

রাজমাতার আদেশ অমান্য করবে, কুন্দের মার এমন সাহস নেই। সুতরাং বললেন: তাই হবে মা।

আমি মন্দিরে উঠতে যাচ্ছিলুম। আমার পা কাঁপতে লাগল। মনে হল, আমি পড়ে যাব।

নিজের বুকের মধ্যে এমন এক অসহায় যন্ত্রনা অনুভব করলুম—যাকে ব্যাখ্যা করে বুঝানো চলে না।

আমার মনে হল, আমি চিৎকার করে উঠি। মনে হল, চিৎকার করে উঠি গোবিন্দজীর দিকে তাকিয়ে—না, তা হবে না। হতে পারে না। আমি তোমাকে পুজো করি। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করে যাই—আমাকে কেন তুমি ব্যথা দেবে।

কিন্তু চিৎকার তো দুরাশা, মুখে শব্দটি উচ্চারণ করবার ক্ষমতাও আমার ছিল না। আমার বেদনা মানুষে জানলেতো চলবে না।

আমার বুকের মধ্যে আবেগ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। আমি জোর করে সেই আবেগকে আটকে রাখবার জন্য চেষ্টা করলুম। কিন্তু মনে হতে লাগল—বুক আমার ফেটে যাবে।

নিজেকে কোন রকমে টেনে মন্দিরে উঠলুম। রাজমাতা এসে পৌছুলেন। আমি আরতি দিলুম। আজ আর চোখের জল রাখতে পারলুম না। আরতির ফাঁকে ফাঁকে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। শুধু পশ্চাতে উপবিষ্ট রাজমাতা তা দেখতে পেলেন না এই যা।

প্রবল শক্তি সঞ্চয় করে, নিজেকে লুকিয়ে, কোন প্রকারে আশীর্বাদী ফুলপত্র দিলুম—রাজমাতাকে। তিনি ভক্তি ভরে বিগ্রহ প্রণাম করে নেমে চলে গেলেন। মন্দির শূন্য হলে আমি ঠাকুরের পায়ের কাছে পড়ে কাঁদলুম। বার বার প্রার্থনা জানালুমঃ ঠাকুর তুমি আর আমাকে ব্যথা দিও না। তুমি রাতে সবকিছু পাল্টে দাও—কুন্দকে আমাকে দাও। রাজমাতার মনে তুমি আমার জন্য স্নেহের সঞ্চার কর। আমার কেউ নেই। আমাকে তুমি ব্যথা দিও না ঠাকুর। নিজের চোখের জল আমি বিগ্রহের পদপ্রান্তে রাখলুম।

দেবতাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করলে, জগতে কি সম্ভব না হতে পারে! অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেন। রামায়ণ মহাভারতে সেই ঈশ্বরের অসম্ভব সাধনের কাহিনীর শেষ আছে না কি? আমাদের শাস্ত্রে কোথায় সেই ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির বর্ণনা নেই?

আমি সারা রাত নিজের শয়নকক্ষে শুয়ে সেই ঈশ্বরকে ডাকলুম। বললুমঃ কুন্দকে আমায় দাও। বললুমঃ কাল যখন কুন্দের কাছে যাব, ওকে যেন দেখতে পাই।

পরদিন সমস্ত মনোপ্রাণ দিয়ে গোবিন্দজীর অর্চ্চনা করে আমি তাড়াতাড়ি ব্যাকুল মনে বেরুলাম কুন্দদের বাড়ীর দিকে। পাশের বকুল তাল পিয়ালের গাছ পড়ে থাকল, আমার নজরে পড়ল না। নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে গেল, আমি দেখেও দেখলুম না। যদি সে হারিয়ে যায় এই ভয়ে আমি দ্রুত ছুটলুম কুন্দর কাছে।

উৎকণ্ঠ দৃষ্টিতে শ্রোতারা তাকিয়ে আছে বক্তার দিকে। ঈশ্বরের শক্তির চরম পরীক্ষা। এমন অসম্ভব নিশ্চয়ই তিনি সম্ভব করবেন। তাইতো বক্তা ঈশ্বরের উপর এমন প্রগাঢ় আস্থা স্থাপন করতে পেরেছেন!

সেই কালো মেয়েটিও গভীর উৎকণ্ঠায় তাকালো বক্তার দিকে।

বক্তা বলে চললেন: আমি গিয়ে কুন্দদের বাড়ীতে উপস্থিত হলুম।

কুন্দ বাড়ীতে থাকগে পর্ণকুটীরেও যে জীবনের সাড়া অনুভব করা যায়—আজ যেন সে সাড়া আমি পেলুম না।

কম্পিত কণ্ঠে আমি ডাকলুম: কুন্দ।

কুন্দর বাবা উঠানে বসে ছিলেন। যন্ত্রণাকাতর মুখ তাঁর। তিনি বড় বড় অসহায় দুটো চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললুম: কুন্দ কোথায়?

তিনি বুঝি সব জানতেন। আমার মধ্যেকার চাঞ্চল্যও তাই তিনি বুঝতে পারলেন বোধ হয়। তাঁর মুখেও সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এল।

তিনি বললেন: কুন্দ নেই।

আমার বুকটা ভয়ানক ভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠল—তবে কি?

আমি আর কোন কথা বলতে পারলুম না। আমার দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতে পারলুম না—কুন্দ কোথায়?

তিনি আমার মনের প্রশ্ন বুঝতে পারলেন বোধ হয়। বললেন: কুন্দ রাজবাড়ীতে গেছে।

আমি ক্লান্ত ভাবে প্রশ্ন করলুম: ফিরবে না?

আমার বেদনা বোধ হয় তিনি বুঝতে পারলেন। এ বেদনা তাঁরও। তাই সহসা তিনি কোন উত্তর দিতে পারলেন না। একটু থেমে আমাকে বুঝ দেবার মত কথা ভাবলেন।

বললেন : না বাবা, আজ সে ফিরবে না। কয়েক দিন সেখানে থাকবে।

আমার হৃদপিণ্ড যেন কোন্ অতল তলে তলিয়ে যেতে চাইল।

সে কেন ফিরবে না—তা আমি জানি।

কিন্তু, আমি কি করব ?

আমার ঈশ্বর, আমার গোবিন্দজী কেন আমাকে প্রতারিত করলেন ? আমি কি সমস্ত মনোপ্রাণে তাঁকে ডাকিনি ?

তবে কি মূর্তি শুধু, মূর্তিই ! তার কোন মূল্য নেই ? শক্তি নেই ?

তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হল মনে মনে। আমার মাথায় যেন হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল। আজ তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি বোঝা-পড়া। আমি কোন কিছু ভাবতে পারলুম না। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ছুটলুম সেই মন্দিরের দিকে।

পেছনে বোধ হয় কুন্দর বাবা আমাকে ডাকলেন : শোন, শোন।

আমি একজন রোগাক্রান্ত মানুষের অস্পষ্ট কণ্ঠ শুনতে পেলুম কি পেলুম না, ছুটে চলে এলুম।

পথে কোন দিকে দৃক্‌পাত করলুম না। বরাবর এসে উঠলুম মন্দিরে। আমি স্পষ্ট সোজাসুজি তাকালুম বিগ্রহের মুখের দিকে। প্রশ্ন করলুম : তুমি আছ ?

বিগ্রহের মুখে হাসি।

আমার রাগ হ'ল। বললুম : তুমি নেই। তুমি মানুষের সৃষ্টি মাত্র। তুমি নেই, তুমি যদি থাকতে, কুন্দকে আমি হারাতুম না। ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর দুর্বলের সান্ত্বনা মাত্র।

আমার কি মনে হল ! আমি থুথু ছিটিয়ে দিলুম বিগ্রহের মুখে : তুমি নেই, তুমি নেই। তুমি থাকলে ভাল করবার ক্ষমতা তোমার নেই ! তুমি শয়তান। তুমি কিছুই নও, আমি তোমাকে মানি না।

সেই মুহূর্তে মন্দির থেকে মুখ ফেরালুম আমি। ও মূর্তি দেখবার আর কোন প্রয়োজন নেই আমার।

আমি মন্দিরের বারান্দা থেকে নীচে নামলুম।

সেই মুহূর্তে মনের মধ্যে স্থির করে ফেললুম—এখানে আর থাকব না। কোথায় যাব? বাড়ী? না। কোন পরিচিত পরিবেশের মধ্যে নয়। সম্পূর্ণ অপরিচয়ের মধ্যে হারিয়ে যাব আমি। ছলে হোক, বলে হোক, শক্তি সঞ্চয় করব। শক্তি কিসে? অর্থে। অর্থ আমার চাই। সেই অর্থ সংগ্রহ করে আমি কুন্দকে ছিনিয়ে নেব।

কি ভাবে অর্থ সংগ্রহ করব? সে কথা ভেবে পেলুম না। কিন্তু আমাকে স্বাধীন হতে হবে, শক্তিশালী হতে হবে। তারপর কুন্দকে নেব আমার ঘরে। সমাজের কোন নিয়ম-কানুন আমি মানব না। আমার মনে হল, আমি যদি মুসলমান হই? মুসলমানের সাম্রাজ্য। মুসলমানের কত কদর। ওরা আমাকে সানন্দে গ্রহণ করবে। ওদের নিয়ে এসে আমি আমার কুন্দকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব—যাব-ই যাব। আর কোন দুর্বলতা নয়, আর কোন হিন্দুর মূর্তিকে বিশ্বাস নয়; মূর্তিতে ভগবান নেই।

আমি ছুটলুম। আমি ছুটলুম, গৌড়ের পথ লক্ষ্য করে।

শ্রোতাদের মনেও এসেছিল বিদ্রোহের ভাব। ভগবান নেই—নইলে এমন আন্তরিক আবেদন তার কাছে ব্যর্থ হত না। ভগবান নেই—ভগবান যদি থেকেও থাকেন, হিন্দুর দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে নিশ্চয়ই তিনি নেই। তা যদি থাকতো, তবে মন্দিরে মন্দিরে আন্তরিক পূজার্ঘ্য নিবেদন করেও তাদের জীবনে নিত্য এই দুঃখ-দৈন্য কেন? যবনের হাতে নিত্য কেন তাদের এই নিপীড়ন? মনে হল, তারা চীৎকার করে ওঠে; বলে: তুমি সত্য বলেছ ঠাকুর, ঈশ্বর নেই।

কিন্তু সে চীৎকার তারা করে উঠতে পারল না—কারণ, বক্তা তখন তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে নতুন দেশের দিকে ছুটে চলেছেন।

তাঁর উপর, তাঁরই জীবনের উপর এখন তাদের বিশ্বাস অনেকটা নির্ভর করছে। ওদের মধ্যে উত্তেজনার তীব্রতা ফুটিয়ে দিয়ে তিনি সরে যাননি। সিদ্ধান্ত এখনো ওদের হাতে ছাড়েন নি তিনি। সিদ্ধান্ত তাঁর নিজের কাছে, গল্পের সমাপ্তির মধ্যে। শেষ করেও তিনি গল্প শেষ করছেন না।

শ্রোতারা আবার তাঁর কাহিনীর দিকে কান পাতল।

তিনি বলছেন: আমি গৌড়ের পথ লক্ষ্য করে ছুটলুম। প্রথম প্রহর শুধু হাটলুম। কত প্রবল বেগে হাটলুম, তা বলতে পারব না। চতুর্দিকে আমার কিছু নজরে পড়ল না। মাঠের পর মাঠ আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। দ্বিতীয় প্রহরও চললুম—অশ্রান্ত হেটে। তৃতীয় প্রহরে আমার মধ্যে ক্লান্তি এল।

মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্র কখন আমাকে পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে, আমি বুঝতে পারিনি। রৌদ্রের গায়ে হলুদ কিরণ পড়ে অপরাহ্ণ আসছে, তাও আমি দেখিনি। কিন্তু অবশেষে আমার চরণ ক্লান্ত হল। মাংসপেশী-গুলো যেন ফুলে উঠেছে। আমার নিজের দুটি পা-ই আমার কাছে ভার মনে হল। আমার বুকের মধ্যে প্রবল তৃষ্ণা অনুভব করতে লাগলুম। তখন আমার দৃষ্টি পড়ল পরিবেশের দিকে। আমি দেখলুম—আমি এক বিরাট মাঠের মধ্যে। সেখানে ছায়া নেই, সেখানে বিশ্রামের স্থান নেই। তৃষ্ণার জল নেই সেখানে। দূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে। কি গ্রাম, কে জানে। কিন্তু তখন আর কিছুতেই চলতে পাচ্ছিলুম না। আমার মনে হচ্ছিল ঐ মাঠের মধ্যে আমি শুয়ে পড়ি। শুভ্র বকেরা মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একমাত্র তারাই বুঝি আমাকে দেখল। মাঝে মাঝে মুখ তুলে আমার দিকে তাকাচ্ছিল তারা।

এতক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল না। এইবার ধীরে ধীরে নিজের মনের মধ্যে যেন ফিরে এলুম। আমি কোথায় চলেছি? কার কাছে? আমাকে আশ্রয় দেবে কে? আমার ভয় হল। মনে হল, ভুল করছি। মনে হল ফিরি। কিন্তু কোথায় ফিরব? সেই রাজবাড়ী? যেখানে আমার চোখের উপর দিয়ে অপরে কুন্দকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সেখানে? না, না, না, অসম্ভব। যেখানে আমার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছি, সেখানে আর কিছুতেই ফেরা হবে না।

ভাবলুম: আমার নিজের গ্রামে আমি ফিরব। কিন্তু হঠাৎ বাবার কথা আমার মনে পড়ল। আমার এই স্বাধীনতাকে তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না। আবার আমাকে তিনি ফিরে পাঠাবেন সেই রাজবাড়ীতে। না, না, না, সেখানে আমি কিছুতেই যেতে পারব না। না, না, কুন্দের

মুখখানা আমার মনে পড়ল। আর আমি নিজের চোখের জল রাখতে পারলুম না। আমি কেঁদে ফেললুম: ভালবাসা, তুমি এত নিষ্ঠুর কেন?

বেদনার্ত দৃষ্টিতে শ্রোতারা বক্তার মুখের দিকে তাকাল। তাদের চোখে অসীম সমবেদনা।

বৃদ্ধেরা স্নেহের দৃষ্টি নিয়ে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যলাভের জন্যই তারা এসেছে। বক্তা এখনো ঈশ্বরের স্বরূপকে কিছুমাত্র তুলে ধরতে পারেন নি। না পারুক, কিন্তু সে প্রতারক নয়। জীবনে একাগ্র ভালবাসার মূল্য অসীম। শুদ্ধপ্রেম ঈশ্বরের কাছাকাছি। আহা! তাঁর প্রেম সার্থক হোক।

সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে।

বক্তা বলে চলেছেন: তখন শুধু ভরা শ্রাবণের মত আমার মধ্য থেকে কান্নার আবেগ ছাপিয়ে উঠছে। কিন্তু স্থির হলে চলবে না। তখনো চলতে হবে। গাঁয়ের রেখা মাঠের ওপারে আবছা দেখা যাচ্ছে। ওখানে গিয়ে আমাকে পৌঁছুতে হবে। আমি আমার ভার দেহটাকে টেনে নিয়ে ছেচ্‌ড়ে ছেচ্‌ড়ে চললুম। অবশেষে কোনরকমে গ্রামের প্রান্তের জাম গাছের নীচে আমার দেহটাকে টেনে এনে ফেললুম।

সূর্যের রৌদ্রে তখন হলুদ রং গাঢ় হচ্ছে। কিন্তু সব দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় আমার ছিল না, শক্তিও ছিল না। সেই গাছের নীচে আমার দেহটাকে এলিয়ে দিলাম আমি। আমার দেহের নীচে ঘাসের আস্তরণকে কত আরামপ্রদ বলে আমার মনে হল। আমি বিরাট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সমস্ত দেহ থেকে আমার ক্লান্তি মুছে ফেলতে চাইলুম।

এতটা বেশী শ্রান্ত হয়েছিলুম আমি যে, কখন দেখতে দেখতে আমার অজ্ঞাতসারেই আমি ঘুমিয়ে পরলুম।

কতক্ষণ এইভাবে গভীর ঘুমের কোলে আমি অচেতন ছিলুম জানি না। এক সময় কানের কাছে কিসের জটলা শুনে ধরমরিয়ে উঠে বসলুম।

অস্পষ্ট শুনলুম, কে যেন বলছে: ব্রাহ্মণের ছেলে হবে, গলায় পৈতে দেখছ না।

কে বলল : হ্যাঁ, বড় ঘরেরই হবে, দেখছ না মুখ চোখ!

কে বলল : এখানে এল কোত্থেকে ?

আমি ধরমরিয়ে উঠে পড়লুম। দূরে দৃষ্টি পড়তে দেখলুম, বাইরে কালো ঘন অন্ধকার। আমার চতুর্দিকে কয়েকজন লোক। তাদের হাতে প্রদীপ। প্রদীপের মৃদু শিখায় তারা আমাকে দেখছে।

একজন বলল : তোমার নাম কি ?

বহুজনের প্রশ্নের মধ্যে আমি বিব্রত বোধ করলুম। কি বলব, ভেবে পেলুম না।

আমার যেন মনে হল, ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছি।

একজন বলল : তোমরা একসঙ্গে সবাই প্রশ্ন কোর না। আমি জিজ্ঞেস করছি।

আমার তখন কান্না পাচ্ছিল।

কে যেন বলল : বোধহয় পথ হারিয়ে ফেলেছে।

—সর, আমাকে জিজ্ঞেস করতে দাও।

বয়স্ক মত লোকটি এগিয়ে এলেন : তোমার নাম কি ?

আমি কাঁদ কাঁদ ভঙ্গীতে বললুম : গোপীবল্লভ।

একজন বলল : আহা! সত্যি গোপীবল্লভের মত চেহারা।

—তুমি কোত্থেকে আসছ ?

আমি বললুম : সোনারপুর থেকে।

—কোথায় যাবে ?

আমি কিছু বলতে পারলুম না।

উনি বললেন : ভয় কি! বল ?

আমি কোথায় যাব, আমি কি জানি ? তবে আমি গৌড়ের দিক লক্ষ্য করে রওনা হয়েছিলুম। সে কথা বলা যায় না। আমি চুপ করে রইলুম।

—কোথায় যাবে বল ?

আমি প্রায় কেঁদে ফেলে বললুম : জানি না।

আশ্চর্য হয়ে তিনি বললেন : সে কি! কোথায় যাবে জান না ?

আমি চুপ করে থাকলুম।

তিনি বললেন : তোমার কে আছে ?

আমার চোখে জল এসে গেল। আমি বললুম : আমার কেউ নেই

একজন বলল : আহা রে! বাছা আমার।

আর একজন বলল : তাই বোধ হয় বেরিয়ে পড়েছে।

সেই বৃদ্ধ মতন লোকটি বললেন : থাক্। এখন থাক্, কিছু আর জিজ্ঞেস করতে হবে না।

সকলে বলল : ওঠ, গ্রামে চল।

বাহিরে বিপুল অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে এখনি আমি বুঝতে পারলুম কোথাও আমাকে আশ্রয় নিতে হবে। আমি ওদের সঙ্গে উঠলুম।

দুই পাশে তরুশ্রেণীর মধ্য দিয়ে গ্রামের পথ। আমি ওদের সঙ্গে সেই পথে গ্রামে চললুম।

একজন যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল : তুমি কি জাত গো ?

আমি বললুম : ব্রাহ্মণ।

সে বলল : গাঁয়ে মাত্র এক ঘর ব্রাহ্মণ আছে। আমাদের পণ্ডিত মশায়ের ওখানেই রাখতে হবে ওকে।

মৃদু প্রদীপের কম্পিত আলোকে পথ দেখে দেখে আমাকে ওরা সেই ব্রাহ্মণের গৃহে নিয়ে চলল।

আমি অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারলুম—নিতান্ত পল্লীগ্রাম। রাজবাড়ীর মত কোন বিরাট প্রাসাদ নেই এখানে। সেই যেন আমার একমাত্র সান্ত্বনা বোধ হল। রাজপ্রাসাদের মধ্যে কোন হৃদয় নেই। গ্রামই আমার ভাল। গ্রামের সঙ্গেই আমার হৃদয়ের যোগ। গ্রামের মানুষ বলেই ওদের এমনি হৃদয়। ওরা আমাকে বিপন্ন ভেবে পথের মাঝ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

অন্ধকারের ছায়ার মধ্যে কয়েকটি খড়ের ঘর আমি অনুভব করতে পারলুম। ওরা সেখানে এসে থামল। কয়েকজন ডাকল : ঠাকুর মশাই আছেন ?

গৃহের মধ্যে মৃদু প্রদীপ জলছিল কোথাও। কারণ একটা ক্ষীণ আলোর রেখা আমার নজরে পড়ল।

প্রদীপ হাতে একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন : কি ?

ওরা বলল : একজন অতিথি নিয়ে এলুম। ব্রাহ্মণ।

—কই ?

ওরা আমাকে দেখিয়ে দিল।

বৃদ্ধ সেই প্রদীপের শিখাটা আমার মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরে আমাকে দেখলেন।

বললেন : নিতান্ত বালক। এত রাতে তুমি কোত্থেকে ?

একজন বলল : গাঁয়ের পথের পাশে গাছের নীচে ঘুমিয়ে ছিল।

বৃদ্ধ বললেন : আহা, বহুদূর পথ চলতে চলতে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সময়মত জাগতে পারেনি। কোথায় যাবে ?

ওরা বলল : কোথায় যাবে, বলতে পারে না।

বৃদ্ধের মুখের মধ্যে বুঝি সন্দেহের একটা ছায়া লক্ষ্য করলুম। কিন্তু তিনি আর কিছু বললেন না। আমাকে ডাকলেন : ঘরে এস।

লোকেদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন : তোমরা যাও। এখানেই থাকবে ও।

ভীড় কমল। ওরা সব চলে গেল।

বৃদ্ধ আমাকে নিয়ে বরাবর অন্দরের গৃহে ওঠালেন।

আমার মনের মধ্যে সঙ্কোচ হতে লাগল। কে আছেন! কারা! ছেলে মেয়ে!

আমি লজ্জার স্পর্শ অনুভব করতে লাগলুম।

সঙ্কোচের হাত থেকে বৃদ্ধ আমাকে রক্ষা করলেন। বললেন : কেউ নেই গো, শুধু বুড়ো আর বুড়ী। ওই দাওয়ায় জল আছে। হাত মুখ ধুয়ে এসে ঘরে বোস। হ্যাঁ, সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছো ? বিগ্রহ আছে আমার, ওখানে গিয়ে আহ্নিক সারো।

আমি বৃদ্ধের নির্দেশ অনুযায়ী হাত মুখ ধুয়ে পূজোর ঘরে গেলুম। সেটা শুধু ঘর। নিতান্ত ক্ষুদ্রাকৃতি খড়ের ছাওয়া। মন্দির নয় কোন ক্রমেই। সেখানে বৃদ্ধের বিগ্রহ। আমি সেই ঘরে ঢুকলুম। সযত্নে সাজানো রেড়ীর তেলে প্রদীপ আলো ছড়াচ্ছে। ছোট্ট রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। আমি তো এই গোবিন্দজীর উপর রাগ করে চলে এসেছি। তাকে আমি মানি না। কিন্তু আজ সেই রাগ আমার কোথায় চলে

গেছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত দুনিয়ার মধ্যে আমি একা বোধ করছি। আমি বিগ্রহের মুখের দিকে তাকিয়ে অঝোর ঝরনে কেঁদে ফেললুম। বললুম: ঠাকুর আমায় তুমি এত শাস্তি দিচ্ছ কেন?

অনেকক্ষণ ঠাকুরের কাছে কাঁদলুম। এই বিশাল পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, একথা ভাবতে আমার চোখ দিয়ে অলস অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই ভাবে ঠাকুরের সামনে বসে থাকলুম। সন্ধ্যা-আহ্নিক করলুম কি না মনে নেই। শুধু কাঁদলুম।

কখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, টের পাইনি। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার চোখে জল দেখলেন। তাতে যেন তাঁর নিজের মুখেই হাসি ফুটল। তিনি বললেন: কাঁদছ? ভাল। তোমার ভক্তি আছে। ঠাকুরের কাছে কাঁদা খুব ভাল। ঠাকুরকে যখন তুমি ধরেছ, তখন তোমার কোন ভয় নেই। ওঠ, তুমি অস্থানে এসে পৌঁছাওনি। চল খাবে।

আমি চোখের জল মুছে বৃদ্ধের সঙ্গে বাইরে এলুম। বুঝলুম—নিতান্ত অতিথি-পাগল তিনি। আর আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা কেই-বা অতিথি-পাগল নয়। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে খাবার ঘরে বসালেন। দেখলুম, বৃদ্ধা গৃহিণী আমাদের দু'জনের জন্য পাত পেতে রেখেছেন। আমি সঙ্কোচ করছিলুম। কিন্তু তাঁর চোখের দিকে তাকাতে আমার মনে সাহস এল। করুণায় ভরা মায়েরই মত চোখ দুটি। বৃদ্ধের সঙ্গে আমি আসন গ্রহণ করলুম। দরিদ্র গৃহের যা সামান্য আহার, তাই খেলুম। রাজবাড়ীর পরমান্নের চেয়ে তার স্বাদ নিশ্চয়ই বেশী ছিল। কিন্তু আমি সেই মুহূর্তে তা বুঝতে পারলুম না। কারণ, আমার মনে কত সব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর সেই সব চিন্তাকে ছাপিয়ে অনবরতই মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল কুন্দের মুখখানা।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বুঝতে পারলুম। আমার সঙ্কোচ হ'ল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: বাবা তোমার নাম কি?

আমি বললুম: গোপীবল্লভ।

—মা আছেন?

—নেই।

—বাবা?

আমি কি বলব, এক মুহূর্ত ভাবলুম। বাবা নেই—এ কথাটা বলতে বাঁধল। বললুম: আমার কেউ নেই।

বৃদ্ধা বললেন: আহারে, বাছা আমার!

বৃদ্ধ বললেন: কেউ নেই বোলো না। তোমার সব আছে। তোমার ভক্তি আছে। তুমি গোবিন্দের কাছে কেঁদেছ। তোমার অভাব কি?

তিনি বৃদ্ধার দিকে তাকালেন। বললেন: জান, ছেলেটি বড় ভক্তিমান।

বৃদ্ধা বললেন: চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়। আহা! আমাদের খোকাও এমনি ছিল না?

চকিতে আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। দেখলুম, তাঁর ছল্ ছল্ চোখ। সেই চোখ বেয়ে মুহূর্তে অশ্রুর বন্যা নামল।

আমি কল্পনা করলুম একমাত্র নয়নের মণি তাঁর পুত্র, মা বাবাকে অকালে ব্যথা দিয়ে চলে গেছে।

আমি সেই যে মাথা নীচু করলুম আর তুলতে পারলুম না।

বৃদ্ধা বললেন: আবার তুমি কাঁদছ! ছেলেটা খাচ্ছে—ওকে খেতে দাও।

বৃদ্ধার হাতের শঙ্খে শব্দ হল। আমি বুঝলুম তিনি শাড়ীর অঞ্চল-প্রান্তে তার চোখ মুছছেন।

বক্তা বোধ হয় একটু অবসর নিলেন।

সেই ফাঁকে একজন বৃদ্ধ শ্রোতা বলল: আহা! গোবিন্দ দেখ কাউকে আশ্রয়হীন রাখেন না।

অল্প বয়সের একজন রোষ কষায়িত চোখে তার দিকে তাকাল। সে দৃষ্টির অর্থ: তুমি থাম। জীবনের যে কাহিনী এ পর্যন্ত সে শুনেছে তাতে গোবিন্দের উপর তার আর শ্রদ্ধা নেই।

শুধু সেই কালো মেয়েটি অবাক কৌতূহলে বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বক্তা মুহূর্ত একটু থেমেছিলেন। তার পরই বলতে লাগলেন: আহার শেষে বৃদ্ধ আমাকে শয়ন-কক্ষে নিয়ে গেলেন। দেখলুম, অনাড়ম্বর শয্যা, কিন্তু অত্যন্ত যত্নে পরিপাটি করে সাজানো।

এক বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের স্নেহের স্পর্শ যেন সেখানে লেগে রয়েছে। বৃদ্ধ বললেন: আমরা পাশের ঘরেই থাকব। তুমি ভয় পাবে না তো?

আমি তাকিয়ে দেখলুম, বৃদ্ধের পেছনে বৃদ্ধাও দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমি সেই অপ্রত্যাশিত স্নেহের স্পর্শে নিতান্ত কোমল হয়ে গিয়েছিলুম। বিনীত ভাবে বললুম: না, ভয় পাব না।

ওরা আমাকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত না করে রাত্রির বিশ্রামের জন্য ছেড়ে দিলেন।

আমি সেই শয্যার উপর নিজের দেহ এগিয়ে দিলুম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘুমাতে পারলুম না। অজস্র চিন্তা যেন এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল। আমাকে একা পেয়ে এইবার আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার চোখের উপর প্রথমেই ভেসে উঠল কুন্দর ছবি। আর অমনি আমার কান্না পেল। কেন ওকে আমি পেলুম না! ওকে কি পাব না, আমি যদি অনেক বড় হই, তবুও না? ফুলগাছের কথা মনে পড়ল। সেখানে আমি তাকে বলেছিলুম—আমাকে ছেড়ে যাবে না বল? কুন্দ কেঁদে বলেছিল, না।

সে কথা ভাবতেই, প্রবল উত্তেজনা, আর প্রবল হতাশা দেখা দিল আমার মধ্যে। আমি দুই হাতে বিছানাটা আঁকড়ে ধরে নিজের আবেগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

সেই বেদনার আবেগ একটু কমে এলে আমার অন্য কথা মনে পড়ল। রাজবাড়ীতে এতক্ষণ আমার খোঁজ পড়ে গেছে। সবাই খুঁজছে বুঝি আমাকে। সে কথা কুন্দও জেনেছে এতক্ষণ। কুন্দ কি ভাবছে! এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে পড়েছে, না আমার কথা ভাবছে?

আমার মনে পড়ল, সারাদিন আমার খবর না পেয়ে ওরা নিশ্চয়ই বাবার কাছে কাল খবর পাঠাবে।

কিন্তু আমাকে ওখানে না পেয়ে সকলে কি ভাববে?

বাবা যখন শুনবেন তখন তিনি কি করবেন? আমার জন্য দুঃখ হবে? না।

তিনি বরং রেগে যাবেন। মনে মনে ভাববেন, আমাকে পেলে তিনি কঠিন শাস্তি দেবেন। রাজা যে টাকা দিতেন আমাকে, বাবা

সারাদিন খেটে তা পান না। বাবা ভয়ানক রেগে যাবেন। যাকগে, আমাকে কষ্ট দিয়ে তিনি টাকা পেতে চান। তিনি নিষ্ঠুর। বাবার কাছে আমি আর কখনো ফিরে যাব না।

সবার শেষে আবার কুন্দের কথা মনে পড়ল। প্রিয়দর্শিনীর কথাও আমার মনে পড়ল। দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে আমি বিচার করলুম। কুন্দ প্রিয়দর্শিনীর চেয়ে কম সুন্দরী কিসে? কুল গাছের নীচে কুন্দের সেই লাবণ্য ঢল ঢল মুখখানি মনে পড়ল। আমি কেঁদে ফেললুম। গোবিন্দজীকে স্মরণ করে কাঁদলুম: আমাকে তুমি এত ব্যথা দিলে কেন? কুন্দকে আমাকে দাও ঠাকুর।

এমনি কত সব অজস্র কথা মনে আসতে লাগল আমার। আর সেই সব ভাবতে ভাবতে কখন আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলুম। কিন্তু সে স্বপ্নে কুন্দকে আমি মোটেও দেখলুম না। দেখলুম এক প্রবল নদী। বন্যা আমাকে ভাসিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আমি আপ্রাণ কূল আঁকড়ে ধরলুম। সেখানে দেখলুম কালো একটি মেয়ে হাসছে। শুনলুম ঝর্ণার সেই মৃদু মিষ্টি সুর। অজস্র গাছ পাথরের মেলা। শূয়র। গৈরিক পথ। একটা ফুল। আমি তাকিয়ে আছি সেই রাজমহল পাহাড়ের চুড়োতে। যেখান থেকে সেই দূর প্রান্তের স্বর্গের কিনার দেখা যাচ্ছে। প্রিয়দর্শিনী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

এমনি কত কিছু। পরস্পরের মধ্যে সংযোগ নেই।

নদীতে বড বড় মাছ চলেছে। সেই মাছ ধরছি আমি।

এমন সময় কারা যেন হৈ হৈ রৈ রৈ করে উঠল। আমি চমকে উঠে পালাতে গেলুম।

আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলুম আকাশ ফাটিয়ে কাকেরা চিৎকার করছে। উঠানে কে গোবর জল ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিজের বাড়ীর কথা মনে পড়ল। বুড়ীমা গোবর জল ছড়াতেন।

আমার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে প্রথম সকাল বেলাকে দেখা গেল। আমি নিজের মধ্যে ফিরে এলুম। মনে পড়ে গেল গত সন্ধ্যার কাহিনী। আমি ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্কোচ বোধ হল। আর ঘুম আসবে না জানি। কিন্তু বাইরেও যেতে পারলুম না। অপরিচিত মানুষের মধ্যে অনাহূত যেতে আমার কেমন লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু লজ্জায় বেশীক্ষণ আমাকে আড়ষ্ট থাকতে হল না। শুনলুম ব্রাহ্মণ ডাকছেন: খোকা ঘুম ভেঙেছে তোমার?

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এলুম।

তিনি বললেন: রাত্রে ঘুম হল?

আমি বললুম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন: যাও বাবা, প্রাতঃকর্ম সেড়ে এসে আহ্নিকে বোস।

আমি নির্দ্বিধায় তাঁর আদেশ পালন করলুম।

সূর্য্যের আলোর মধ্যে উত্তাপ ফুটে উঠতে চাইছে। গাছের মাথায় কমলা রং মিলিয়ে যাবার উপক্রম করছে। আমি চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলুম। ঘন অরণ্যের মত বৃক্ষের সারি। অজস্র লতাপাতার ভীড়, ক্ষেত খামার। আমি বুঝলুম, সাধারণ মানুষের গ্রাম এটা।

আমি সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলুম, এমন সময় সেই বৃদ্ধ এলেন। আমার সামনে বসলেন।

—তুমি রাঢ়ের ব্রাহ্মণ?

আমি বললুম: হ্যাঁ।

—কেউ নেই বলে অভিমানে বুঝি পথে বেরিয়ে পড়েছ?

আমি মাথা নীচু করে থাকলুম।

তিনি বললেন: এলে কোথা থেকে?

আমি চমকে গেলুম। সত্যি কথা বলব কি বলব না ভাবলুম। কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যে যেন কিছুতেই বলতে পারলুম না। আমি মিথ্যে বলতে পারিনে। শুধু গাঁয়ের নাম বললুম না। তা ছাড়া বললুম: রাজবাড়ী কাজ করতুম।

—কোন্ রাজ বাড়ী?

আমি বললুম: রাজার নামতো জানিনে। সত্যি রাজার নাম আমি কখনো জানি নি। সবাই রাজা বলে, আমি ও রাজা বলে জানি। আমার কাছে তিনি রাজা বলেই পরিচিত।

বৃদ্ধ হেসে বললেন: আচ্ছা ভাবভোলা ছেলে দেখছি তুমি? তোমায় আমি দেখেই বুঝেছি। গাঁয়ের নামও বুঝি জান না?

আমি লজ্জায় মাথা নীচু করলুম।

তিনি বললেন: সে আমি বুঝতে পেরেছি।

কোন্ দিকে সে গ্রাম ছিল?

আমি হাত দিয়ে যেদিক খুশী দেখিয়ে বললুম, ঐ দিকে।

তিনি হাসলেন। বললেন: থাক, ও দিয়ে আর দরকার নেই। তা তুমি কোথায় যাবে বলে বেরিয়েছ?

আমি বললুম: বেরিয়েছি। কোথায় যাব ভেবে বেরুই নি।

বৃদ্ধ বললেন: এখানে থাকতে তোমার আপত্তি হবে?

—কোথায়?

আমাদের কাছে?

আমি মাথা নীচু করলুম।

সেই নীরব লজ্জার অর্থ কি বৃদ্ধের বুঝতে নিশ্চয়ই বিলম্ব হল না। অপরিচিত পৃথিবীর প্রথম দর্শনেই আমি চমকে উঠেছি। ভাসতে ভাসতে এসে যদি আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছি তা ছেড়ে আবার কোথায় যাব?

বৃদ্ধ বললেন: ভয় নেই। তুমি আমার কাছেই থাকবে। থাকবে তো?

আমি ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালুম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: তুমি লেখাপড়া শিখেছ কিছু কিছু?

আমি বললুম: আমি টোলে প্রথম পাঠ নিয়েছি।

বৃদ্ধের মুখ উজ্জল হল। তিনি বললেন: তবে অনেক দূর এগিয়েছ। বর্ণ-পরিচয় হয়েছে। ব্যাকরণ পড়েছ।

তিনি শুধালেন: আরো পড়বে তুমি?

আমি সম্মতি জানালুম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন: পাঠশালায় তোমার কি ভাল লাগতো?

আমি বললুম: রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী।

বৃদ্ধের মুখে উজ্জল কৌতূহল—খুশীর আবেগে ঝলমল্ করে উঠল বোধ হয়।

তিনি বললেন: কোন জায়গা ভাল লাগতো বল দিকিন?

আমি আবৃত্তি করলুম সেই পঞ্চবটীর দৃশ্য।

তিনি আমার মুখের দিকে কিছুকাল তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন: তোমার মন কবির।

আমি লজ্জা বোধ করলুম।

তিনি বললেন: কেন তুমি কবি, জান? প্রকৃতি তোমার ভাল লাগে। হ্যাঁ। তোমার মুখেও যে তাই লেখা আছে। মহাভারত তোমার কোন্ জায়গায় ভাল লাগতো।

আমি বললুম: রাজা যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথ।

অবাক হয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে, কেন?

—সেই পথ থেকে স্বর্গের ছায়া দেখা যায় তাই। জানেন···।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলুম। আবার লজ্জা পেয়ে থেমে গেলুম।

তিনি বললেন: কি বলছিলে? বল।

আমি লজ্জায় চুপ্ করে থাকলুম।

—বল!

আমি বললুম: আমি যখন রাজমহল পাহাড়ের চূড়োতে উঠেছিলুম, আমার মনে হয়েছিল, দূরে সেই স্বর্গের প্রান্ত আমি দেখতে পেয়েছিলুম।

তিনি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে দেখলেন। তারপর একটু হাসলেন। বললেন: তুমি যে উর্দ্ধে স্বর্গ কল্পনা করেছ, সেখানে স্বর্গ নেই। স্বর্গ সৌন্দর্য্যের কল্পনার মধ্যেই। পৃথিবীতে দুই ব্যক্তি সেই স্বর্গের সন্ধান পান—এক কবি, আর এক দার্শনিক। কবির কল্পনায় যে মৃত্যুহীন সৌন্দর্য তাই তাকে স্বর্গের পরিতৃপ্তি দান করে। আর দার্শনিক যখন জ্ঞানের সাহায্যে মায়াজাল ভেদ করে নিষ্কাম হন—তিনি অনাবিল সুখে, যাকে শান্তি বলে তাই লাভ করে স্বর্গের সুখ উপভোগ করেন।

মুগ্ধ বিস্ময়ে আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা কয়টি শুনলুম। তিনি উজ্জ্বল আনন্দের আবেগে উদ্ভাসিত হয়ে বললেন: শেখাবো, তোমাকে আমি সব শেখাবো।

সেই মুহূর্তে ব্রাহ্মণ গৃহিণী এলেন। ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে বললেন: আবার তুমি তোমার পাণ্ডিত্য আরম্ভ করলে? ওযে ছেলে মানুষ সে কথাটা ভুলে গেলে! আহ্নিক সেড়ে বসে আছে ওকে চাট্টে খেতে দাও।

বৃদ্ধ বললেন: হ্যাঁ, খাবে বৈকি। তবে জান গিন্নী, আমি রত্নের সন্ধান পেয়েছি। সবই তাঁর কাজ, জান সবই তাঁর ইচ্ছা। তিনি মূকং করোতি বাচালং....। চাইতে যা পাইনি, অযাচিত ভাবে তাই তিনি আমার দুয়ারে নিয়ে এসেছেন।

—কথা তোমার পরে হবে। ওকে আগে কিছু খাদ্য গ্রহণ করতে দাও।

বৃদ্ধা গৃহিণী আমাকে অন্দরে নিয়ে গেলেন।

আমি দেখলুম একবাটী দুধ, আর দুটো কলা, চাট্টি খৈ—তিনি রেখেছেন আমার জন্য। ব্রাহ্মণের গৃহে সাত্বিক আহার। আমার বুঝতে বিলম্ব হয় নি যে—ব্রাহ্মণ দরিদ্র। নিজেদের আহারের অংশ থেকে আমার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন। সঙ্কোচ হল। আমি বললুম: সকাল বেলা উপবাস করা আমার অভ্যাস। আমার জন্য এত আয়োজন করেছেন কেন?

গৃহিণী বললেন: আয়োজন কোথায়? আমরা দরিদ্র, আর কি করতে পারি। তুমি খাও।

আমি বললুম: আমি তো সকালে উপবাস করি।

তিনি বললেন: সে যখন করতে করতে, এখন আর করবার প্রয়োজন নেই। তোমার আহ্নিক শেষ হয়েছে। ব্রাহ্মণের সন্তান, আহ্নিক শেষে অভুক্ত থাকতে নেই।

বাধ্য হয়ে আমাকে সব কিছু আহার করতে হল।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সস্নেহে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

আমার আহার শেষ হলে তিনি ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করে বললেন: উনি পাগল। দিনরাত বিদ্যাচর্চা নিয়ে আছেন। দারিদ্র্যে ওর লক্ষ্য নেই। তোমাকে পেয়ে উনি খুশী। মনের মত ছাত্র নাকি ওর আজ পর্যন্ত জুটছে না। যাও, এবার তুমি ওর সঙ্গে আলোচনা কর। উনি উদগ্রীব হয়ে তোমার জন্য বসে আছেন।

আমি বাইরে এলুম। দেখলুম—ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটি তালপাতার পুঁথি খুলে কি দেখছেন। আমাকে দেখে বললেন: এসো।

একটি তালপাতার পুঁথি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন: দেখ। এই যে তুমি বাল্মিকীর রামায়ণ থেকে আবৃত্তি করছিলে, সেটা এখানে লেখা আছে। প্রাচীন তালপত্রে স্পষ্ট সেই শ্লোক ছুটি আমি লিখিত দেখলুম।

বৃদ্ধ বললেন: আমাদের দেশে কি না আছে? শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, সাহিত্য আছে।

বৃদ্ধ খুশীর আবেগে একটা প্রেরণার আলো হয়ে জলছিলেন যেন। আমায় বললেন: জান, ঈশ্বর করুণাময়। তিনি যা কিছু করেন, সব মঙ্গলের জন্য। তাঁর কাছে আমরা কিছু আকাঙ্ক্ষা করে তাঁর অপমান করি। তাঁর মনের মধ্যে নিজের স্বপ্ন সব কিছুকে সুন্দর পরিণতি দিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। সেই সব কিছু হবে, এবং সুন্দর ভাবে হবে। তাঁর সব কিছুই মঙ্গলময়।

হঠাৎ আমি বললুম: ঈশ্বর যদি শুধুই মঙ্গলময় তবে তিনি অকারণে ব্যথা দেন কেন?

তিনি হাসলেন। বললেন: ব্যথার মূল্য যেদিন বুঝতে পারবে, বুঝবে, ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিষ ব্যথা। এতবড় মহামূল্যবান সম্পদ আর নেই। যাকে তিনি সবচেয়ে বেশী ভাল বাসেন—তাকে তিনি সবচেয়ে বেশী আঘাত দেন। সেই আঘাতের মধ্য দিয়ে তিনি সবচেয়ে আগে তার প্রিয় সন্তানের কাছে চলে আসেন। এই পৃথিবীতে যে অপার শান্তি, অনাবিল সৌন্দর্য, ছুঃখের ছুয়ার খুলে দিয়ে তিনি তাই উপভোগ করতে দেন। যে ছুঃখ পায়নি, সে ত' এই সুখ আর শান্তি উপভোগ করতে পারে নি। জগতে মহৎ সৃষ্টি ছুঃখ ছাড়া হয় না। মহৎ শিল্প ছুঃখের দারুণ মূল্যেই আসে। জান—অলৌকিক আনন্দের ভার তিনি যাকে দেন, তার বুকে তাই অপার বেদনা।

এইটুকু বলে তিনি আমার মুখের দিকে তাকালেন। কি দেখলেন। তারপর বললেন: বুঝেছি,—মনে লাগেনি কথা। আচ্ছা তোমায় উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। কালীদাসের মেঘদূতের নাম শুনেছ?

আমি বললুম : হ্যাঁ।

—পড় নি নিশ্চয়ই ?

—না।

—কিন্তু এটা জানতো, সেটা বিরহের কাব্য ?

—হ্যাঁ।

—পড়নি, পড়লে বুঝবে, প্রতি ছত্রে ছত্রে কি অসীম সৌন্দর্যময় বিরহ। আচ্ছা ধর কালীদাস যদি বেদনা না পেতেন, এমন বেদনার কথা প্রকাশ করতে পারতেন ? কবি আজ নেই, কিন্তু বিশ্বের মানুষের ভালবাসা তিনি দুঃখের দারুন মূল্যেই পেয়েছেন। সেখানে এমনি বিশেষ ভালবাসার কি মূল্য ! এই ধর আমাকে—

বৃদ্ধ হঠাৎ নিজের কোন্ স্মৃতির গভীরে ডুব দিলেন যেন। একটু থামলেন তিনি। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলুম।

বৃদ্ধ বললেন : জান, আমার তোমার মত একটি ছেলে ছিল। হঠাৎ সে একদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেল। আমি কত কাঁদলুম। নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দিলুম। ঈশ্বরকে দোষারোপ করলুম। এই ভাবে কতদিন কাটল। অবশেষে দিনে দিনে কালে কালে সেই দুঃখ আমার মধ্যে মহৎ অনুভূতি হয়ে ফুটে উঠল। আমার ব্যক্তির দুখ, আমি বিশ্বের মধ্যে আরোপ করে দিলুম। আজ মনে করি দুঃখের চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর নেই। সেই দুঃখকে আজ কত মধুর মনে হয়।

তিনি থামলেন। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তারপর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : তোমাকে মিছেই একথা বলছি। সে বয়স এখনো তোমার আসেনি। জীবনের মধ্য দিয়ে জীবন-বোধের মধ্য দিয়ে একে পেতে হয়। বলে বোঝানো যায় না।

তিনি একটু হাসলেন। বললেন : লোকে বলে বৃদ্ধ হয়েছি। আমাকে কে দেখবে ! আমি হাসি ওদের অজ্ঞতা দেখে। যিনি দেখবার তিনিই যে দেখেন। এই যে তুমি, তোমার কথাই ধর না। তুমি যখন বেরিয়ে পড়লে এখানে এসে ঠেকবে জানতে ?

গোবিন্দ স্মরণ করে বেরিয়ে পড়েছিলে—তাই অকূলে তিনি তোমাকে

এখানে এনে ফেললেন। এই যে এখানে আনলেন,—তারও একটা উদ্দেশ্য আছে—সে উদ্দেশ্য আমার এবং তোমার উপর দিয়ে সাধিত হবে।

হঠাৎ তিনি যেন এই সব তত্ত্ব কথা থেকে নিজেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন। বললেন: যাক—ওসব কথা থাক। তোমাকে বলছি শোন। কাব্যের মধ্যে অফুরন্ত সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্যের অনুভূতি আছে তোমার মধ্যে, কিন্তু সৌন্দর্য তার রহস্য উন্মোচন করে নি। ঈশ্বর অত্যন্ত করুণার্দ্র হয়ে দয়া না করলে সদ্গুরু লাভ করা যায় না। যেমন জীবনে মুক্তি-বোধের জন্য সদ্গুরুর প্রয়োজন আছে, তেমনি সৌন্দর্যের অনুকম্পা লাভ করতে গেলেও সৎ শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। আমি সৎ শিক্ষক কিনা জানি না, তবে তোমাকে সৌন্দর্য সন্ধানের ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করব। দেখলুম, অনেকটা পাঠ তুমি নিয়েছ। আর তোমার মানসিক প্রস্তুতি কাব্য পাঠের জন্য বেশ উন্নত। সুতরাং আমি তোমাকে কালিদাস পড়াব।

তিনি এক প্রাচীন তালপত্রের পুঁথি খুলতে লাগলেন। আমি কিছুকাল তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তারপর বাইরে সবুজের ছায়া আমার চোখে পড়ল। সেই স্নিগ্ধ সবুজের ডাকে আমি বাইরে তাকালুম। হঠাৎ এক আশ্চর্য জিনিষ লক্ষ্য করলুম। বৃদ্ধের বাগানের সর্বজয়া ফুলগাছের ভীড় ফাঁক করে দুটি কৌতুহলী চোখ এই দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সেই চোখ দুটো আমাকে কুন্দের চোখের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। আমি অমনি বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম। চোখে চোখে হতেই সেই পরিচিত প্রায় চোখ দুটি ফাঁক বন্ধ করে আড়াল হয়ে গেল। হারিয়ে যাবার মুখে আমি একটা লাল বিন্দু লক্ষ্য করলুম।

বৃদ্ধ ততক্ষণ তালপত্র মেলে ধরেছেন: এই এখান থেকে আমি আরম্ভ করব শোন। কশ্চিৎকান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ ···

হঠাৎ এমন সময় আঙিনায় অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনে আমি ফিরে তাকালুম। দেখলুম, কাল সন্ধ্যায় যারা আমাকে গ্রামের প্রান্ত থেকে কুড়িয়ে এনেছিল সেই সব লোকেরা।

তারা এসে বলল: এই যে পণ্ডিত মশাই—প্রণাম।

সহাস্য মুখে ব্রাহ্মণ তাদের দিকে ফিরে তাকালেন।

ওদের একজন বলল: নতুন অতিথির সঙ্গে পরিচয় হল?

বৃদ্ধ হেসে বললেন: ও আর অতিথি নয়। এখন তোমাদেরই একজন। আমার সন্তান। এখানেই থাকবে।

বৃদ্ধের সেই সিদ্ধান্তে ওদের মুখেও একটা আনন্দের ভাব লক্ষ্য করলুম। সাধারণ মানুষ বলেই ওদের হৃদয় বুঝি এত অসাধারণ।

ওদের একজন বলল: যাক নিশ্চিন্ত হলুম। ছেলে মানুষ। ওর কথা ভাবছিলুম আমরা।

বৃদ্ধ বললেন: জগন্নাথ ভাববার কর্তা। ওকে ঠিক আশ্রয়ে তিনি নিয়ে এসেছেন।

একজন হেসে বলল: আমরা তা জানতুম বলেই আপনার কাছে নিয়ে এসেছিলুম।

বৃদ্ধ বললেন: আমি কে? আমি উপলক্ষ্য মাত্র!

ওদের আর একজন বলল: আজ মঙ্গলবার। আমার পূজোর কথা আপনার মনে আছে তো?

বৃদ্ধ বললেন: ও! ভাল কথা মনে করিয়েছ। আমি এখুনি যাচ্ছি।

আমার তখন মনে হল, আমি আমার আশ্রয়দাতার উপকার করতে পারি। আমি বললুম: কি পূজো?

—চণ্ডী।

আমি বললুম: আমার পূজোর অভ্যেস আছে। আপনি আদেশ করুন আমি পূজো করব।

ব্রাহ্মণ আমার দিকে তাকালেন।

ঐ সব লোকেরাও আমার দিকে তাকাল। ওদের একজন বলল: সে খুব ভাল। উনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তুমি যদি ওর কাজ করে দাও ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন।

আমি বললুম: পূজো আমার খুব ভাল লাগে। আমি পূজো করে দেব।

বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটল। বললেন: ঈশ্বর করুণাময়। সময় মত

তিনি যখন যা প্রয়োজন, তাই করেন। এই বৃদ্ধ বয়সে অযাচিত ভাবে তিনি আমার জন্য সাহায্য পাঠিয়েছেন।

যযমানদের কারো দিকে তাকিয়ে বললেন: জান, ও বড় ভক্তিমান, ওর পুজো কল্যাণকর হবে।

সে বলল: আমরা কিছু মনে করব না, আপনি ওকে পাঠাবেন পণ্ডিতমশাই।

আমিও আনন্দ বোধ করলুম: ঈশ্বর আমাকে কারোর উপর ভার-স্বরূপ করবেন না। আমি গোবিন্দকে মনে প্রাণে ধন্যবাদ দিলুম। হঠাৎ সেই মুহূর্তে আমার কুন্দের কথা মনে পড়ল:—তিনি যদি এত করুণাময়, তবে আমাকে দুঃখ দিলেন কেন?

হঠাৎ বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল। এই কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি আমাকে বলেছেন, দুঃখই ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় দান। তাই কি? কিন্তু আমি যে তা বুঝতে পাচ্ছি না। তাই পুঞ্জিভূত অভিমান আমার বুকের মধ্যে গুম্‌ড়ে গুম্‌ড়ে উঠতে লাগল।

যেটুকু আনন্দের শিহরণ আমি আমার মধ্যে অনুভব করতে যাচ্ছিলুম তা মুহূর্তে নিভে গেল।

বক্তা এইটুকু বলে থামলেন। শ্রোতাদের বুকের মধ্য থেকেও যেন একটা আবদ্ধ নিঃশ্বাস দীর্ঘ রেখাতে বেরিয়ে এল। কেউ কেউ হতাশ হল। কয়েকজন যুবক শ্রোতা নিজেদের মধ্যে অস্থির বোধ করল। গল্পটা শুধু এই ভাবে এঁকে বেঁকে চলেছে, এর পরিণতি কোথায়? ঈশ্বরের কথা এল বটে। কিন্তু এই কি ঈশ্বর-অনুভূতি? এর উপর নির্ভর করেই কি বলা যায়—ঈশ্বর আছেন, আমি তাকে পেয়েছি? দুঃখ মহত্তর হয়ে উঠল কোথায়?

শুধু বৃদ্ধ কয়জন হতাশ হোল না। যে জীবন ক্লেদাক্ত দৈহিক প্রেমের কামনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল ঈশ্বরের সামান্যতম আলো হলেও তা এসে এই গল্পের উপর পড়েছে এখন। গল্প শেষ হচ্ছে না। রহস্যময় ভঙ্গীতে একের পর আর একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তা হোক, সেই জন্য গল্পের দীর্ঘ আকৃতির জন্য ক্ষোভ নেই তাদের। অনেক বয়েস হয়েছে, অনেক কিছু দেখেছে তারা। জীবন কখন কোন্ পথে চলে, জীবনের

অধিকারী মানুষেরাই কি তা জানতে পারে? দুঃখ সুখের দ্বন্দ্বের মধ্যে এমনি করেই জীবন এগিয়ে চলে। গল্পের বিচিত্র গতির জন্য ক্ষোভ নেই তাদের। শুধু সেই কালো মেয়েটির মনে কোন্ ভাবের অনুভব ছায়া ফেলল ধরা গেল না। বক্তা তখনো চুপ করে আছেন। তিনি আজ আর বলবেন না। সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনিই বোঝা যায়। রাত্রির আহ্বান অনুভব করা যাচ্ছে। সকলেই তাই মন্দিরের বারান্দা ছেড়ে পথে নামল। প্রদীপের আলোর শেষে অন্ধকার মুহূর্তের মধ্যে তাদের গ্রাস করে নিল।

শুধু সেই জীবন সত্যের অধিকারী বক্তা একাকী বসে থাকলেন।

সাত

জীবনের গল্পের নেশা বড় দারুণ গল্পের নেশা। নদীর স্রোতের মতই তা শ্রোতাকে টেনে নিয়ে যায়। অবশেষে সাগরে না নিয়ে গেলে থামতে ইচ্ছে হয় না। অনেকেই শুধু দুঃখের এই কাহিনীকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারল না। ঈশ্বর দূরে থাক, সে কথা তখন তাদের মনে নেই। গল্পের সমাপ্তিটা জানা দরকার। সেই আকর্ষণকে কিছুতেই তারা এড়াতে পারল না, তাই আসতে লাগল।

সন্ধ্যায় আবার ভীড় জমল। বেদনার শেষে কি সুখের সমাপ্তি নেই? কথক কি সেখানে নিয়ে গিয়ে গল্পের উপসংহার টানবেন না? শুধুই বেদনার মধ্যে গল্পকে ছেড়ে দিতে বড় বাধে।

মন্দিরের আঙিনায় সেই উৎসুক শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার কথক তাঁর গল্প আরম্ভ করলেন: আমি সেই বৃদ্ধের পক্ষপুটেই গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কিন্তু সুস্থ একটা শান্ত মনেই যে সেখানে থাকতে পারলুম তা নয়। মাঝে মাঝেই আমার মনে পড়ে যেতে লাগল সেই কুন্দের কথা। আর আমার হৃদয়টা বেদনায় মুচ্‌ড়িয়ে উঠতে লাগল। কখনো মনে হল, না এখানে থেকে লাভ নেই। এর জন্য তো আমি আসিনি। আমি বেরিয়েছি নিজেকে দাঁড় করাতে, শক্তি সঞ্চয় করতে। কুন্দকে আমি ভুলতে পারব না। ভুলব না। তাকে আমার চাই। সুতরাং বেরুতে হবে। কিন্তু কোথায় বেরুব? বিশাল বিশ্বের অপরিচয়ের অকূল সাগর কল্পনা করতেই আমার ভয় করতো। আমার সমস্ত সাহস উবে যেত। তখন অসহায় ভাবে শুধু নিজের মনের মধ্যেই গুমরাতে থাকতুম আমি।

তখন সেই বৃদ্ধ কাব্যের এক অলৌকিক জগতের দুয়ার আমার কাছে খুলে দেবার জন্য পাঠ করে শোনাতেন 'মেঘদূত'।

তিনি পড়তেন অত্যন্ত আবেগ দিয়ে। তার আবেগে প্রতি ছত্রে ছত্রে যে জীবনের সঞ্চার হত, আমি তখন সেই আবেগের মধ্যে আমার

বেদনাকে ছেড়ে দিতুম। মেঘ যাবে অলকার সেই যক্ষপ্রিয়ার কাছে। আমিও ঊর্ধ্বে তাকাতুম। তেমন সজল কালো মেঘ কদাচিৎ দৃষ্টিতে পড়ত। কিন্তু শ্বেতপক্ষ-মেঘের আকাশে আনা-গোনার বিরাম ছিল না। কখনো সে মেঘকে সেই রাজবাড়ীর দিকে যেন চলতে দেখতুম আমি। আমার মনে হত, এই মেঘের জীবন আছে, চেতনা আছে। বলতুম : হে মেঘ তুমিও উড়ে যাচ্ছ সেই দিকে, সেই গোবিন্দজীর মন্দিরের কাছে। সেখানে একটু থেমো তুমি। মন্দির পার হয়ে ফুলগাছের অরণ্যের নীচে, পেয়ারা বনের সবুজ ছায়ায় কাটাচোরা ঝাঁড়ের আড়ালে তুমি যদি কুন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ তবে সেখানে একটু অপেক্ষা কোর তুমি। তাকে একটু ভাল করে দেখ। আমার হৃদয়ের সমস্ত বেদনা তুমি সেইখানে পাঠিয়ে দিও—যেন কুন্দ বোঝে আমি তাকে ভুলিনি। এক অধীর অপেক্ষায় উৎকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষায় তার জন্য আমি এখানে দিন গুনছি। তাকে বোলো সে যেন অপেক্ষা করে। আমি আসব, নিজেকে প্রস্তুত করে আমি যাব।

যত সৌন্দর্যের সেই রহস্যলোক আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হত, তত আমি কুন্দের সেই বিশাল চোখ ছুটির কথা ভাবতুম। আমার মনে হত, যক্ষ-প্রিয়া আর কেউ নয়; আর আমিই সেই অভিশপ্ত যক্ষ।

মেঘদূত কয়দিন পড়িয়ে শেষ করলেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। তিনি যেন ছন্দে ছন্দে ছবি আঁকলেন। আর আমার মনে হল সেই ছবি কুন্দের উপর ছায়াপাত করে তাকে আরো রহস্যময় করে তুলল।

কাব্য পাঠ শেষে আমার দিকে তাকালেন বৃদ্ধ পণ্ডিত। জিজ্ঞেস করলেন : বলতো। এই অভিশপ্ত যক্ষ কে?

আমি বললুম : গন্ধর্ব রাজসভার একজন গায়ক।

তিনি হাসলেন। বললেন : কেউ নয়! এ চিরকালের শিল্পী। শিল্পীর হৃদয় চিরকাল এক অভাবের বেদনায় ভারগ্রস্ত। তার মনের মতন কিছুই নয়। কি এক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তাকে অপূর্ণ রাখে। তাই তার আকুতি মধুর স্বপ্ন হয়ে সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করতে চায়। যক্ষিণী তার সাধ, কাব্য তার স্বপ্ন। চিরকাল শিল্পীর প্রাপ্তি এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এই ব্যবধান। এইটেই বিধাতার অভিশাপ, আমার মতে এইটেই

বিধাতার আশীর্বাদ। সশরীরে কোন মানুষ আজ পর্যন্ত সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কাছে যেতে পারেনি। পারেনি বলেই তার অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করবার জন্য মানুষের এত হাহাকার। এই হাহাকার থেকেই মানুষ এগিয়ে চলেছে। যার হাহাকার মহৎ তিনি শিল্পী, যার হাহাকার শুধুমাত্র অর্থহীন যন্ত্রণা, তিনি সাধারণ মানুষ।

সেই ব্যাখ্যা শুনে আমি ব্যাখ্যাতার দিকে তাকিয়ে থাকতুম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতুম, কাব্য ব্যাখ্যা করতে করতে তিনি যেন অন্য এক জগতে চলে গিয়েছেন। সেখানে তিনি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে।

তাঁর আবেগ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতুম। তাকিয়ে থাকতুম। কিন্তু মনে মনে সম্পূর্ণ সে কথা মেনে নিতে পারতুম না। সত্যিই কি মানুষ যা চায় তা সে কোনদিন পায় না? তাহলে আমি কুন্দকে পাব না? সারা জীবন এই অপূর্ণতার হাহাকার আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে?

আমি হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করলুম: আচ্ছা আপনি বার বার বলছেন বিরহেই সুখ; বেদনাতেই সুখ, তবে মিলনে কি কোন আনন্দ নেই?

আমার মুখে যেন এমন প্রশ্ন এখনো তিনি আশা করেন নি। কিছুকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর বললেন: তোমার মনে প্রশ্ন আছে। বিনা বিচারে সব মেনে নাও না। এটা ভাল। হ্যাঁ, আমি এখনো বলছি বিরহ আর বেদনার মধ্যেই মানুষের সুখ এবং মহত্ত্ব।

মানুষ কোন দিনই যা চায় তা পায় না। কারণ আকাঙ্ক্ষা অসীম। যদি জীবনের গতি রাখতে হয়, তবে চিরকাল আকাঙ্ক্ষা থাকবে। যার মধ্যে পরমার্থ কামনা করে মানুষ হাত বাড়ায়, তা যদি পায়, তবে সে দেখবে তাতে সব নেই। আরো কিছু তার পাবার আছে। সেই আরো কিছুকে আকাঙ্ক্ষিতের মধ্যে না পেলে তার মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। তখন উঁচু হওয়া তো দূরস্থান, সে আরো নীচু হয়ে যায়। অপর পক্ষে অভাব, অতৃপ্তি, শিল্পীর ভঙ্গীতে সেই বেদনাকে গ্রহণ করে সে এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁছোয় যেখানে শেষ পর্যন্ত বেদনা উধাও হয়ে গিয়ে এক স্নিগ্ধ বঞ্চনায় হৃদয় প্রসারিত হয়। সমস্ত কিছুর মধ্যে

সে তখন পরম এক অব্যক্ত প্রসাদ লাভ করে। এই পৃথিবী মধুময় হয়। স্থলে জলে অন্তরীক্ষে সব ভাল লাগে। তুচ্ছতম জিনিষ সুন্দরতম হয়ে ওঠে তাঁর দৃষ্টিতে। শ্রীরাধিকা দেখেন অণুতে পরমাণুতে সর্বত্র তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতিরূপ।

কথাগুলো শুনতে ভাল লাগল। কিন্তু সব কথাকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারলুম না আমি।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: আজ তুমি সব বুঝবে না। জীবনের মূল্যে ধীরে ধীরে সেই পরম সত্যকে অনুভব করতে হবে। জীবনের পাশ দিয়ে চলে গেলেও সবাই সে সত্যকে ধরতে পারে না। তুমি শিল্পী, তোমার হৃদয় সংবেদনশীল; তুমি হয় তো জীবন সাধনায় মধ্যে তাকে কোনদিন ধরতে পারবে।

হঠাৎ তিনি আমাকে এক আশ্চর্য প্রশ্ন করলেন: ব্যথা পেয়েছ?

মিথ্যা আমি কখনো বলতে পারি না। অথচ সে চরম সত্যের কাহিনী তো সকলের কাছে প্রকাশ করা যায় না। তাই আমি চুপ্ করে থাকলুম।

তিনি আমার দিকে আর একবার তাকিয়ে দেখলেন: হ্যাঁ, পেয়েছ। তোমার চোখের মধ্যে সে কথা লেখা আছে।

আমি লজ্জা পেলুম।

তিনি বললেন: তোমার বেদনা মহত্তর হোক।

হঠাৎ আমি তাঁকে বললুম: বেদনা ছাড়া কি সেই শিল্পলোকে একেবারেই পৌঁছানো যায় না?

তিনি বললেন: না। বলতো জগতে কোন নারী মাতৃত্বের পরম সার্থকতা, জীবনের পরম আনন্দ, গর্ভ-যাতনা সহ্য না করে পেয়েছেন? আনন্দ যে নিজের মনের সৃষ্টি। শান্তি যে নিজের মনের সন্তান। বেদনা ব্যাতিরেকে তার জন্ম হতে পারে?

আমি বললুম: রাজপুত্র সিদ্ধার্থ তো সুখেই লালিত। তিনিও তো জীবনে সুখের, শান্তির সন্ধান পেয়েছিলেন?

বৃদ্ধ বললেন: সুখ কাকে বল! সুখই যদি তিনি পাবেন, তবে তিনি সংসার ত্যাগ করবেন কেন? মানুষের অজ্ঞানতায়, মানুষের বেদনায়

তিনি ছিলেন চূড়ান্ত ব্যথিত, তাই অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তিনি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তপস্যা কি? নিজের অন্তরের মধ্যে সত্য অনুভবের অনুসন্ধান। যেদিন সে সন্ধান মেলে সেদিন তপস্যা সমাপ্ত।

তিনি বললেন: দুঃখ আর বেদনাকে মহত্তর অনুভবে, অন্তরের বিশালতায় যদি সহ্য করা না যায়, তবে অমঙ্গল। পরমের সন্ধান তো মেলেই না, জীবনে সার্থকতাও আসে না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক হাহাকার নিজেকে এবং চতুর্দিককেও দূষিত করে। আমি আর এক অনবদ্য প্রেমোপাখ্যানের মধ্য দিয়ে তোমাকে সে কাহিনী শোনাব। মহাকবি কলিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে নিজের পুঁজি ভেঙে শিল্প-লোকের সঞ্চয় সংগ্রহ করে দিতে লাগলেন। তিনি প্রস্তুত হলেন আমাকে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' শিক্ষা দেবার জন্য।

কিন্তু সেই পরিপক্ব নাটক, আমি যাকে বলি কাব্য, তা হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্বে আমি আর একটি নতুন রহস্যের সন্ধান পেলুম।

সেই যে সর্বজায়া গাছের আড়ালে, সবুজ পাতার ভীড় সরিয়ে একটি মেয়ে প্রথম দিন উঁকি দিয়েছিল, যার কপালে একটি লাল বিন্দু লক্ষ্য করেছিলুম আমি, ইতিমধ্যে সে রহস্য ধরা পড়ে গেছে আমার কাছে। আমাদের পাশের গৃহের সে এক শূদ্রকন্যা। নাম শবরী। নিজেকে না জানতেই ওর হল বিবাহ। সমাজের এই রীতি। অথচ শূদ্র সমাজের মধ্যে এত নিয়ম-কানুনের বালাই নেই। অষ্টম বর্ষে বিবাহ না হলে তার কন্যা অরক্ষণীয়া হয় না। স্বামী মরলে তাকে সহমরণে যেতে হয় না। কিন্তু শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের দেখে অষ্টম বর্ষে গৌরীদান, করে। স্বামী মরলে পত্নীকে চিতায় শয়ন করায়। শবরীরও সেইজন্য অষ্টম বর্ষে গৌরীদান হয়েছিল। শূদ্রের গৃহে সে ছিল কল্পনার অতীত। অপরূপা সুন্দরী। কিন্তু সেই অষ্টম বর্ষে তার দেহের লাবণ্য নিজের কথা নিজে প্রচার করতে পারেনি। সে ছিল সুপ্ত। শবরীর স্বামী সেই আট বছরের মেয়ে অর্ধচেতন দেহ ভেদ করে কোনদিন এক অপ্সরা মানবীর প্রকাশ ঘটবে ভাবতে পারেনি। তাই উর্ধ্বতম সমাজে যা হয় কুলীন ব্রাহ্মণদের মত বিবাহের পরই পরিনীতা স্ত্রীকে ত্যাগ করে সে উধাও

হয়েছিল। স্বামী উধাও হলে কি হবে, বিবাহের চিহ্নকে অস্বীকার করবার উপায় ছিল না শবরীর। সিঁদুর পরে তাই সে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার ঘুরে বেড়াবার সীমানা অত্যন্ত সীমিত। নিজের গৃহের আঙিনা আর এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কুটীর।

স্বামীর কথা মনে নেই শবরীর। কিন্তু দেহে তার আমারই মত কৈশোর শেষে নতুন জীবনের আহ্বান এসেছে। নিঃসঙ্গতাকে জীবনের বিরাট অভিশাপ বলে মনে হয়। আমি স্বপ্নের বস্তুকে হাতের কাছে পেয়ে হারিয়ে তার স্মরণ বুকে নিয়ে ঘুরি। মান করি, অভিমান করি, কাঁদি, তাতেই তৃপ্তি। কিন্তু শবরীর সে অভিজ্ঞতা নেই। তার মনের মধ্যে আছে শুধু অব্যক্ত ভাবে এক হাহাকার। সেই হাহাকার সে মেটাতো সারাদিন প্রজাপতির পেছনে ছুটে, আর নীলকণ্ঠ পাখীর দিকে তাকিয়ে। অবশ্য সীমিত পরিবেশের মধ্যে। এর বাইরে যদি কোন মিষ্টি পাখীর গান তার কানে আসত, সে শুধু উৎকর্ণ হয়ে শুনতো।

আমি তার সব কাহিনী শুনেছিলুম ব্রাহ্মণ গৃহিণীর কাছ থেকে। আমি এখন তাকে মা বলে ডাকি। স্বামী-সান্নিধ্যে তাঁরও দৃষ্টির প্রসার ঘটেছিল অনেকখানি। শূদ্রের ছায়া মারালে তার জাত যেত না। শবরী ছিল তাঁরও স্নেহের পাত্রী।

আমি দূর থেকে ছুটে এসে তার স্নেহের ভাগের অংশ নিয়েছিলুম। হঠাৎ তাই একদিন প্রাতে আমাকে আবিষ্কার করতে পেরে সে চমকে উঠেছিল। সর্বজায়া গাছের ফাঁকে সে উঁকি দিয়ে দেখেছিল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে পড়াচ্ছেন 'মেঘদূতম্'।

কিন্তু অপরিচিতকে তার ভয় আমার চাইতেও বেশী। তাই সেদিন সে চোখে চোখে হতে মুহূর্তে সরে গিয়েছিল। পর পুরুষের কাছে তাকে যেতে নেই এইটেই সে শিখে এসেছে। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আমার মধ্যে ভয় করবার মত কিছু সে দেখেছিল কিনা সেই জানে। ততটা আমি তো আর তাকে লক্ষ্য করিনি!

কখনো নীরব অবসরে আপনাকে আমি একা পেলে আকাশের দিকে তাকাতুম। যে পথে আমি এ গ্রামে প্রবেশ করেছিলুম সে পথের

রেখা ধরে ফেলে-আসা রাজবাড়ীর দিকে তাকাতুম। ভাবতুম, সেখানে এখনো কুন্দ আছে।

অন্য কিছু আমার দৃষ্টিতে পড়ত না।

আমার সেই একক বিষণ্ণতা বুঝি শবরীর কৌতূহলী দৃষ্টির কাছে আটকে গিয়েছিল। তাই সে আমাকে লক্ষ্য করতো, দেখতো, বিচার করবার চেষ্টা করতো। মেঘদূতের বর্ণনার প্রকৃতির কথা ভেবে একদিন আমি আমার চতুঃপার্শ্বের তৃণ-বৃক্ষের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ শবরীকে লক্ষ্য করলুম। বকুল গাছের আড়াল থেকে সে আমাকে লক্ষ্য করছে। আমি সেদিকে তাকাতেই একটা মূর্তিমতী লজ্জার লালিমা যেন আড়ালে সরে গেল। তার সেই লজ্জা-নম্র সুন্দর ভঙ্গীমাটুকু আমার বেশ ভাল লাগল। পরক্ষণেই মনে ব্যথা অনুভব করলুম—আমারই মত সে প্রিয়জন বিরহে কাতর। শবরীকে দেখতে গিয়ে আমার বেদনার দৃষ্টি চলে গেল কুন্দের কাছে। আমি ভাবলুম, কুন্দও একদিন এত বড় হবে। তার কপালে কি এমনি সিঁদুর···। না, না, সে কথা আমি ভাবতে পারলুম না। আমার হৃদপিণ্ড আর্তনাদ করে উঠল। আমার মনে যে তীব্র স্বপ্নই থাক না কেন, আমার অবচেতন মন জানতো কুন্দকে আমি কখনো পাব না। এমনি রক্ত রঙের সিঁদুরের টিপ্ দিয়ে যে তাকে নিয়ে যাবে সে জানবে না, সেই সিঁদুরের টিপ্ আমার বুকের রক্ত। শবরী আড়ালে চলে গেল। আমি আমার নিজের বুকের অন্ধকারে হারিয়ে গেলুম।

একদিন শ্রান্ত দিবস অপরাহ্ণের আলোতে অলস হয়ে ঝরে পড়ছিল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম বকুল তলাতে। হঠাৎ মনে পড়লো কুন্দের কথা। বকুলতলাতে আমি আর সে দাঁড়িয়েছি এমনি করে কতদিন। সেই নির্জন ম্লান সন্ধ্যায় আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলুম না। আমার চোখ থেকে আপনি অশ্রু ঝরে পড়ল।

আমি জানতুম না সেই গাছের অপর পাশে শবরী লুকিয়ে বসেছিল। হঠাৎ আমি তাকে মুখোমুখী দেখতে পেলুম। শবরী নিশ্চয়ই জানতো না একাকী সেখানে দাঁড়িয়ে আমি বিষণ্ন স্মৃতির ভারে চোখের জলে ভাসছি। আমাকে দেখলে সে নিশ্চয়ই আমার সামনে আসতো না।

হঠাৎ সে ভাবে আমাকে দেখে সে লজ্জার একটা চমক খেতে গেল—কিন্তু লজ্জার আরক্ত উত্তেজনা অনুভব করবার আগেই আমার চোখে জল দেখে সে বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গেল। লজ্জা পাবে, না অবাক হবে, কোনটা সে স্থির করতে পারল না। সে কিছুকাল তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। ধীরে ধীরে তার চোখের আলোতে একটা স্নিগ্ধ সমবেদনার ভাব ফুটে উঠতে দেখতে পেলুম আমি। কিন্তু সে কিছু বলল না—শুধু ধীরে ধীরে চলে গেল।

পরদিন আমি চলছিলুম পূজো করতে দূরের গাঁয়ে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পুত্রতুল্য হয়েছি আমি। তাঁর এ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। আমার তিনি আশ্রয়দাতা। আমার তিনি পিতাও। কারণ আমার জ্ঞানের জন্মদান করছেন তিনি। হঠাৎ আমি দেখলুম, মাধবীলতার আড়াল থেকে শবরী আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

অপরিচিতা ঐ সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকাতে শবরীর চেয়ে আমিই চমকে গেলুম বেশী। আমি মাথাটা নীচু করে নেব ভাবলুম।

শবরীর চোখে কিন্তু তখন কোন কৌতুকের দৃষ্টি ছিল না, ছিল—সমবেদনার দৃষ্টি।

আমি মাথা নীচু করতে যাব, হঠাৎ শুনলুম—ও কথা বলছে। হ্যাঁ, আমাকে লক্ষ্য করেই বলছে।

আমি ওর দিকে তাকালুম।

শবরী বলল: তুমি কাল কাঁদছিলে কেন?

আমি সে প্রশ্নের কি জবাব দেব ভেবে পেলুম না।

শবরী বলল: তোমার বুঝি কেউ নেই?

আমি বললুম: না।

ওর নাকের নথ দুলল। কপালের টিক্‌লিটা একটু সরে গেল। নিজের আঁচল থেকে এক গাদা ফুল বের করল সে। বলল: তোমার জন্য এনেছি, নাও।

আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলুম না। তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—সে আমার জন্য ব্যথিত। এ সমবেদনার দান।

কিন্তু আমি ফুল দেখে অবাক, গোলাপ ফুল। আমাদের ধারে

কাছে সে ফুল নেই। গোলাপ ফুল হিন্দুদের কাছে ম্লেচ্ছ ফুল। এ ফুল পুজোয় লাগে না বলে কেউ চাষ করে না। এ ফুল শবরী আনল কোত্থেকে? আমি বললুম: ফুল পেলে কোথায়?

হাত দিয়ে কোথায় দেখিয়ে দিল সে-ই জানে। বলল: ঐ ওখানে।

আমি বললুম: এ ফুল পুজোয় লাগে না।

শবরী বলল: না লাগল। ভাল গন্ধ আছে। রাস্তায় চলতে চলতে ঘ্রাণ পাবে। এ ফুল আমার খুব ভাল লাগে।

কারো ভাল লাগার দানকে কে কখন অবজ্ঞা করতে পারে? কেউ নয়।

আমি শবরীর দিকে তাকালুম—পূজো বোঝে না সে। যা তার চোখে সুন্দর, ভাল, তাই ভাল। তা হলে সেও কি শিল্পী? আমি নতুন দৃষ্টিতে শবরীর দিকে তাকাবার চেষ্টা করলুম।

কিন্তু সে তখন আর নেই। আপন মনে নিজের পথ বেয়ে ততক্ষণ চলতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

আমাকে শবরী আর ভয় করতো না। শবরী বুঝে ফেলেছিল আমি আর ভয়াবহ কিছু নই। কিন্তু সমাজ তার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সমাজকে সে ভয় করতো। আমার সঙ্গে কথা বললে—যদি কেউ দেখে, এটাই ছিল তার কাছে ভয়ের। তাই লোকচক্ষুর সামনে সে কখনো আমার কাছে আসতো না।

আমাকে একা নীরবে দেখলে সে আসত। কিছুকাল দাঁড়িয়ে থাকতো।

আমি কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দিত না। নিজের মনেই কিছুকাল দাঁড়িয়ে থাকতো—তারপর হঠাৎ চলে যেত।

সেদিন আমি মেঘদূতের সেই মেঘের বর্ণনা পড়ছিলুম। আমি ছিলুম একা। সেই সজল মেঘের বুকে প্রাণসঞ্চারিণী এক জীবন্ত শক্তি যেন আমি অনুভব করছিলুম। হঠাৎ কোত্থেকে শবরী এল। আমি হেসে তার দিকে তাকালুম: কী?

শবরী কোন কথা না বলে আঁচল থেকে একটি মালা বের করল। বকুল ফুলের মালা।

আমি বললুম: কে গাঁথল?

শবরী বলল: আমি।

—কার জন্য?

—তোমার জন্য।

এই বলে সে মালাটি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

আমি সে মালা নিলুম। আমার অনাত্মীয়-হৃদয় সে একটা 'আপন' স্পর্শের জন্য ব্যাকুল ছিল—আমি যেন তা পেলুম। আমার ভাল লাগল—আমার বুকের হাহাকার যেন কিছুটা এতে কমে গেছে। আমার কুন্দ যেন শবরী হয়ে আমার কাছে এসেছে।

এমনি করে শবরীর সঙ্গে হৃদয়ের এক নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হল আমার। সে সম্বন্ধের স্বরূপ কি আমি তখনো জানতুম না।

এমনি দিনে আমার আশ্রয়দাতা সেই পিতৃতুল্য ব্রাহ্মণ আমাকে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' পড়াতে বসলেন।

রাজা দুষ্মন্ত তপোবনে এসেছেন। প্রথম দর্শনেই শকুন্তলার চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে। রাজা নিজেও মদনের শরাঘাতে জর্জরিত। লজ্জাতুরা শকুন্তলার রাজাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা। অথচ লজ্জায় তাকাতে পাচ্ছে না। সখীরা এগিয়ে যাচ্ছে। আর একবার না দেখলেই নয়। শকুন্তলা ছল করে কণ্টকে অঞ্চল জড়িয়ে নিল: সখী দাঁড়াও আমার আঁচলটা খুলে নি। আঁচল খুলতে গিয়ে সেই ফাঁকে সে দুষ্মন্তকে দেখে নিল।

আমি নিজের জীবনে তার সামঞ্জস্য খুঁজতে লাগলুম। সেই প্রিয়দর্শিনী কি কখন এমন অভিনয় করতো? না। মদনাতুরা কিশোরীর এ ব্যাকুল-হৃদয় কখনো সে লাভ করে নি। তার হৃদয়ে যদি কোন বেদনা থেকে থাকতো, সে বেদনার স্বরূপ সে বুঝতে পারতো না। ভাবলুম কুন্দের কথা। না, এ শরম তার ছিল না। শরম ভালবাসার মাধুর্য এটা সে তখনো বুঝতে পারে নি। তাই লজ্জা তার ছিল না। দেখবার হলে জোর করে দেখতে হবে, পেতে হবে। জোর করত সে আমার

কাছে। তার প্রেমতো সজ্ঞান নয়, সুতরাং লজ্জা আসবে কেমন করে? তবে কে, কার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে? মনে পড়ল শবরীর কথা, আড়ালে ছল করে লুকিয়ে সে-ই দেখে। শকুন্তলার চিত্র, আমার মনের মধ্যে কল্পনা করা আমার পক্ষে বিন্দুমাত্র কষ্টকর হল না। শবরীর মত পূর্ণ-নদীর লাবণ্য ভরা দেহ তার, পূর্ণ-কৈশোরের শ্যামল আভায় টলমল করছে।

আমি শবরীর মুখখানা চিন্তা করলুম। ভাবলুম—যদি কখনো তার দেখা পাই একথাই বলব।

দেখা পেলুম, করণ সেও তো দেখা করতে চাইতো। আমি যাচ্ছিলুম স্নানে। সে দেখছিল নীলকণ্ঠ পাখী। আমি শবরীকে দেখে থামলুম। ডাকলুম : শবরী!

আমি এ পথে আসব, শবরীও জানতো।

ফিরে তাকাল সে : কি? ডাকছ কেন ঠাকুর?

আমাকে সে ঠাকুর বলতো, শুধু সে নয় সকলেই বলত।

ব্রাহ্মণকে সবাই ঠাকুরই তো বলে।

আমি বললুম : আমি তোমায় খুঁজছিলুম।

অবাক হল সে। যেন একটু ভয়ও পেল : কেন?

—একটি কথা বলব তোমাকে?

তার মুখখানা রাঙিয়ে উঠে গম্ভীর হয়ে গেল। সে চুপ্ করে থাকল।

আমি বললুম : জান, তুমি ঠিক শকুন্তলার মত দেখতে?

অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো সে : সে কে?

আমি বললুম : শকুন্তলার নাম শোননি? কণ্ব মুনির কন্যা।

আরো অবাক হয়ে সে বলল : কণ্ব আবার কে?

আমি বললুম : মস্ত বড় মুনি। মহাভারতে লেখা আছে।

শবরী বলল : তার মেয়ে ছিল?

—কেন থাকবে না। ছিল।

হঠাৎ সে আমাকে বলল : তাই কি?

আমি বললুম : তুমি ঠিক তারই মত দেখতে। তার মত কিশোরী তুমি। তারই মত সুন্দরী।

'সুন্দরী' কথাটা শুনে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল শবরী। কেমন নীরব হয়ে মাথা নীচু করে থাকল।

তার সেই অদ্ভুৎ রহস্যকে আমি ঠিক কিছুতেই ধরতে পারলুম না।

হঠাৎ চকিত হয়ে কলাবনের ফাঁকে সে কি দেখল—আর যেন ভয়ে কালো হয়ে গেল। মুহূর্ত বিলম্ব না করে চলে গেল।

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

সে এল দুদিন পর। আমি যখন তালপত্রের পুঁথি খুলে আপন মনে 'শকুন্তলা' পড়ছিলুম। বৃন্ত থেকে একটা ফুল যেমন নীরবে খসে পড়ে তেমনি হঠাৎ সে আমার সামনে এসে বসল। সে বোধ হয় তকে তকে ছিল—আমার দেখা পেয়ে এল।

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম,—দুদিন সে আসে নি। বললুম: এ দুদিন কোথায় ছিলে?

সে কথার জবাব না দিয়ে শবরী বলল: শোন, তুমি আমার নাম ধরে ডাকবে না।

আমি একটু হাসলুম: কেন?

—যদি কেউ শুনতে পায়?

—তাই কি?

সে চোখ দুটো যেন রাঙা করে উঠল: না।

আমি একটু আহত হলুম। বললুম: বেশ তাই হবে। আমার মুখটা বুঝি গম্ভীর হল।

শবরী হঠাৎ নরম হয়ে গেল। বলল: কি হল তোমার?

আমি বললুম: কিছু না।

সে বলল: তুমি বোঝ না। আমার নাম ধরে ডাকলে কেউ শুনলে লোকে দুষবে না?

—কেন?

—তা জানি না।

আমি বললুম: বেশ, তোমার ইচ্ছে না হয়, আমি তোমার নাম ধরে ডাকব না।

শবরী বলল: না, ডেকো, তবে খুব আস্তে করে এ্যাঁ!

আমি না হেসে পারলুম না।

শবরী বলল : শকুন্তলা কে, তুমি বলছিলে ?

—বললুম তো তখন।

সে বলল : আবার ভাল করে বল শুনি।

আমি তাকে বিস্তৃত ভাবে দুষ্মন্ত শকুন্তলার উপাখ্যান শোনাতে লাগলুম। এমন সময় আমাদের ঘরের উঠানের নীচ দিয়ে কে চলে গেল।

শবরীর যেন সজাগ কান। চমকে ফিরে তাকাল সে, আর মুহূর্তে তার মুখটা ফেকাসে হয়ে গেল।

আর কাল মাত্র বিলম্ব না করে সে চলে গেল।

শবরীর এই খেয়ালীপনার রহস্য আমি কিছুতেই ধরতে পারিনে।

সেই যে শবরী গেল দুদিন আর তার দেখাটি পর্যন্ত পেলুম না। সে বোধ হয় পথেও বেরুতো না। এ কয়দিনে শবরী আমার অনেকখানি আপন হয়েছে। কখন কুন্দের অভাব যে সে অনেকটাই পূর্ণ করে দিয়েছিল আমিই কি তা জানতুম! ভালবাসা-প্রত্যাশী মন সর্বদাই আশ্রয় চায়। চেতন মন যদি সে কথা না জানে অবচেতন মন চায়। একটি হৃদয়-বঞ্চিত আমি অপর একটি হৃদয়ের জাঙাল বেয়ে কখন যে লতিয়ে লতিয়ে আশ্রয় করে বেড়ে উঠবার চেষ্টা করছিলুম তা আমিই জানতুম না। দুদিন শবরী না এলে আমার কেমন শূন্য শূন্য বোধ হতে লাগল। আমার নির্জন একাকিত্ব যেন কিছুতেই পূর্ণ হয়ে উঠল না।

প্রথম দিন ভাবলুম, অভাব অনুভব করলুম। দ্বিতীয় দিন অভাবটা যন্ত্রণা হয়ে দেখা দিল। ভাবলুম, কি অপরাধ করেছি যার জন্য শবরী আমাকে এড়িয়ে চলছে? না, এ কথার জবাব আমি তার মুখে শুনতে চাই। মনে হল, সেই মুহূর্তে শবরীদের ঘরে যাব, জিজ্ঞেস করব। কিন্তু কেন যেন সেটা সম্ভব বলে মনে হল না। সুতরাং কি করে দেখা পাওয়া যায়, সেই সুযোগ খুঁজলুম। আমি জানতুম অন্ততঃ সন্ধ্যেবেলা সে পুকুর ঘাটে জল নিতে আসবেই। সেখানে কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে আমি দাঁড়িয়ে থাকলুম। সূর্য পাটে বসতে যাচ্ছে; আমি দেখলুম শবরী

কলসী নিয়ে বেরুল। আমাকে অতিক্রম করেই তাকে যেতে হবে। পাশ দিয়ে যেতেই আমি তাকে ডাকলুম: শবরী! সে যেন শুনতেই পেলনা, এমনি করে চলে গেল। সেই প্রচণ্ড অবজ্ঞা একটা প্রবল আঘাত হয়ে আমার বুকে এসে পড়ল। আমার পা দুটো কাঁপতে লাগল। আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। এমন করে কেউ আমাকে কখনো অপমান করেনি। আমার কাঁদতে ইচ্ছে হল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলুম। ভাবলুম ফেরার পথে আর একবার তাকে ডাকব। কেন, তার কি হয়েছে, সে কথা যে আমার শোনা দরকার! শবরী ফিরতে আমি তাকে আবার ডাকলুম: শবরী!

এবার সে থামল।

আমার বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগল। আমি কম্পিত কণ্ঠে বললুম: আমি কি অন্যায় করেছি?

শবরী খুব আস্তে আস্তে বলল: কাল খুব ভোরে তুমি জবাগাছের আড়ালে দাঁড়িও, আমি আসব।

এইটুকু বলে সে হন্ হন্ করে চলে গেল।

আমি সেই রহস্যকে বিন্দুমাত্র আবিষ্কার করতে না পেরে সম্পূর্ণ হতবাক হয়ে গেলুম।

সেই রহস্যের দোলায় আমার অতীত কোথায় হারিয়ে গেল। ডুবল প্রিয়দর্শিনী, কুন্দ, সব। আমি বর্তমানের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হতে লাগলুম।

রাত্রিতে আমার ভাল করে ঘুম হল না। যদি নিদ্রার সুযোগ নিয়ে হঠাৎ সেই স্বর্ণমুহূর্ত পার হয়ে যায়? আমি সারা রাত কত কথা ভাবলুম। শবরী আমার কাছে কত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। একটুক্ষণ তার কাছে বসে কথা বলতে পারাই যেন আমার জীবনের চরম সার্থকতা।

এমন গোপনে লুকিয়ে প্রিয়দর্শিনী বা কুন্দের সঙ্গে আমাকে তো কখনো মিশতে হয়নি—তাই এ আকর্ষণ হল আরো দুর্বার। আপন মনে চলছিলুম হঠাৎ বাধা দিয়ে যেন শবরী আমাকে উন্মাদ করে তুলেছে। এই বাঁধা অতিক্রম করে প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে না পড়তে পেলে যে আমার শান্তি নেই!

আমি আমার চেতনাকে কিছুতেই ঘুমের কোলে সে রাতে ছেড়ে দিলুম না। উৎকর্ণ হয়ে থাকলুম শুধু অন্ধকার ভেদ করে বাঁশ ঝাড়ের মাথায় কখন কাক চিৎকার করে সেই জন্য। তার প্রথম ডাকেই আমি উঠে পড়ব। সেই সঙ্কেত।

এমনি সব পাগল কল্পনায় ভাবতে ভাবতে রাত কাটালুম। এমন সময় কাকের চিৎকার কানে এলো কি না এলো উঠে পড়লুম। অন্ধকার তখনো কাটেনি। আমি জবা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালুম। আমার নিজের হৃদস্পন্দন নিজেই শুনতে লাগলুম। আর প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করতে লাগলুম 'এই বুঝি শবরী এল' এই ভেবে।

একটি মুহূর্ত আমার কাছে তখন ছিল যেন একটি বছর। শবরী আসছে না। আমি অধৈর্য হচ্ছি। সময় যাচ্ছে, কাকেরা আরো বেশী চিৎকার করছে। আমি ভাবলুম আর শবরী আসবে না। আমাকে কোন মতে এড়িয়ে যাবার জন্য মিথ্যে স্তোক দিয়েছে। আমি হতাশ হতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ পাতলা অন্ধকারের মধ্যে কাকে আসতে দেখলুম। আমার হৃদপিণ্ড দুলে উঠল—নিশ্চয়ই শবরী আসছে। কি রহস্য তার কাছে আছে যা এই শেষ নিশীথে সে আমার কাছে বলবে? কত বড় যন্ত্রণা, কত বড় রোমাঞ্চ আমার তখন। আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়, সে শবরীই।

আমার অত্যন্ত কাছে এল সে। ভয়ে সে হাঁফাচ্ছিল তখন। আমি সাগ্রহে ফিস্ ফিস্ করে বললুম: কি শবরী?

শবরী বলল: ওরা দেখে ফেলেছে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলি।

—তাই বুঝি কিছু বলেছে?

—হ্যাঁ।

—কি?

—আমার মা বাবার নামে শপথ করিয়েছে, দেবতার নামে শপথ করিয়েছে, আমি যেন আর তোমার সঙ্গে না মিশি।

শবরীর চোখ বুঝি তখন ছল্ ছল্ করছিল।

আমার মনে হল আমি চিৎকার করে বলি: কেন, কেন, কি

অন্যায় করেছি আমি! মন না চাইলে শপথের মূল্য কি? শবরী তুমি শপথ মেনো না।

কিন্তু কিছু বলতে পারলুম না। শুধু চুপ্ করে থাকলুম।

শবরী বলল: জান, কাল সারা রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। কাক না ডাকতেই উঠে বসেছি। মা আমাকে সারা রাত লক্ষ্য করেছেন। বলেছেন: তোর অসুখ করেছে? আমি বলেছি: হ্যাঁ। বল, মা কি বুঝবে আমার যন্ত্রণা!

আমি আর শুয়ে থাকতে পারিনি। কাক ডাকবার আগে উঠে উঠানে গোবর জলের ছিঁটে দিয়েছি। গাভীর জন্য জাবনা কেটেছি। তারপর এক ফাঁকে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি। মা জানে না।

হঠাৎ শবরী আমার হাত দুটো চেপে ধরল: তোমায় একটা কথা বলব?

আমি নিষ্প্রাণের মত বললুম: বল।

শবরী কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল: আমায় কথা দাও, তুমি আর কখনো আমাকে দেখা দেবে না?

আমি কোন কথা বলতে পারলুম না।

শবরী আমার হাত দুটো ঝেঁকে দিয়ে বলল: বল। তোমাকে দেখলে যে আমি কিছুতেই স্থির থাকতে পারব না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হবে। বল, বল, তুমি আর কখনো আমার সঙ্গে দেখা করবে না! শবরীর উদ্যত আঁখি-কোণ থেকে ঝর্ ঝর্ করে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু আমার হাতের উপর ঝরে পড়ল।

আমার চোখ দুটো ভিজে উঠল। আমি ধীরে ধীরে বললুম: শবরী আমি তোমায় কথা দিলুম।

শবরী আমার হাত দুটো তার কপালে ঠেকালো, তার ওষ্ঠে স্পর্শ করালো, তারপর পাগলের মত দৌড়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

আমি কিছুকাল দাঁড়িয়ে থাকলুম। আমার যেন কোন চেতনা থাকল না।

তারপর এক সময় আকাশের দিকে নজর পড়তে দেখলুম—দিগন্তের অন্তরাল থেকে সূর্যরশ্মী আকাশকে আঘাত হেনেছে। এখনি সূর্য

হেসে উঠবে, দিনের আলোতে সব স্পষ্ট দেখা যাবে। না, শবরীকে আমি কথা দিয়েছি, সে কথা রাখতে হবে। আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেললুম। শুনেছি পশ্চিমে হাটলে মহানগরী গৌড়। আমি দ্রুত সূর্যের বিপরীত দিকে হাটতে লাগলুম।

গল্পের শেষে হঠাৎ এত দ্রুত করুণ রাগিণী বেজে উঠল যে, শ্রোতারা প্রস্তুত হবার আগেই একটা বিমর্ষ-ছায়া তাদের যেন হতবাক করে দিল। মুখে তো দূরস্থান—মন থেকেও তারা কিছু বলতে পারল না। গল্প শেষ হলে শুধু বুকের মধ্যে যে সাগ্রহ-নিঃশ্বাসটাকে তারা আটকে রেখেছিল—তাকে সবাই প্রায় একসঙ্গে ছেড়ে ছিল। সমবেত সেই দীর্ঘশ্বাস, একটা বিশাল মানুষের হৃদপিণ্ড ভেঙে বেরুল বলে মনে হল।

যেন নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে হঠাৎ হাওয়া দিয়ে বৃক্ষের পাতা নড়ল। শ্রোতারা একে.অপরের মুখের দিকে তাকাল। তৃপ্ত নয়, কেউ তারা তৃপ্ত নয়! এমনি নিষ্ঠুরতম দুঃখের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আসবেন? তাহলে থাক. থাক ঈশ্বর। এর চেয়ে তাদের সাধারণ জীবনের যন্ত্রণা অনেক ভাল।

কারো কারো মনে হল—উঠে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বলে বক্তাকে: তোমার গল্প রাখ। ঈশ্বরে আমাদের প্রয়োজন নেই। তোমার ঈশ্বর থাক। তাই বলে তোমাকে আমরা ভণ্ড বা প্রতারক বলব না। তুমি সৎ মানুষ, তুমি বঞ্চিতহৃদয়। তুমি আমাদেরই একজন। এসো, তুমি আমাদেরই কাছে থাক।

কিন্তু কোন কথা বলা গেল না। এই বক্তা তাদের নিতান্ত অনুকম্পার পাত্র। তাকে নীরবে-নিভৃতে নিজেকে গুছিয়ে নেবার অবসর দিতে হবে। তাই একান্ত নিঃশব্দে তারা একের পর এক উঠে গেল।

শুধু আজ সবার শেষে উঠল সেই কালো মেয়েটি। ওরা তখন অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। সে বক্তার অত্যন্ত কাছে এগিয়ে এসে বলল: তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছ গো! কিন্তু দুঃখ করো না, সবাই তোমাকে বঞ্চিত করবে না।

হাসলেন শুধু বক্তা। সে হাসির কী যে অর্থ, সেই কালো মেয়েটি বুঝল কি?

আট

এর পর আর গল্প থাকতে পারে লোকের বিশ্বাস হল না।

এর পর জীবনের গতি আর কোন্ নতুন দিক্ নিতে পারে? বক্তা বলেছেন—তিনি নাকি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ঈশ্বর তাহলে কেমন? কোন্ পথে, কি ভাবে এর পরও তিনি করুণা করতে পারেন? লোকেরা কিছু ভেবে পেল না। তারা ভাবল, আর গল্প নেই। অথচ বক্তা তাদের কাছে, মন্দিরের বারান্দায় বসে আছেন। সন্ধ্যার প্রদীপের আলোতে আবার হয়তো তিনি মুখ খুলবেন। গল্প যদি নতুন দিক নেয়—সেটাও হৃদয়ের কাছে খুব প্রিয় হবে বলে বোধ হল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি যেন বিরাট এক আকর্ষণ আছে। সেই দুর্নিবার টান সবাইকে সন্ধ্যা সমাগত হতেই মন্দির প্রাঙ্গণে টানল। নিজের অজ্ঞাত-সারেই সবাই যেন একে একে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। সবাই একটা করুণার্দ্র দৃষ্টিতে বক্তার দিকে তাকাল: নেই, আর কিছু বলবার নেই।

কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু সেই বক্তা মুখ খুললেন।

সকলে গভীর আগ্রহে সেই মুখের দিকে তাকাল: তিনি আর কি বলবেন?

বক্তা বলতে আরম্ভ করলেন: আমি আবার পথে বেরুলাম। ছুটলাম গৌড় লক্ষ্য করে। কিন্তু মনের মধ্যে যে তখন কি উদ্দেশ্য, তা আমি নিজেই ভাল করে জানলুম না।

কুন্দকে হারিয়ে একটা তীব্র আক্রোশে ছুটে বেরিয়েছিলুম—মানব না ভাগ্যকে। নিজের ভাগ্য নিজে প্রতিষ্ঠিত করব। ঈশ্বরের উপর হয়েছিল সবচেয়ে বেশী আক্রোশ, তাঁকে আমি অভিশাপ দিয়েছিলুম। তাঁকে অস্বীকার করেছিলুম। কিন্তু এবার আর আমার মনে তেমন কোন ক্ষোভের সঞ্চার হল না।

সমাজকে নয়, ঈশ্বরকে নয়, কাউকেই দোষ দিলুম না। এ বেদনাকে যেন সহ্যের অতীত বলে মনে হল না আমার কাছে। কেন?

আঘাতে আঘাতে আঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা আমার মধ্যে এসে গিয়েছিল। তাই? সে কারণটা নিশ্চয়ই অনেকটা কাজ করে থাকবে। কিন্তু শুধু মাত্র তাই নয়, আমি অন্য কথা ভাবলুম। আমি দূরে চলে যাচ্ছি বটে, কিন্তু শুধু শূন্যতার বঞ্চনা নিয়েই যাচ্ছি কি? আমি কি কিছুই পাইনি? আমার হৃদয় যা আকাঙ্ক্ষা করেছিল, যার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে বসেছিল—তার কি কিছুই পায়নি?

একটি সজ্ঞান মন সচেতন ভাবে আমাকে ভালবেসেছে। ভালবাসার চেয়ে বড় আর কি আছে? আমি তো তা পেয়েছি! শুধু একটা দেহ পাইনি বলে ক্ষোভ? দেহের কথা যেন তখন আমার মনেই এল না। আমার মনের মধ্যে একটা পুলক অনুভব করলুম: আমি পেয়েছি। বিরাট তৃপ্তি আমাকে যেন পূর্ণ করে দিল। আমার ব্যথা লাগল না। যন্ত্রণা হল না। ভাল লাগল শুধু। অশ্রু আমার ঝরল নিশ্চয়ই কিন্তু সেই অশ্রুর মধ্যে একটা মধুর সিক্ততার স্পর্শ অনুভব করলুম। আমার হৃদয় বঞ্চিত, আশ্রয় চাই, নইলে বাঁচবো না, এমন আর্ত হাহাকার আর আমার মধ্যে আমি অনুভব করলুম না। একটা কান্নার আবেগ আমার মধ্যে থাকল সত্য, কিন্তু তার মধ্যে যন্ত্রণার ছোঁয়াচ আর নেই।

আমার মনে হল এবার আমি পারি, এবার আমি একা চলতে পারি। কিছু না পেলেও যা পেয়েছি তার স্পর্শ আমাকে পূর্ণ করে রাখবে।

তাই চললুম প্রায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে। ভয়-ভাবনা তত থাকল না। এবার শুধু দায়িত্ব আমার নিজেকে চালাবার। সে কোন রকমে চলবে। জীবনে একটা রঙিন স্বপ্ন, সেই স্বপ্ন কারো মধ্যে আরোপ করে আমার এক নিজস্ব পৃথিবীতে আমি বাস করব সে ভাবনা আমার মনে এল না। কাউকে ছাড়া বাস করতে বিন্দুমাত্র আর আমার যন্ত্রণা নেই। মনে হল যদি কেউ দ্বিতীয় হয়ে বাইরে থাকে সে আজ অদ্বিতীয় হয়ে আমার মধ্যে মিশে গিয়েছে।

বহুদিন পরে এই আঘাতকে আর আঘাত বলে আমার মনে হল না। আমি চললুম। আমার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আমি হাটতে লাগলুম গৌড়ের পথে।

আর ব্যাকুল আবেগের তাড়নায়, পাগলের মত আমি হাটলুম না। দিনের শেষে সন্ধ্যা নামতে আমি এক গাঁয়ে গিয়ে উঠলুম। আমার দেশের মানুষকে আমি ততক্ষণ চিনে ফেলেছি। না, না, সংস্কারের দাস হলেও তারা অতিথিপরায়ণ।

পথিমধ্যে কোথাও আশ্রয় চাইলে সে আশ্রয় পাওয়া যাবে আমি জানি। তাই নির্ভাবনায় গিয়ে গ্রামের এক গৃহস্থের কাছে আশ্রয় চাইলুম।

অতিথিকে দেবতা বলে লোকেরা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ অতিথি হলে তো কথাই নেই। আমাকে গাঁয়ের লোকেরা আশ্রয় দিল।

কি আশ্চর্য! একবার তারা শুধালো না, আমি কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাচ্ছি। অভিজ্ঞতা বুঝি আমাকে অনেকটা বড় করে তুলেছে। দেহে অনেকটা বড় হয়েছি। শুধু দেহে নয়, মনেও আমি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের।

রাত্রিটা অতিথি হয়ে গ্রামে কাটালুম। তার পরদিন আবার হাটতে লাগলুম। মানুষ দেখলেই শুধাতাম: গৌড় কতদূর?

তারা বলত: হাঁট, দিনে দিনেই পৌছে যাবে।

আমি হাঁটতে লাগলুম—তত ব্যস্ততা নেই, তাড়া নেই আর।

স্মৃতির ভারে ক্লান্ত হয়ে যাত্রার মধ্য দিয়ে শবরীর কথা ভেবে ভেবে চললুম না আমি। মাঝে মাঝে যখন তার কথা মনে হতে লাগল—একটা সিক্ত মধুর অনুভব আমার মধ্যে আসতে লাগল। মনে হল আমি পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ। যা পেয়েছি, তার তুলনা নেই। নিশি শেষের সেই পাতলা অন্ধকারে আমার হাতের উপর শবরীর চোখের জল—অশ্রু নয়, এক এক বিন্দু মহামূল্যবান সঞ্চয়। সেই সঞ্চয়ের উপর আমার জীবন চলবে।

ঠিক সন্ধ্যায় আমি গৌড় মহানগরীর দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তাকিয়ে দেখলুম—স্বর্ণশিখর প্রাসাদগুলো উর্ধ্বে উঠে গিয়েছে। গৌড়কে বলা হয় মসজিদের নগরী—শত শত মসজিদের গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। স্রোতের মত লোক ভিতরে ঢুকছে, বাইরে আসছে। চলছে অশ্বারোহী, শকটারোহী, সুলতানী ফৌজ, বণিক, আমীর-ওমহারগণ এবং আরও কতজনে।

বাইরে দাঁড়িয়ে আমি সেই বিলাসের ছবি তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দেখলুম। এতক্ষণে একটুখানি চিন্তা করলুম আমি। ভাবলুম, মহা-নগরীতে প্রবেশ করব কিনা।

কৃত্রিম জীবনের প্রতি আমার আকর্ষণ কম। আমার স্বভাব থেকেই সেই জীবনের প্রতি কোন প্রকার আকর্ষণ আমি অনুভব করি না। তাই ভাবলুম—থাক, মহানগরীতে আর প্রবেশ করব না। কিন্তু আশ্রয় চাই, কোথায় আশ্রয় পাই!

ততক্ষণ সূর্য গৌড়ের প্রাসাদগুলোর আড়ালে ডুবে গিয়েছে।

আমি গৌড়ের দরওয়াজা থেকে মুখ ফিরিয়ে পাশেই জনবহুল নগরীর উপকণ্ঠের বস্তীগুলোর দিকে তাকালুম। খুব বেশী দূর নয়—আমি সেদিকেই এগোলুম। বস্তীর প্রথমেই যে ঘর আমার নজরে পঁড়ল, তার দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেই ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিল একজন রমণী। আমি তাকে গিয়ে বললুম: আমি অতিথি।

সেই রমণীটি দীর্ঘ, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। মুখ চোখের গড়ন সুন্দর। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।

আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর একটু হাসল: তুমি কেমন অতিথি?

আমি বললুম: আমি অতিথি। রাত্রির জন্য আশ্রয় চাঁই।

সেই রমণীটি আমার দিকে তাকিয়ে আবার হাসল। বলল: আমি বুঝতে পার্চ্ছি তুমি ব্রাহ্মণ। এবং আমাদের এখানে যে অতিথি আসেন তুমি সেরকম অতিথি নও। কিন্তু তুমি আমার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করবে কি?

আমি বললুম: কেন করব না। যে আশ্রয় দেবে আমি তার-ই ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করব।

রমণীটি বলল: আমি জাতে মুসলমান।

জাতের প্রশ্ন তখন আর আমার মনে নেই। মানুষ—মানুষ, এইটুকুই তখন আমার মনে ধারণা জন্মে গেছে। যার বুকের মধ্যে অন্তর আছে, মানুষকে যে ভালবাসে, মানুষকে সে সমবেদনা দিয়ে বিচার করে সেই মানুষ। সে জাতির চেয়ে বড়। শবরী শূদ্র রমণী। কিন্তু তার বুকের

মধ্য থেকে আমি যা পেয়েছি তা অকৃত্রিম মানুষের হৃদয়। সমস্ত পাপ মলিনতার উর্ধ্বে সে ভালবাসা। আমি বললুম: আমি জাত বিচার করিনে।

অবাক হয়ে সেই মুসলমান রমণীটি আমার দিকে তাকাল: কি বলছ তুমি! হিন্দুরা শুনলে তোমাকে একঘরে করবে!

আমি হেসে বললুম: আমার ঘর নেই, আমাকে একঘরে করবে কোথায়? একটা মমতা মাখানো কৌতূহলের দৃষ্টি তুলে সে আমার দিকে তাকাল: কি বলছ তুমি! তোমার কে আছে?

আমি বললুম: আমার কেউ নেই। এই বিশ্ব পৃথিবীতে যে আমাকে আশ্রয় দেয় আমি তার।

হাসল সেই রমণী মূর্তি: তুমি দেখি বেয়ারা ব্রাহ্মণ। তবে শোন, আমার আরো পরিচয় আছে।

--বলুন।

—আমি বারবণিতা।

মানুষ কে কি, তা জানবার আর আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই।

মানুষের বর্ণ যাই হোক, ধর্ম যাই হোক, ব্যবসা যাই হোক, তার অন্তরে যদি স্নেহ থাকে, দয়া থাকে, মায়া থাকে, ভালবাসা থাকে, তবে সে-ই মানুষ। আমি বললুম: ব্যবসা—জীবিকা। আমি ওতে কিছু মনে করি না।

রমণীটি কিছুকাল অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল: আশ্চর্য মানুষ তুমি। সত্যি আশ্চর্য। এমন আর দেখিনি। ভাল, তুমি আশ্রয় গ্রহণ কর। আমার এখানে থাকবার স্থানের অভাব হবে না। সে চিৎকার করে কার নাম ধরে ডাকল: আমীনা, আমীনা।

—যাই আম্মা, বলে একটি ছিপ্‌ছিপে গড়নের মেয়ে বেরিয়ে এল। রং কালো। উজ্জ্বল চোখ। আমার মত লোককে বোধ হয় সে ইতিপূর্বে দেখেনি। সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

সেই মহিলাটি বলল: একে ঘরে নিয়ে যাও। তোমার ওস্তাদজী

যে ঘরে তোমাকে গান শেখান সেই ঘরে একে বসতে দাও। এ আমাদের অতিথি।

আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল: যাও ঘরে যাও।

আমীনা তখনো অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি তার পেছনে পেছনে গিয়ে তার গানের ঘরে উপস্থিত হলুম।

আমায় দেখে অবাক হয়েছে বটে আমীনা কিন্তু অপ্রস্তুত হবার মেয়ে সে নয়। নিত্য বহু মানুষের সঙ্গে ওদের পরিচয়।

আমীনা আমার দিকে তাকিয়ে বলল: আপনি বুঝি আমার নতুন ওস্তাদজী?

আমি হেসে বললুম: কেন, তোমার পুরানো ওস্তাদজীর কি হল?

আমীনা বলল: ওস্তাদসাব্ চলে গেছেন। তিনি আর আমায় গান শেখাবেন না।

আমি বললুম: কিন্তু আমি তো গান জানি না। আমি একজন ক্লান্ত পথিক, তোমাদের এখানে এসেছি রাত্রির আশ্রয়ের জন্য।

আমীনার বিশ্বাস হল না। সে ছুটে চলে গেল বাইরে মায়ের কাছে। কি জিজ্ঞেস করল সে-ই জানে। ঘরে এসে আরো কৌতূহলের দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকাল: আপনি ব্রাহ্মণ?

আমি হেসে বললুম: আমি মানুষ।

এমন কথা আমীনা শোনেনি! এ কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে দেখতে সে রাজী নয়। বয়েস তার কত? শবরীর চেয়ে ছোট নিশ্চয়ই। ভাল করে বাদবিসম্বাদে যাবার ক্ষমতাও নেই তার। মা তাকে যা বলে দিয়েছিল তাই সে আমাকে বলল: আপনি নিজে হাতে রেঁধে খাবেন?

হেসে বললুম: কে বলল?

আমীনা বলল: আম্মা আমাকে তাই জিজ্ঞেস করতে বলেছেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলুম, বারবণিতা, মুসলমান হয়েও সে এই বর্ণভেদের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি কেন? আমি আমীনাকে বললুম: না। তোমাদের জন্য যা রান্না হবে, আমি তাই খাব।

তা শুনে আমীনা কেন যেন অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমি বললুম : তুমি অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ ?

সে হঠাৎ লজ্জা পেল, চোখ নামিয়ে নিল।

আমি ভাবলুম আমার মত এমন দরিদ্র, সাধারণ মানুষ ও কখনো দেখেনি, তাই আমাকে দেখে অবাক হচ্ছে। ওদের যে জগৎ সে জগতে শান্তশিষ্ট, আমার মত দরিদ্র মানুষের ঠাঁই নেই। এখানে যারা আসে, তারা উগ্র, মদ্যপ, যৌবনের নেশায় উন্মাদ। আমার মত সামান্য একজন ব্রাহ্মণের সন্তান জীবনের সুখ যাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করেছে, যে কেঁদেছে ; কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়েছে, ক্লান্ত হয়ে দুঃখ বোধটাকে পর্যন্ত অনেকটা হারিয়েছে, তার মত লোক আমীনাদের ঘরে কখনো আসে না। যারা আসে সবাই যে জীবনের প্রসাদে পুষ্ট তা নয়। জীবনে ভালবাসার অসীম হাতছানীতে যারা মুগ্ধ তারা এখানে আসবে কেন ? যারা বঞ্চিত, তারাই আসে, আর আসে ভালবাসা যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র উঁকি দেয়নি তারা, যারা জীবনটাকে দেহের রস পানের মধ্যেই সার্থক মনে করেছে তারা। ভালবাসার রহস্যময় ইঙ্গিতে নদীর তরঙ্গের মত যে নেচেছে, তারপর সাগরের কাছে মোহনার মুখে এসে সে স্থিরতর হয়েছে সেই আমার মত কোন ব্যক্তি এখানে আসে না। দেহটাকে সর্বস্ব করে কিছুতেই তো দেখতে পারিনি আমি, শুধু খুঁজেছি দেহের অভ্যন্তরে সেই মন।

সে মন আপন আবেগে নিজেকে সমর্পণ না করলে প্রেমের আহ্বানের কাছে সেই মনের অধিকারী দেহের অর্থ কি ? কারো কাছে সে দেহের যদি অর্থ থাকেও আমার কাছে তার অর্থ বিন্দুমাত্র নেই। আর এই আমি ভালবাসায় বঞ্চিত হয়ে উন্মাদের মত ছুটেছি ভালবাসারই সন্ধানে। অপরের উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একটি দেহকেই চরম উদ্দেশ্য বলে কখনো ভাবিনি। সেই আমি, এ জগতে আমি সম্পূর্ণ অভিনব। আমার দৃষ্টিতে নেই সে ইঙ্গিত। আমার বাক্যে নেই তার প্রকাশ। আমীনা তাই আশ্চর্য হয়েছে। অনাড়ম্বর অন্ধকারের মত শান্ত বেদনাক্লিষ্ট মানুষ সে কখনো দেখেনি বোধ হয়।

আমি আমীনার ঘরের দিকে তাকালুম। সারেঙি সেতার তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এবং এক পাশে নাচের ঘুঙুর রয়েছে। আমি বুঝলুম, আমীনা গান শেখে, নাচে। তার দিকে তাকালুম। তার উজ্জ্বল অথচ কৃশ দেহ! জীবনের পথে আমার যাদের সঙ্গে পরিচয় হল সে তাদের চেয়ে চঞ্চল নিঃসন্দেহে।

এখনো জীবনের দুয়ারে যে এসে পৌছোয় নি, জীবনের উদ্দেশ্যকে সে কেমন করে গ্রহণ করেছে? আমার নিজের জীবনের সেই মধুর সিক্ত পরশগুলির কথা সব ভাবলুম। আজ যেন সে সব চিন্তা করতে আমার মনে বৃশ্চিকদংশন নেই। আমি যে জিনিষ পেতে চেয়েছিলুম, যা অবচেতন মনের কাছ থেকে পেয়ে তৃপ্ত হইনি, সচেতন মনের নিঃশেষ নিবেদন তা আমাকে পূর্ণ করে দিয়েছে। সেই সব মধুর স্নিগ্ধ স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। আমীনা কি কখনো সে জীবনের স্বাদ পেয়েছে?

জীবনের পথ সবার এক নয়! ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকে সেই পথ দিয়ে একটি পরম চেতনার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। কুন্দকে হারিয়ে অন্ধ আক্রোশে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলুম। শবরীকে হারিয়ে তত যন্ত্রণা পেলুম না, ঈশ্বরকে দোষারোপ করলুম না। ঈশ্বরকে ঠেলে সম্পূর্ণভাবে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে হল না। চেতনাকে তরঙ্গিত করে দেবার মত বিরাট প্রসাদ আমি পেয়েছি। তাই বলে ঈশ্বরকেই সম্পূর্ণ ধন্যবাদ আমি জানালুম তা নয়!

ভাবলুম, আমি যে জীবনের স্বাদ পেয়েছি আমীনা তা পায়নি। আমাকে যে জীবন মুগ্ধ করেছিল রাজমহল পাহাড়ের কোল থেকে, সে জীবন অন্তরের; স্নিগ্ধ ভালবাসার আকাঙ্ক্ষায় সে ছিল ভিখারী। আমীনা কি চায়? কৌতূহল হল, মনে হল জিজ্ঞাসা করি আমীনার জীবনের ভাললাগা জিনিষটা কি?

আমি বললুম: তোমার নাম আমীনা?

—জী জনাব, আমীনা আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাল। সে দৃষ্টির অর্থ, আমি কি করে জানি সে নাম।

আমি বললুম: তোমার আম্মাজান তোমাকে ডাকছিলেন। আমি শুনেছি; তাতেই বুঝেছি, তোমার নাম আমীনা।

সে বলল : আপনি ঠিক ধরেছেন।

—গান তোমার ভাল লাগে ?

—গান কার না ভাল লাগে জনাব বলুন ?

—তুমি বোধ হয় নাচ-ও ?

—হ্যাঁ।

আমার মনে হল জিজ্ঞেস করি : এই নাচ আর গান কার জন্য ? বহুজনের জন্য ? না একটি মাত্র হৃদয়ের জন্য ? চোখের জন্য না মনের জন্য ?

কিন্তু সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আমার অনুচিত ; আমার অধিকারের বাইরেও। সুতরাং আমি আর সে প্রশ্ন করলুম না।

আমীনা বোধ হয় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখছিল। আমার মনের অনেকটা ছায়া বোধ হয় সেখানে পড়েছে।

সে বলল : আপনি গান ভালবাসেন না ?

আমি বললুম : ভালবাসি। খুব ভালবাসি। কিন্তু কোথায় শুনব বল ! আমি দরিদ্রের সন্তান। তাই মানুষের কণ্ঠের গান আমার শোনা হয় না, আমি শুনি পাখীর গান।

এমন কথা আমীনার সঙ্গে বুঝি কেউ বলেনি। তাই আমীনা কৌতুক অনুভব করল। শুধালো : আপনি গৌড়ে যাবেন বুঝি ?

আমি বললুম : গৌড়ে যাব বলে এসেছিলুম। কিন্তু এখন দুর্গ-প্রাকারের মধ্যে মহানগরী গৌড়কে দেখে আমার আর সেখানে যেতে ইচ্ছে করছে না।

—তবে কোথায় যাবেন ?

—জানি না।

দুটো বিস্ফারিত চোখে আমীনা তাকাল আমার দিকে। সে চোখে গভীর বিস্ময়। উদ্দেশ্যহীন ভাবে কোন মানুষ ঘুরে বেড়ায় নাকি !

আমি তা বুঝে মনে মনে ভাবলুম : জীবনের উদ্দেশ্যকে বেদনার যন্ত্রণাতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত দু-দুটো চোখের জলের মধ্যে যে পেয়েছে, তার আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে জীবনে ? তার আর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

আমীনা আমায় শুধালো : আপনি আসছেন কোথা থেকে ?

আমি বললুম : এর আগে যেখানে ছিলুম ?

এমন উত্তর লোকে দেয় নাকি ? আমীনা ভাবতে পারেনি। সে বিরাট কৌতূহল বোধ করল। বলল : আপনার কে আছেন ?

আমি বললুম : কেউ নেই !

এ সংসারে অর্ধবঞ্চিত আমীনা নিশ্চয়ই। তবু তার কিছু আছে।

তবু সে যা পেয়েছে তার চেয়ে বড় কিছু আর তার কাছে নেই। তা হল মাতৃস্নেহ। সেই স্নেহের সিংহাসনের উপর বসে 'কেউ না থাকা' কোন মানুষের কথা সে ভাবতেই পারে না। তাই আরো কৌতূহলী দৃষ্টি তুলে সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। হয়তো সে ভাবতে লাগল, আমি কে ? কোত্থেকে এসেছি ? যদি কেউ না থাকে তবে আমি কোথায় থাকব ?

সে ভাবনা তখন আমার মনে নেই। কাল ভাবব।

হঠাৎ আমীনা আমায় বলল : গান শুনবেন ?

আমি ওর দিকে তাকালুম। বললুম : আমি অতিথি হয়ে এমনিই তোমাদের বিরক্ত করছি। তার উপর আবার কষ্ট করে গান শোনাবে ?

আমীনা বলল : কষ্ট দিচ্ছেন কে বলল ? আমার খুব ভাল লাগছে।

—কেন ?

আমীনা বলল : আমি এমন প্রাণ খুলে তো কারো সঙ্গে কথা বলতে পারি না। আর যারা আসে তারা···। আর কথাটা শেষ করল না সে।

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললুম : তারা কি ?

মাথাটা নীচু করে নিল আমীনা : নোংরা কথা বলে।

সেই নোংরা কথাটা কি তা বুঝতে আমার মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হল না।

আমীনার দিকে তাকিয়ে ব্যথা বোধ হল। আমার মনে হল, আমীনার বুকের অভ্যন্তরে মনটাকে আমি ধরে ফেলেছি। আমারই মত তার মনেও সেই আশ্রয়েরই প্রত্যাশা। অথচ এমন সমাজে সে বাস করে, যেখানে মনের নিভৃত কথা বলবার মানুষের নিতান্ত অভাব।

তাদের উদ্দেশ্য নোংরা, দৃষ্টি নোংরা। অথচ এই নোংরামীকে সহ্য করতে হবে আমীনার মত নিষ্পাপ মেয়েকেও। এখনো নিশ্চয়ই তাকে পাপের পথে টেনে নামানো হয়নি।

আমাকে যেন একটি মনের মত শ্রোতা পেয়েছে আমীনা। আমাকে একটা গান শোনাতে পারলে যেন তার তৃপ্তি। সে বলল: শুনবেন গান?

আমি বললুম: গাও, যদি তোমার আম্মাজান কিছু না মনে করেন।

আমীনা বলল: আম্মাজান কিছু মনে করেন না। আমি রোজ এমন সময় গান করি।

আমি বললুম: গাও তবে।

আমীনা কোন্ গানটা গাইবে ভাবতে লাগল।

হঠাৎ আমার মনে হল সান্ত্বনার গান কি নেই তার কাছে? এমন গান, যে গান জীবনে দিতে পারে একটা তৃপ্তির স্নিগ্ধ স্পর্শ? আমি বললুম: খুব ভাল গান গাইবে।

—কি গান?

আপন অজ্ঞাতসারেই আমি বলে ফেললুম: যে গানে ঈশ্বরের কথা আছে।

আমীনা বলল: তাহলে কবীরের দোঁহা, কবীরের দোঁহা গাই, আমি জানি।

আমি বললুম: গাও।

বীণার তারে আঙ্গুল চালিয়ে যেন ধ্যানমগ্ন নেত্রে আমীনা কবীরের দোঁহা স্মরণ করতে লাগল। তারপর তারে একটা সুরের ঝঙ্কার তুলল। অদ্ভুত তার মিষ্টি সুর। সেই সুরে হৃদয়ের আবেগ মিশিয়ে দিয়ে যেন সে গাইল।

গানের মধ্যে আমীনার যেন এক নতুন রূপ। আমি ভাবলুম: কোকিল কালো হলেও প্রিয় তার কণ্ঠের জন্য। আমীনা কোকিলের মত।

আমার হৃদয়ের গভীরে কোথায় যেন দোঁহার বক্তব্যের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য ছিল। গান শুনতে শুনতে আমার মনে হল, আমারই হৃদয়

বাইরে এসে সুরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আশ্রয় খুঁজছে। সেই সুরে আমার হৃদয়ে এমন আবেশের সঞ্চার করল যে, আমার স্নেহ-কাঙাল হৃদয় তা শুনে কেঁদে ফেলল। গান তখন আমীনার শেষ হয়েছে। আমার চোখে জল দেখে সে হতবাক হয়ে গেল।

বীণাটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে সে বলল: আপনি কাঁদছেন জনাব? কেন?

আমি বললুম: কেন, তা জানি না আমীনা। ঐ সুর শুনে আমার চোখে জল আসছে।

আমীনা অনেকক্ষণ আমাকে তাকিয়ে দেখল। বলল: জানেন, আমার ওস্তাদজী আমায় বলেছিলেন: এই ভজন শোনাবার সময়, যদি দেখ কোন শ্রোতার চোখে ভজন শুনে অশ্রু ঝরে, তবে জানবে সে আল্লাতালার অনুগৃহীত ব্যক্তি।

আমি ভাবলুম: কবীরের মনে গভীর বিশ্বাস এল কোথেকে? জীবন থেকেই তো? জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি আল্লাতালার সন্ধান পেয়েছিলেন। হয়তো ঈশ্বর আছেন, যে ঈশ্বর আছেন, আমার তাঁর উপর আর অভিমান নেই। আমার জীবনে যে বেদনা একদিন আমার কাছে যন্ত্রনার মত মনে হত, আজ তাকে স্নিগ্ধ মনে হয়। ঈশ্বরের উপর আক্রোশ নয়, অশ্রুসজল অভিমান বোধ করি। হে ঈশ্বর তুমি যদি থাক…। মনে মনে আমি যেন কি চাইতে গেলুম। কিন্তু কি চাইবো, ভাবতে না পেরে চাইলুম না।

কবীরের দোঁহা তখনো আমার কানে বাজছে: তিনিই চালাচ্ছেন, তিনিই চালাচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করবেন। ভয় কি?

আমার মধ্য দিয়ে কি ইচ্ছা তাঁর আছে? মনে মনে বললুম: পূর্ণ করো, প্রভু পূর্ণ করো, তোমার ইচ্ছা আমার মধ্য দিয়ে পূর্ণ করো তুমি।

শবরীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে চলে এসেছি, আর আমার কিছুই চাইবার নেই। ঈশ্বরের উপর আক্রোশ নেই, তবু কেন যেন আমার চোখ ঠেলে জল আসছে? আমি আবার কাঁদলুম।

আমীনা বলল: জনাব আপনি কাঁদছেন?

আমি বললুম: আর কাঁদব না, কিন্তু আমার চোখে কেন যেন জল আসছে।

আমীনা গাঢ় দৃষ্টিতে আমাকে তাকিয়ে দেখল। বলল: আপনি শিল্পী। আমার ওস্তাদজী এমন লোককেই শিল্পী বলেছেন।

আমীনা বলল: আপনি বিশ্রাম করুন। আমি আপনার খাবার নিয়ে আসছি। আপনি শ্রান্ত।

আমীনার গানের ঘরেই সুন্দর শয্যা পাতা ছিল। আমাকে সে সেখানেই বসিয়ে ছিল। আমীনা চলে গেলে আমি সেই শয্যায় নিজের দেহ এলিয়ে দিলুম। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।

এতদিন আক্রোশে কেঁদেছি। কান্নায় আমার যন্ত্রণার উপশম হয়নি। আজ ঈশ্বরের গুণগান শুনে অভিমানে কাঁদলুম—সমস্ত দেহে একটা স্নিগ্ধ স্বাদ অনুভব করলুম তার জন্য।

সেই একটা স্নিগ্ধ সিক্ততার মধ্যেই আমার তন্দ্রা এল। আমি সেই অস্পষ্ট চেতনার মধ্য দিয়ে—মধুর এক সঙ্গীত ঝঙ্কার শুনলুম। ধীরে ধীরে আমার চেতনায় তারা আঘাত করছে। আমার অবচেতন মন কল্পনা করে নিল, গন্ধর্বের দেশ।

সেই ভাবে হঠাৎ কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। এমন সময় কার স্পর্শ পেয়ে আমি জেগে উঠলুম। দেখলুম, আমীনা আমাকে ডাকছে। খাবার নিয়ে এসেছে সে? আমি উঠে বসলুম।

আমীনা নিজে হাতে আমার সামনে খাবারের থালা রাখল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম—ঠিক ব্রাহ্মণের খাবার। মাংস নেই। মাছ নেই। দুধ, রুটি, কলা।

ভাবলুম কিছু বলি। কিন্তু বললুম না।

ওধার থেকে মিষ্টি সুরের আওয়াজ অনবরত ভেসে আসছিল।

আমি আমীনার দিকে তাকালুম।

আমার সে তাকাবার অর্থ আমীনা বুঝতে পারল। কিন্তু সে যেন লজ্জা পেল। বলল: আমার আম্মাজান।

আমি বুঝি ভুলেই গিয়েছিলুম আমি কোথায়! হঠাৎ সব মনে

পড়ে গেল। কিন্তু ব্যথিত বা সঙ্কুচিত হলুম না। পরম তৃপ্তির সঙ্গে আমীনার দেওয়া সেই খাবার খেলুম।

আমার খাওয়া শেষে আমীনা উচ্ছিষ্ট পাত্র নিয়ে চলে গেল। বলে গেল : জনাব আপনি ক্লান্ত। এবার আপনি ঘুমোন।

মায়ের স্নেহ পেয়েছি ব্রাহ্মণীর কাছে, ভালবাসা পেয়েছি, কিন্তু স্ফুটনোন্মুখ কোন মেয়ের হাতে যত্ন পাইনি! আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু তখন ভাববার শক্তি ছিল না। স্নায়ুগুলো নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে চিন্তা করবার আগে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

রাত্রিতে ঘুম হল, গভীর ঘুম। সারা দিন ক্লান্তি গিয়েছে, অথচ মনের সেই ক্লান্তির মধ্যে আঘাতের যন্ত্রণা ছিল না ততটা, তাই নির্বিঘ্ন গভীর বিস্মৃতির মধ্যে রাতটা কাটিয়ে দিলুম আমি।

পরদিন ঘুম ভেঙে যখন উঠলুম—তখন আমার দেহে একটা স্বচ্ছ-নম্রতা। প্রথমটা হয় তো একটু ভুল করেছিলুম—আমি সেই গ্রামেই রয়েছি। উঠেই সবুজ খেজুর বৃক্ষের উন্নত শির পত্রাবলী দেখব। সেই পরিচিত কয়েকটা পাখীর কণ্ঠ শুনব।

কিন্তু হঠাৎ আমার দৃষ্টি আটকে গেল নতুন ঘরের জানালায়। এ আমার পরিচিত নয়। মুহূর্তে সেই নতুন গৃহের জানালা আমাকে নতুনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলল। সেই জানালার ফাঁকে বাইরে তাকালুম—দূরে দিনের প্রথম আলোর আভাষে আকাশের দিকে উন্নতশীর গৌড়ের প্রাসাদের চুড়াবলি, মিনার, গম্বুজ সব দেখা যাচ্ছে।

এ-জীবন আমার পরিচিত নয়, আর আমার গোপন প্রাণের আকাঙ্ক্ষাও নয়। একটু যেন ব্যথিত হলুম। একটুখানি অপরিচয়ের সঙ্কোচ আমার মনের মধ্যে এল। আর তখন গত কয়েক দিনের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল। এমনি এক সকালে আমি সেখান থেকে রওনা হয়েছিলুম। ভেসে উঠল শবরীর মুখ আমার মনের মধ্যে। মনের প্রিয়তম বস্তুকে হারানোর বেদনা অনুভব করলুম—ঠিক সেই মুহূর্তে তার সেই নিশ্চিন্ত আত্মপ্রকাশের কথা ভাবলুম। সেই চোখের জলের ফোঁটা আমার হাতে অনুভব করলুম। আমার অন্তর

তখন অনাস্বাদিত পুলকের স্পর্শ অনুভব করল। মন আমার বলে উঠল : পেয়েছি! পেয়েছি! অনেক পেয়েছি!

সেই পুলকের প্রসাদ নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করতে যাচ্ছিলুম এমন সময় হঠাৎ ঘরের দরজাটা নড়ে উঠল। আমি দেখলুম সেই দরজার ফাঁকে কালো একটি কচি মুখ উঁকি দিয়েছে। সে মুখ আমীনার।

আমীনা সলজ্জ ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : জনাবের ঘুম ভাঙলো?

আমি বললুম : হ্যাঁ। তোমাদের আতিথ্যে আমি মুগ্ধ। যথেষ্ট আপ্যায়ন আমি তোমাদের কাছ থেকে পেয়েছি।

আমি উঠে দাঁড়ালুম—এবার আমাকে যাবার আয়োজন করতে হবে।

আমীনা বলল : আপনি কি এখন যেতে চান?

আমি বললুম : হ্যাঁ। এখন আমাকে চলতে হবে।

কথা শেষ না হতে সেই গতকাল যাকে আমি সন্ধ্যাতে রমনী রূপে দেখেছি তিনি এলেন। আমাকে ইনিই আতিথ্য দিয়েছেন।

আমি বললুম : ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। অতিথি আপনার দুয়ারে ব্যর্থ হয়নি। আমি তবে চলি।

তিনি হাসলেন। বললেন : বস। চলে নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি। কাল আমি ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে দেখাশুনা করতে পারিনি।

আমি বললুম : আমার কোন প্রকার অসুবিধা হয়নি। আমীনা আমাকে যথেষ্ট যত্ন করেছে। তার জন্য আপনাকে কুণ্ঠিত হতে হবেন না।

তিনি বললেন : আমি আশ্চর্য হয়েছি এবং শুধু সেই কথাই ভাবছি।

আমি তার দিকে তাকালুম।

তিনি বললেন : তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও বিনা দ্বিধায় মুসলমান দেহব্যবসায়িণীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছ। এটা আমার কাছে রহস্য বলে বোধ হচ্ছে।

আমি বললুম: রহস্যের এতে কি আছে? মানুষের গৃহেই মানুষ আতিথ্য গ্রহণ করে

তিনি বললেন: কিন্তু ভিন্ন জাতির গৃহে সহজে আতিথ্য গ্রহণ করে না—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা, যারা নিজের জাতির মধ্যে বর্ণের সীমাকে অত্যন্ত কঠোর ভাবে মেনে চলে। তোমার মনের এই উদারতা এল কি করে?

আমি বললুম: তা তো জানি না। আমার শুধুই মনে হচ্ছে মানুষ মানুষ, তার বর্ণ আর ধর্ম যাই হোক না কেন! তাই আমি মানুষের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দ্বিধা বোধ করি না। মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ আমি তার অন্তর দিয়ে বিচার করি। যার দরদ আছে, যার অন্তরে প্রীতি আছে, সমবেদনা আছে, ভালবাসা আছে, তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ। যার তা নেই তিনি নিকৃষ্ট মানুষ। আমি জাতি বুঝি না, বুঝি গুণগত মানুষ।

তিনি হাসলেন। বললেন: সমাজের ভয় তুমি কর না? তোমার এই কাজের জন্য সমাজ তোমাকে একঘরে করে রাখবে। তাদের কাছে আর আশ্রয় পাবে না।

আমি বললুম: ঈশ্বরের দুনিয়ায় যেখানে আশ্রয় মেলে—আমি সেখানেই থাকব।

সেই মহিলা বললেন: ঈশ্বর-সন্ধানী পুরুষই শুধু এমন নিস্পৃহ কথা বলতে পারে। কবীরের মত তিনি মান-সম্ভ্রমকে সবই তাঁরই দান বলে গ্রহণ করতে পারেন। ঈশ্বরেব উপর নিজেকে সমর্পণ না করতে পারলে এ বোধ আসে না।

তুমি এই বোধের অধিকারী হলে কোথেকে?

আমি বললুম: জানি না। শাস্ত্র পড়ে নয়, দর্শন পড়ে নয়, আমার নিজের হৃদয় থেকেই আমি কেমন করে এই বোধে উপনীত হয়েছি। কখনো কোন দিন মানুষের মধ্যে এই ভেদের কথা ভাবিনি। আমি যা দেখেছি তাই ভাল লেগেছে। মানুষকেও আমার ভাল লেগেছে—তাই জাতি ধর্ম বিচার না করে সবাইকে ভালবেসেছি। আর আমার অহংকার বোধ কোনকালে ছিল কি না আমার মনে নেই! তবে ছিল ভালবাসা পাবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা—একটি ব্যক্তি হৃদয়ের ভালবাসা

পাবার জন্য। কিন্তু যতবার আমি সেই ব্যক্তি হৃদয়কে আশ্রয় করতে চেয়েছি—ততবার প্রবল আঘাত পেয়েছি। কেঁদেছি, যন্ত্রণা অনুভব করেছি। তারপর আঘাত পেতে পেতে আঘাতকে সয়ে নিয়েছি। হঠাৎ একদিন এখন দেখছি—বেদনার মধ্যেও আমি যন্ত্রণা খুঁজে পাই না। তাই আমার মান অভিমান, জাতের বাঁধন কিছু মাত্র আর নেই। দুঃখের মধ্য দিয়ে আমার এ অনুভব যদি জ্ঞানের হয়ে থাকে আমি তবে জ্ঞানী।

কিন্তু আমি জ্ঞান বুঝি না—অজ্ঞান বুঝি না। বুঝি জীবনের পথে চলতে গিয়ে জীবন যা শেখায় তাই।

আশ্চর্য দৃষ্টিতে সেই মহিলা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

আমি দেখলুম—আমীনাও গভীর আগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি বললুম : এবার যাব।

মহিলাটি প্রশ্ন করলেন : কোথায় ?

—তা জানি না। বের হব।

তিনি বললেন : যেখানে খুসি তুমি যেতে পার, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বাধা দেব না। আমি গৃহিণী নই, আমার গৃহে তোমার স্থান কোথায় ? তবু বলছি—আশ্রয়ের সন্ধান না করে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো সমিচিন নয়।—যতক্ষণ তুমি আশ্রয় না পাও, আমার গৃহে থাকতে পার।

আমি ইতস্ততঃ করলুম।

তিনি বললেন : আমার গৃহে থাকতে তোমার অস্বস্তি হবে সে আমি জানি।

আমি বললুম : না, সে কিছুই নয়।

—তাহলে থাকতে আপত্তি কি ?

আমি বললুম : আপনার অন্নের বিনিময়ে আমি আপনাকে কি দিতে পারব ?

তিনি বললেন : আমি বুঝতে পাচ্ছি—তুমি অত্যন্ত আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন। কারো কাছে ঋণী হতে চাও না।

আমি বললুম: অকারণে মানুষের অনুগ্রহ গ্রহণ নিজেকে ছোট করে বলে আমার মনে হয়।

তিনি বললেন। বেশ যে কয়দিন তুমি আমাদের এখানে থাকবে, আমার কন্যার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করো।

আমি বললুম: আপনার কন্যা যে শিল্প-রসের সাধনা করে, আমার সেই শিল্পজগৎ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আমি তাকে কি দিতে পারি?

তিনি বললেন: আমীনা শুধুমাত্র নাচ আর গানই শেখে না। তাকে আমি সংস্কৃতিসম্পন্না করে গড়ে তুলতে চাই। সুতরাং সে লেখা-পড়াও শিখছে।

আমি বললুম: তা শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলুম। বিদ্যাচর্চা এক অভূতপূর্ব সৌন্দর্যের সন্ধান দিতে পারে। আমি আগে তা জানতুম না। কিন্তু কিছুদিন আগে সেই অসীম সৌন্দর্যলোকের কিছুটা সন্ধান পেয়েছি। বিদ্যা মনকেও উন্নত করে। কিন্তু আমি তাকে কোন্ বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি? আরবি বা ফার্সীতে সামান্য জ্ঞান আছে। আমি যা জানি সেটা সংস্কৃত, সংস্কৃত সাহিত্য। কিন্তু আমীনার....

তিনি একটু হাসলেন। বললেন: তোমার সঙ্কোচ আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমীনাও সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা লাভ করতে পারে। শিল্প এবং সাহিত্যের কোন জাত বর্ণ নেই।

আমি বললুম: সে কথা ঠিক। কিন্তু আমীনার কি সংস্কৃত অক্ষর পরিচয় আছে?

তিনি বললেন: বর্ণ-পবিচয় ছাড়িয়ে সে সাহিত্যের প্রথম ধাপে প্রবেশ করেছে। তুমি তাকে শিক্ষা দিয়ে আনন্দ লাভ করবে।

শুনে আমি আনন্দিত হলুম। আমীনার মুখের দিকে তাকালুম, ঈশ্বর আমাকে বঞ্চনা করেন নি। তিনি নিজেই হাত ধরে যেখানে আশ্রয় পাওয়া যায় সেখানেই নিয়ে এসেছেন।

আমি তার দিকে তাকাতে আমীনা লজ্জায় মাথা নীচু করল।

আমি সেই মহিলার দিকে তাকালুম। বললুম: শ্রমের বিনিময়ে থাকতে প্রস্তুত আছি।

ঈশ্বরের যোগাযোগের উপর মানুষের হাত নেই। আমি সেই দেহোপজিবিনী এক গণিকার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। সেটাও ছিল তাঁর ইচ্ছা, আমি সেটা অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলুম।

সেই মহিলা আমার কাছ থেকে তার অতীত জীবনের কাহিনী লুকিয়ে রাখেন নি। আমার কাছে সত্য কখনো লাঞ্ছিত হবে না, এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে হিন্দু। বৈশ্য রমণী। তার কন্যা যখন মাত্র এক বছরের শিশু, তখন তার স্বামীর মৃত্যু হয়। সতী হতে তার আপত্তি ছিল না কিন্তু সন্তানের প্রতি অন্ধ স্নেহ তাকে পাগল করে তুলেছিল। তিনি মরতে চাননি। সমাজে নিয়ম আছে, শিশু সন্তানের জননী সতী থেকে অব্যাহতি পাবে। কিন্তু নানা কারণে পরিবারের লোক-জনেরা তাকে পছন্দ করেনি। তার প্রধান কারণ তারা একে অপয়া-নারী বলে মনে করত। তাই সংসারের অমঙ্গল বিদেয় করবার জন্য একেও স্বামীর সঙ্গে চিতায় দেবার কথা বলল। স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল রাত্রিতে। দিনের আলো ফুটে উঠলেই তাকে চিতায় যেতে হবে, এটা তিনি বুঝতে পারলেন। তার অবুঝ বাৎসল্য কিছুতেই তাকে মরতে দিল না। রাত্রির অন্ধকারে সন্তানকে নিয়ে তিনি পালিয়ে এলেন।

একজন মুসলমান যুবককেই তিনি চিনতেন। সে ছিল তার স্বামীর বন্ধু। তিনি তার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। সে কি ভাবল, তাকে আশ্বাস দিল। এবং তাকে নিয়ে অজ্ঞাতস্থানে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তার আশ্রয়ের পেছনে ছিল জৈবিক ক্ষুধার তাড়না। চিতার আগুনের হাত থেকে বাঁচলেও মানুষের কামনার আগুনের হাত থেকে তিনি বাঁচলেন না। যারা উপভোগী, ভালবাসার সূত্র স্থাপন না করে দেহকে উপভোগ করে, তারা উপভোগের পর দেহকে ততটা মূল্য দেয় না। কারণ, না হলে দৈহিক উপভোগের জন্য একটা দায়িত্ব তাকে নিতে হয়। সে দায়িত্বটুকু লোকে নিতে নারাজ। তাই সেই মুসলমান যুবকটির কামক্ষুধা নিবৃত্ত হলে সে একদিন ওকে ফেলে পালালো। গড়িয়ে গড়িয়ে ওর স্থান হল আস্তাকুড়ে। তিনি গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করলেন, কিন্তু তার মন করল না। আর্ত হৃদয়ে তিনি দুঃখের মধ্য

দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একদিন সেই পরম পুরুষের কাছে কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন।

ওর জীবন কাহিনী শুনবার পর অনেক কিছুর অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। বুঝলুম, কেন তিনি গণিকা হয়েও অতিথিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। কেন তিনি মুসলমান নামধারিণী হয়েও ব্রাহ্মণকে তার যথাযোগ্য আহার্য দিতে ভোলেন নি।

আমি আমীনার ব্যবহারে আশ্চর্য হয়েছিলুম। গণিকা কন্যার মধ্যে তো এমন ভাব সহজে আশা করা যায় না! তার জীবন-রহস্য আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হতে আমি তার সেই গৃহস্থঘরের মেয়ের মত ব্যবহারের অর্থ বুঝতে পারলুম। পরিবেশ জন্মের সবটুকুই তো কেড়ে নিতে পারে না—। তাই আমীনা জঞ্জালে মানুষ হয়েও নোংড়া কথাকে ঘৃণা করে।

কিন্তু আমীনা কি জানে তার জন্মবৃত্তান্ত? না। জানে না। জানবেও না। তার মাও আমাকে বারণ করে দিয়েছিল সে কথা তাকে কিছু না বলতে। নিজেকে যা ভেবে সে বসে আছে তাই ভাল। এ তার সহ্য হয়েছে। কিন্তু সত্য হয়তো আজ আর তার সহ্য হবে না।

বলার প্রয়োজন কি আছে? আমি তাকে কোন কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিনি। তার হৃদয়ের আপন-বৃত্তি তাকে মানুষ করবে। যে ভালবাসা, প্রেম, স্নেহ, মায়া, মানুষকে মানুষ করে তা তার আছে।

আমীনা আমার কাছ থেকে সংস্কৃতসাহিত্যের পাঠ নিতে লাগল। জীবন পথে চলতে চলতে একদা অকস্মাৎ আমি এই রত্নখনির সন্ধান পেয়েছিলুম। আজ পাথেয় হিসেবে তাই আমার কাজে লাগল্।

আমি পড়াতে লাগলুম 'মেঘদূতম্', 'কুমারসম্ভব', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'। ভাবলুম পড়াব, মাঘ ভারবি নিষধ ভবভূতি আরো কত কিছু।

ওকে 'মেঘদূতম্' পড়াবার সময় আমি বসে বসে ভাবতুম—সেই ঋষিতুল্য আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের কথা। তিনি বলেছিলেন, জীবনে আকাঙ্ক্ষা কখনো তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পায় না। তাই যক্ষের রোদন চিরকাল অলকাপুরীর দিকে ধাওয়া করে চলেছে।

আমি ভাবতুম: কে আমার সেই যক্ষপ্রিয়া? কুন্দ না শবরী?

সচেতন বিরহের যন্ত্রণাতে যদি কেউ ভুগে থাকে তবে সে কুন্দ নয় শবরী। শবরীই সেই যক্ষপ্রিয়া।

হয়তো আমি উদাস হতুম সেই বেদনার পংতিগুলি আবৃত্তি করতে। আমীনা তা দেখতো। আমায় বলতোঃ ওস্তাদজী, আপনি মাঝে মাঝে অমন আনমনা হয়ে যান কেন?

সে কথার আমীনাকে আমি কি উত্তর দেব? সে আমার অত্যন্ত গোপন মনের কথা।

আমীনা যেন অনবরত পড়তে ভালবাসতো। অনবরত সে আমার কাছে কাছে থাকতে চাইতো। পড়াতে আমারও ভাল লাগতো। পড়াতুম। পড়াতে পড়াতে আমি নিজেও কখন যেন সেই অলৌকিক জগতের দুয়ারে গিয়ে উপস্থিত হতুম। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতুম—আমীনা একাগ্রে আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তখন আমার ভাল লাগতো। ভাল লাগতো আমি দর্শনীয় বস্তু হয়েছি অপরের দৃষ্টির কাছে এই ভেবে। এমনি করে আবার আমার নতুন জীবন চলল।

আমি সে অঞ্চলে আর অপরিচিত থাকলুম না। কিন্তু সেই পরিচয়টা কিসের?

বিদ্রূপ আর বাঁকা কথা আমার অবশ্য গায়ে লাগতো না। যদিও লাগতো, আমীনার ব্যবহার আমাকে সে বেদনা ভুলিয়ে দিত। আমি ভাবতুমঃ পৃথিবীতে সহস্র বিদ্রূপের মূল্য কি যদি একটি সশ্রদ্ধ হৃদয় তা সস্নেহে মুছে দেবার চেষ্টা করে?

শুধু শ্রদ্ধা নয় আমি আমীনার সেবাও পেতুম। আমার মাতৃহারা ব্যথাতুর জীবনের গোপন মনে আজন্ম যে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি সেই সহৃদয় সেবা পেয়ে নিজের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সান্ত্বনা অনুভব করেছিলুম।

আমার চোখে আমীনারা যাই থাকুক না কেন সহতীর্থ মেয়েদের মনে তা ছিল না।

তাই তারা আমার মত একটি পূর্ণ যৌবনের মানুষকে যে ওরা বেঁধে রাখতে পেয়েছে তার জন্য ঈর্ষা করতো। সেই ঈর্ষাকে তারা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রকাশ করত। মাঝে মাঝে পড়শী মেয়েরা আসতো আমীনাদের

ঘরে। উপলক্ষ্য আমীনার নতুন ওস্তাদজীকে দেখা—যে ওস্তাদজী সর্বদাই ওদের গৃহে পড়ে থাকেন। ওরা এও জানতো, আমীনার বিশেষ করে আমীনা, এটা পছন্দ করবে না। তাই তাকে যন্ত্রণা দেবার জন্যও আসতো।

তারা আমীনার ওস্তাদজীর সঙ্গে গল্প করতে চাইতো।

বহু মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করে তারা, লজ্জা তো তাদের নেই।

ওরা আমার সঙ্গে কথা বললে—আমীনার যেন কিসের ভয় হত। আমাকে বার বার মনে করিয়ে দিত: ওরা খারাপ মেয়ে।

আমীনা যে জগতের, সে জগতে কে-ই বা ভাল! অন্তত বাইরের কাছে। তবু অন্তরের কাছে যে খাঁটি, ভালবাসাকে যে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতে শিখছে তার নিজের কাছে তাকে বিশেষ বলে মনে হওয়াটা আর আশ্চর্য কি!

আমীনার সে নতুন মন আমি দেখেছিলুম সেদিন।

এসেছিল একটি মেয়ে। দেহোপজিবীনীরই মেয়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম যে, সে চিরকালই ব্যতিক্রম। মেয়েটির মুখের আদল ছিল অনেকটাই সেই প্রিয়দর্শিনীর মত।

হঠাৎ তাকে দেখে শান্ত হয়ে আসা আমার চিত্ত কেন যে চঞ্চল হয়েছিল আমি বলতে পারব না। আমার প্রথম প্রেমের ভালবাসার কন্যার সঙ্গে তার মুখের অপূর্ব সাদৃশ্য দেখেই কি? সচেতন হোক্, অচেতন হোক্, জীবনে প্রথম প্রেমই বুঝি সর্বাপেক্ষা প্রবল।

আমি সেই মুখের মধ্যে প্রিয়দর্শিনীর ছায়া দেখে কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারিনি। আমার ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল, আমার দেহ কেঁপেছিল।

কোন বিদ্রূপের ভঙ্গী নিয়ে সেই নতুন মেয়ে গন্না এসেছিল বলে আমার বোধ হল না। নাম তার সার্থক, একটা শিশিরের কণা যেন সে, শান্ত সুন্দর।

আমার দিকে অবাক হয়ে সে তাকিয়েছিল। লজ্জাও পেয়েছিল। আরক্ত হয়েছিল। সেই প্রিয়দর্শিনী সচেতন ভাবে প্রেমের লজ্জাকে নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারেনি। কিন্তু এ সেই সচেতন কৈশোরে উজ্জ্বল।

ও বলল না, কথা বললুম আমিই প্রথম : তোমার নাম কি ?

—গন্না।

নিজের মনের কথাকে যেন গোপন করবার ইচ্ছা ছিল না আমার। বললুম : জান, তোমাকে দেখে আমার একটি পরিচিত মুখ মনে পড়ে যাচ্ছে।

সে কথার কোন জবাব দিলনা গন্না।

—তুমি যেন ঠিক সে-ই।

সে কথার উত্তরে, আরক্ত রঙিন মুখখানাকে সে শুধু নত করল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম : তোমাদের ঘর কোন্ দিকে ?

সে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল : ঐ পথের বাঁকে।

তারপর সে ধীরে ধীরে চলে গেল।

আমিও আর কোন কথা বলতে পারলুম না। শুধু কিসের আবেগে নিজের মনের মধ্যে হতবাক হয়ে যেতে লাগলুম।

ও চলে গেছে। আমি একা বসে আছি। আমীনা সাধারণত এ সময় আমার কাছে থাকে। কিন্তু সে নেই। সে এলো না। এলো আমীনার মা। আমাকে বলল : আমীনার কি হল ?

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকালুম : কি !

—ও ঘরে কাঁদছে ?

—কাঁদছে !

—হ্যাঁ।

মুহূর্তে ব্যাপারটা আমি আঁচ করে নিলুম। সে কান্নার কারণ ওর মা জানেন না। কিন্তু বোঝেন। আমিও বুঝেছি।

আমি আমীনার ঘরে গেলুম। দেখলুম—সে বিছানায় মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আমি ডাকলুম : আমীনা, কি হল ? তুমি কাঁদছ কেন ?

সে কোন কথা না বলে আরো প্রবল ভাবে ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

আমি তার মনের সেই যাতনা বুঝতে পারলুম। এই বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে আমিও একদিন কেঁদেছি এমনি করেই।

গন্নার দিকে আমার দৃষ্টির অর্থ আমীনা বুঝতে পেরেছে। আমারই জন্য আমীনার এই বেদনা। আমার নিজের মনের মধ্যে দুঃখ বোধ হল। আমীনার দুঃখের যন্ত্রণা আমি সহজেই অনুমান করতে পারি।

যে যন্ত্রণা আমি পেয়েছি সে যন্ত্রণা অপরকে দিতে চাই না। আমার জীবনের ব্যক্তিগত সুখ দূরে থাক। যে ভালবাসা আমি আকৈশোর স্বপ্ন দেখে এসেছি, সেই ভালবাসা যদি আমার দুয়ারে আসে তা যারই হোক না কেন, আমি তাকে ফিরিয়ে দেব না।

আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে আমীনার পিঠে হাত রাখলুম। ডাকলুম: আমীনা।

সে তবু মুখ তুলল না।

আমি নিজে তার চিবুক ধরে সেই মুখখানা তুললুম।

অশ্রুর প্রবাহে ভেসে গিয়েছে সে মুখ।

আমি যেন—আমার অন্তর থেকে বললুম: আমীনা, আমি আর তোমায় ব্যথা দেব না। আমি বুঝতে পেরেছি কেন তুমি কাঁদছ। তুমি আর কেঁদো না।

আমীনা যেন একটু আশ্বস্ত হল। নিজের চোখ দুটি সে মুছল। কিন্তু লজ্জা পেল। নিজের মনকে সে লুকাতে পারেনি বলে এই লজ্জা। তবু, তবু যেন সে তার বিরাট প্রাপ্তি। আমার ভাল লাগল এই ভেবে যে, আমি নিজে দুঃখ পেয়েছি কিন্তু অপরকে দুঃখ দেইনি ভেবে।

কিন্তু মানুষ নিজের মনকে নিজে জানে কি?

বক্তা এইটুকু বলে একটু থামলেন।

শ্রোতারা গল্পের এই অপ্রত্যাশিত গতি পরিবর্তনকে কি সহজে মনের মধ্যে স্থান দিতে পেয়েছিল? বিরক্ত হলেও গল্পের আকর্ষণে কোন রকমে তারা ভেসে চলেছিল। আবার একটু আশ্বস্ত হচ্ছিল তারা। হয়তো এবার একটা পরিসমাপ্তি পাবে—গল্প কথকও। কিন্তু, আবার কিন্তু কেন? সেই কালো মেয়েটি, সেও একটা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। বক্তা আবার বলতে আরম্ভ করলেন: কিন্তু নিজের মনকে মানুষ নিজে জানে কি? জানে না, হয়তো ঈশ্বরই তা জানতে দেন না। তাঁর নিজের ইচ্ছা তিনি মানুষের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করেন।

আমি আমীনাকে কথা দিলুম একটা উত্তেজনার মুহূর্তে। কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে নিজের যখন বোঝা-পড়া করতে বসলুম তখন যেন কোন গভীর সাড়া আর পেলুম না।

আর সেই সাড়া না পাওয়ার জন্য নিজের মনের মধ্যে কেমন একটা উদাসীন ভাব লক্ষ্য করলুম আমি।

আমীনাকে পড়াতে পড়াতে কখনো আমি উদাসীন হয়ে ভাবতুম। ভাবতুম নতুন প্রিয়দর্শিনী গন্নার কথা।

সে যেন আমার অন্তরকে আলোড়িত করে গেছে। সে আলোড়ন প্রথম দিনের আবেগের মতই।

ওকে পড়াতে পড়াতে স্মৃতির পথ ধরে আমার অজ্ঞাতসারেই কখন যেন আমি কোথায় চলে যেতুম। সেখানে দেখলুম গন্নার মুখ। আমার বুকে মৃদু মৃদু কাঁপুনি লাগত।

অন্তরের অনুভব সত্যকে বড় সহজেই ধরতে পারে। আমীনাও আমার মনকে সহজে বুঝে ফেলল। তার অন্তরের অনুভূতিকে সম্প্রসারিত করে দিয়ে যখন সে আমার প্রাণের স্পর্শ পাবার চেষ্টা করত, তখন যেন সে আমাকে পেত না। তার মুখে একটা বেদনা-কাতর ভাব ফুটে উঠত। আর সেই ব্যর্থতা একটা অসহ যন্ত্রণা হয়ে তার বুকে বসে আছে সেটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতুম।

অনুকম্পা বোধ করতুম আমীনার উপর। আর আমার নিজের উপর আসতো ধিক্কার।

আমি ভাবতুম আমীনা আমাকে সমস্ত মনোপ্রাণ দিয়ে ভাল বেসেছে—এই ভালবাসাই তো ছিল আমার জীবনের কাম্য। তবে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ভালবাসাকে পেয়েও তাকে মূল্য দিতে পারছি না কেন? তবে কি মানুষের অন্তর চিরকালই দুরাশার স্বপ্নে মগ্ন! যা পায় তাতে তার কোন আগ্রহ থাকে না? আমি কি গন্নার মধ্যে পূর্ব-স্মৃতি দেখে ভুলেছি? না আমীনার চেয়ে সে বহুগুণে বেশী সুন্দরী বলে সেই রূপে ভুলেছি?

তখনো জানতুম না ভালবাসা আর রূপ ভিন্ন।

ভালবাসা একটা মহৎ আশ্রয় যা পেলে জীবন স্নিগ্ধ হয়, হৃদয়

সম্প্রসারিত হয়, শুধু মাত্র আর একটি হৃদয়ে নয় বিশ্বের সর্বত্র। আর রূপ? রূপ শুধু দেয় যন্ত্রণা, সীমাবদ্ধতা। রূপকে সহজে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু ভালবাসার সীমাহীন বাঁধাকে কোনদিন অতিক্রম করে যাওয়া যায় না।

গন্না আমাকে টানতো। তার আকর্ষণের কি এক আবেদন আছে। আমার যেন সেই আবেদনকে অস্বীকার করবার শক্তি নেই।

একদিন আমি তাই আমীনাকে লুকিয়ে গন্নাদের ওখানে গেলাম।

ঈশ্বর কখনো কাউকে সৃষ্টি করেন পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হবার জন্য, গন্নাও তেমনি, যাকে দেখে শুধুমাত্র আমিই আকর্ষিত হইনি, সেও আমাকে দেখে আকর্ষণ অনুভব করেছিল।

আমার জন্য সাগ্রহে সে কয়দিন অপেক্ষা করেছে একথা আমি যেতেই সে আমাকে বুঝিয়ে দিল।

তার দৃষ্টির মধ্যে নবারুণ উত্তাপ। এ দৃষ্টি বহুবার আমি দেখেছি। এ দৃষ্টিকে আমি চিনি।

আমার ভাল লাগল। আমি গন্নার চোখের মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করবার চেষ্টা করলুম।

আর এক উত্তাপের জীবন।

ভালবাসার উপর দাঁড়িয়ে কি নিষ্ঠুর উত্তাপের দৃষ্টিতে আমি সে নতুন জীবনের দিকে তাকালুম!

অপমানিত ভালবাসা।

আমীনা আমাকে একদিন বলল: ওস্তাদজী, আপনাকে বেঁধে রাখতে আমি চাই না। আপনার সুখই আমার জীবনের সুখ।

আমি তার মুখের দিকে তাকালুম: তুমি এ কথা বলছ কেন আমীনা?

নিজেকে ফাঁকী দেওয়া যায় কিন্তু প্রেমের অন্তরকে তো কখনো ফাঁকী দেওয়া যায় না। আমাকে আমি জানি, আমার চেয়েও বেশী জানে আমীনা। আমি আমীনার অন্তরে একটা সমবেদনা জানাবার জন্য কৃত্রিম অভিমানের ভাণ করলুম: তুমি এ কথা বলছ কেন আমীনা? তাহলে কি আমি তোমাকে বিরক্ত করছি? আমি চলে গেলে কি তুমি সুখী হবে? তুমি আমাকে তাই চলে যেতে বলছ?

আমীনা একটা কঠিন সত্য কথা বলল: নিজেকে ফাঁকী দেবার চেষ্টা করবেন না। আপনি যেতে চান। কেন চান, তাও আপনি ভালভাবেই জানেন। আমি আপনার উপর বিরক্ত হইনি, কোনদিন হবও না। হওয়া সম্ভব নয়। আপনি ভুলে গেলেও আপনাকে আমি কোনদিন ভুলব না।

নিজের হৃদয়কে তো আমি তবু বোঝাতে পারলুম না। গন্না যেন এক অপ্রতিরোধ্য আহ্বানে আমাকে ডাকতে লাগল।

সুতরাং আমি গন্নার কাছে যেতে লাগলুম।

কিন্তু গন্নার মনে যাই থাকুক, তার মায়ের সেটা পছন্দ ছিল না। সে নর্তকী, পূর্ণভাবে নর্তকী। তার মেয়েকে সে সার্থক নর্তকী করে গড়ে তুলতে চায়। ভালবাসার জটীল জালে সে জড়িয়ে পড়ুক, এটা তার অভিপ্রেত নয়। বিশেষ করে আমার মত নিঃসম্বল দরিদ্রের কি মুল্য আছে তার কাছে?

প্রচারে ভগবান বিকৃত হতে পারেন, মানুষ তো দূরস্থান। আমার বিরুদ্ধে সেই রূপোজিবিনীদেরও যেন একটা আক্রোশ ছিল। কেন, জানি না। আমি তাদের চিত্রনে চিত্রিত হলুম জগতের জঘন্যতম একটি জীব রূপে। এক রমকের চেহারা হলেই দুয়ের অন্তরও এক হবে, এটা তো বলা যায় না। আমি অল্পদিন গন্নার সঙ্গে মিশে বুঝেছিলুম যে, তার মন সন্দেহকাতর। কারো সঙ্গে মিশতে গেলে তাকে জানবার চেষ্টা সে করে আগে। তাদের মত সমাজহীন যে জীব, আমি তাদেরও কাছে চিত্রিত হলুম এমন রূপে, যা দেখে গন্নার পক্ষে পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

সে ত আমীনার মত নয়, ভালবেসেই নিজেকে সার্থক মনে করেনি। নিজেকে সেই অতল সমুদ্রের অকূলপাথারে ভাসিয়ে দেয়নি—যেখান থেকে আর কিনারা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। নিজেকে সে সহজেই গুটিয়ে নিতে পারল।

আমি পেলুম একদিন প্রত্যাখ্যানের নিদারুণ বেদনা। এ পর্যন্ত বহু দুঃখ পেয়েছি। দুঃখ সয়ে সয়ে দুঃখ সইবার ক্ষমতা এসে গেছে। প্রিয়দর্শিনীকে পাইনি, তার জন্য কেঁদেছি। কুন্দকে পাইনি, তার জন্যে

উন্মাদের মত ঘর ছেড়েছি। শবরী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখ আমাকে ম্রিয়মান যতই করুক আপমানের যন্ত্রণা দেয়নি। প্রিয়দর্শিনী নিজে প্রত্যাখ্যান করেনি, শুনেছি কেঁদেছে; কুন্দকে পাইনি, সেটা সমাজের জন্য। আর শবরী আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে কিন্তু বিনিময়ে যা দিয়েছে আমার হৃদয়কে দুঃখ সইবার তা দিয়েছে অসীম ক্ষমতা। কিন্তু গন্নার হল সচেতন মনের প্রত্যাখ্যান। যেন একটা বর্শার ফলক এসে আমার বুকে বিঁধল। এত সহ্য করেও এটাকে যেন অসহ্য মনে হল। সেই অপমানের যন্ত্রণার মুখে প্রকৃত ভালবাসা অবহেলিত হয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে থাকল—আমি তাকে দেখেও দেখলুম না।

আমি পথে বের হলুম। মনে ভাবলুম, এ স্থান আর নয়। আবার স্থানান্তর।

ঈশ্বরকে দোষারোপ করতে গেলুম—কিন্তু পারলুম না। ভালবাসা তো তিনি আমাকে দিয়েছেন—, এ দোষ তবে কার?

সে দোষের বিচার নেই। হৃদয়ের যন্ত্রণায় আমি তখন অস্থির। ভাবলুম, থাকব না আর এখানে। কিন্তু কোথায় যাব? দুটো আকুল নয়নের হাহাকার-ভরা আবেদন আমার চোখে পড়ল না।

পথে দেখলুম, দলবল নিয়ে যাচ্ছে মেহের। নতুন নর্তকী-জীবন শুরু করেছে। হয়তো কোথাও দূরে চলেছে। ঘৃণা করে সে আমীনাকে। কতবার আমাকে ভুলাবার চেষ্টা করেছে শুধু আমীনাকে দুঃখ দেবে বলে। গন্নার প্রত্যাখ্যান আমি পাব সে তা জানতো। এই প্রত্যাখ্যানের মুলে যারা কাজ করেছে সেও কি তাদের মধ্যে একজন নয়?

আমার দিকে চোখ পড়তেই সে ফিক্ করে হাসল: এই যে ওস্তাদজী, তুমি!

আমার মনের মধ্যে তখন একটা যন্ত্রণা। আমি কোন কথা বললুম না।

সে বলল: কোথায় চললে?

—জানি না।

মুচকি হেসে সে বলল: এ কি! রাগে গড় গড় করছ দেখি! কোথায় চললে?

আমি বললুম : তুমি কোথায় চললে ?

সে হেসে বলল : অভিসারে। যাবে ?

আমার কি মনে হল, বললুম : যাব।

—যাবে!

—হ্যাঁ!

—সত্যি ?

—তবে কি মিথ্যে!

সে বলল : বেশ, তবে উঠে এস পাল্কীতে। এই পাল্কী থামাও। বাহকেরা পাল্কী থামালো : আমি সেই পাল্কীতে গিয়ে উঠে বসলুম।

বক্তা থামলেন।

শ্রোতারা কি ভাববে ? এতক্ষণ তারা সমবেদনা দেখিয়েছে। এবার ? এই যে সে ভালবাসাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে তার জন্য ? ঘৃণা ?—

কিন্তু তারা কোন সিদ্ধান্তে আসবার আগেই বক্তা আবার বলতে আরম্ভ করলেন : সেটা কি আমার ইচ্ছা ছিল, কিম্বা ঈশ্বরের ? ঈশ্বরের উপরে এতদিন শুধু অভিমান ছিল। এবার বিশ্বাস এল। বুঝতে পারলুম তিনি আছেন। সবই তিনি করান। তাঁর ইচ্ছাই সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে সাধিত হয়। তিনি যা দেবার তা-ই দেন, আপনার মত করে দেন।

আমি মেহেরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। একদিন নয়, দুদিন নয়, দুটি মাস আমি তার সঙ্গে থাকলুম। কিন্তু গৌড়ের প্রান্ত ছেড়ে যাবার পরদিনই আমি নিজেকে চিনতে পারলুম। বুঝতে পারলুম আমার হৃদয় কোথায় ? একটা তৃষ্ণার্ত আগুনের মত দেহ মেহেরের। উপভোগের উন্মাদ তৃষ্ণায় তা একটা ক্ষুধার্ত বাঘের মত।

মেহেরের নতুন আস্তানায় প্রথম যেদিন বিশ্রাম নিলুম,—দুরন্ত কামনার তাড়নায় মেহের আমাকে জড়িয়ে ধরল। উওপ্ত ওষ্ঠে সে আমাকে চুম্বন করল। আমার গভীর বুকের মধ্যে ঠিক সেই সময় একটা নিবিড় বেদনা চিরিক দিয়ে উঠল। আমার অন্তর বলল : না, না, না। আমার দুই চোখের উপর অশ্রু প্লাবিত আমীনার সেই

চোখ দুটো ভেসে উঠল। আমার বুকটা হাহাকার করে উঠল। না, না, না, তাকে আমি ভুলতে পারব না!

মেহেরের মুখের কাছ থেকে আমার মুখখানাকে ফিরিয়ে নিলুম আমি। কামনার আবেগে মেহেরের সমস্তদেহ তখন কম্পমান। এর জন্যই কি মেহের আমাকে প্রলোভন দেখিয়েছে?

মেহের বলল: কি গো, তোমার কি হল ওস্তাদজী?

আমি বললুম: না, আমায় একটু সময় দাও।

—কেন?

আমি প্রায় কেঁদে ফেললুম, বললুম: আমি মন ঠিক করতে পাচ্ছি না।

সে বলল: আমার চেয়েও সুন্দরী মেয়ের কথা বোধহয় তোমার মনে পড়ছে?

আমি বললুম: না। সুন্দরী যারা এসেছিল জীবনে, আজকে তাদের কারো কথা আমার মনে পড়ছে না। শুধু একটি মুখ, কালো, কৃশ একটি মেয়ের মুখ আমার মনে পড়ছে। না, না, আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছি না।

মেহের আশা ত্যাগ করল না। তার মত উত্তপ্ত রমণীদেহকেও আমি অস্বীকার করছি, এটা যেন তার কাছে অসহ্য বোধ হল। হয়তো তার মনে প্রবল জেদ চাপল, আমাকে জয় করতে হবে।

দিন, ক্ষণ, মাস, মেহের আমাকে লোভ দেখাতে লাগল। দেহের লোভ। উলঙ্গ নারী-দেহের প্রবল আকর্ষণে পুরুষ ভুলবে না, এ কি হতে পারে?

আমার মন তখন কারাগারে বন্দী এক আত্মার মত কাঁদছে।

মেহের একদিন বলল: তোমায় দেখে আমার দেহে কম্পন জাগে, তোমার কেন জাগে না?

আমি কোন জবাব দিতে পারলুম না। মেহেরকে আমি বোঝাতে পারব না যে তার আর আমার মধ্যে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করে আছে একটি ক্ষীণাঙ্গী কালো মেয়ে।

অবশেষে একদিন বিরক্ত হ'য়ে মেহের বলল: তুমি কাপুরুষ। যাও। দূর হয়ে যাও।

আমি যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললুম : এই ভাল।

মেহেরের আশ্রয় থেকে বের হলুম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলুম। বললুম তুমি আছ। প্রকৃত সত্যের সন্ধান তুমি এ ভাবেই আমাকে দিয়েছ প্রভু। যদি আমি গন্নাকে পেতুম তবে আমীনার সত্যিকারের প্রেমকে কোনদিন মর্যাদা দিতে পারতুম না। জগতে যা সত্যিকারের কাম্য জিনিস দুঃখের মধ্য দিয়ে তুমি আমাকে তারই সন্ধান দিয়েছ। যদি হাত পাতলেই আমি তাকে পেতুম তবে তার মূল্য দিতে পারতুম না। তিলে তিলে দুঃখের মধ্য দিয়ে তুমি আমার হৃদয়ে সেই সত্যের বেদী প্রতিষ্ঠা করেছ। তুমি যা কর কোন কিছু অমঙ্গলের জন্য নয়। দুঃখের বজ্রানলের মধ্যে তুমি রাখ শান্তির স্পর্শ। তিলে তিলে নিজেকে দহন করে দুঃখের ঘ্রাণে সেই সত্যের সন্ধান মেলে। বহু দুঃখের পরে সেই সত্যকে আমি যেন আজ বুঝতে পারছি। প্রিয়দর্শিনীর ব্যথা, কুন্দকে হারানোর যন্ত্রণা, শবরীর চোখের জল, সব এসে আমীনার মধ্যে সার্থক স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে। ভালবাসাকে সেখানেই তুমি আমার কাছে পরিপূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দিলে। হে ঈশ্বর! তুমি আছ। দুঃখের মধ্য দিয়ে সেই অস্তিত্বের সন্ধান মেলে। আমি তোমাকে জানলুম। এই যে এত দুঃখ পেলুম আজ তা পূর্ণ প্রাপ্তির স্নিগ্ধতায় আমাকে মধুর স্বাদে ভরে দিয়েছে।

আমি হাটলুম গৌড়ের দিকে। যদি আমীনা আমাকে ক্ষমা করতে পারে তবে বলব : আমীনা তোমার ভালবাসার স্বরূপ আমি উপলব্ধি করেছি। তোমাকে জেনেছি। সেই ধ্রুব সত্যের পথ থেকে আর কখনো আমি বিচ্যুত হব না। যদি তুমি ক্ষমা কর তবু নয়, যদি না কর তবু নয়! আমি গৌড়ে ফিরে এলুম।

কিন্তু আমীনাদের সেই গৃহ ম্লান।

ওরা কি চলে গেছে? অপমানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমীনা লুকিয়েছে? গৃহিণী-বধূ সেই আমীনার মা কন্যাকে আঘাতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দেশান্তরিণী হতে পারেন। আজ তার দেহ-ব্যবসায় হলেও তিনি আসলে 'মা'।

কিন্তু সেই সব ভাবনা আমাকে ক্লান্ত করল না। ভয় আমার

আর নেই। আমীনা যদি আমাকে ভুল বোঝে তবু নয়! যদি না বোঝে তবু নয়! ভালবাসা আজ আমাকে নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে। ভালবাসা নিজের হৃদয়ের বস্তু। সে এক পরম স্নিগ্ধতায় নিজেকে ভরে দেয়। প্রণয়ের পাত্রকে অতিক্রম করে তা বহু দূর চলে যায়।

আমাকে দেখে আমীনার মা করুণ নয়নে আমার দিকে তাকালেন:—এসেছ?

আমি বিশ্বাসঘাতক, আমার লজ্জা হওয়া উচিৎ। কিন্তু হল না।

প্রেমের প্রেরণায় আমি যেন আজ স্পষ্ট, সহজ, অকৃত্রিম।

তিনি বললেন: চল, হয় তো শেষ দেখা দেখতে পাবে।

আমি জানতুম, বঞ্চনা তো ভালবাসা সহ্য করতে পারে না!

ঘরে গিয়ে দেখলুম শয্যার সঙ্গে মিশে গিয়েছে আমীনা। প্রেম পরম পবিত্র তীর্থে স্থির হয়ে আছে যেন। দুঃখে নয়, বেদনায় নয়, অকারণে আমার চোখ ভরে জল এল।

আমি আমীনার পাশে গিয়ে তার চিবুক স্পর্শ করলুম। আমীনার দুই চোখের ধার দিয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু, যেন অলস দুইটি শিউলী ঝরছে।

আমার আহ্বান সে যে অবচেতন মনেও শুনতে পায়। চোখ খুলল সে।

আমি বললুম: আমীনা আমায় দেখ। আমি এসেছি।

একটু ক্লান্ত হাসি হাঁসল আমীনা।

আমি তার বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখের কাছে আমার মুখ আনলুম। চোখের কাছে চোখ রেখে তার চোখে তাকালুম।

বললুম: আমীনা, আমায় দেখতে পাচ্ছ?

ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল: পাচ্ছি।

আমি বললুম: শোন, আমি তোমার। আমি তোমার কাছে এসেছি। তোমার দুর্নিবার ভালবাসার টান আমি এড়াতে পারিনি। মুহূর্ত আমি ভুলতে পারিনি তোমাকে। আমীনা তুমি আমাকে জীবনে মুক্তির স্বাদ দিয়েছ। তোমার ভালবাসায় আমি শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর।

অন্ধকার আসবার আগে সূর্য শেষ প্রান্ত থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে যেমন করে হাসে তেমনি একটু হাসল সে।

আমি বললুম : বল ব্যথা পাওনি তুমি ?

—না।

ক্ষীণ কণ্ঠে সে বলল : তুমি তো পাওনি ?

আমার চোখের জল অকারণে আবার ঝরল : না, না, না আমীনা। আমি তোমার কাছে এসে পেয়েছি জীবনের পরমার্থ।

এইটুকু বলে বক্তা আবার থামলেন।

গভীর কৌতূহলী কয়েক জোড়া চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। কোথায় সমাপ্তি টানবেন তিনি ? দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব! তাই বলে আবার সেই দুঃখের অবতারণা ?

তাদের অপলক চোখের দৃষ্টি সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

হ্যাঁ। তাই। কিন্তু তবু কান্নাকে তা অতিক্রম করে গেল এইটুকুতেই যা তৃপ্তি। বক্তা বললেন : ভালবাসাকে যে জীবনের পরম ধন করেছে, ভালবাসা তাকে ব্যর্থ করে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে তার আত্মাকে সে দেয় স্নিগ্ধ এক অনির্বচনীয় পুলক। জীবনকে অতিক্রম করে মৃত্যুর জগৎ পর্যন্ত সে শান্তির পরম স্পর্শ তাকে আবৃত করে রাখে।

ভালবাসাকে জীবনের দেবতা করেছিল আমীনা। তাই সে ব্যর্থ হয়নি! আর ব্যর্থ করেনি যাকে সে সেই প্রেমের আলো দিয়ে আলোকিত করেছিল। আমীনা থাকেনি, ভালবাসার এক অমৃত মধুময় জগতে সে শাশ্বত শান্তির বক্ষে স্থান লাভ করেছিল। তাকে এখানে রাখা যায় নি।

কিন্তু আমি থাকলুম। বিরহের হাহাকার ভরা তীব্র অন্তর নিয়ে নয়। শুধু আমার বুক ভরে ভরে উঠতে লাগল। শুধু আমার মনে হতে লাগল যা পেয়েছি তার তুলনা নেই। দুঃখের তুলনা নেই, সুখের তুলনা নেই, কোন কিছুরই তুলনা নেই। সব সুন্দর, মধুর। আমার হৃদয়ের মধ্যে এক শান্ত হ্রদের কোমল স্পর্শ অনুভব করলুম। আমি যেন দেখলুম, সেই প্রেম এক এবং একক। সে চোখের জলের মধ্য দিয়ে এসে জীবনকে জীবনাতীতের দিকে নিয়ে যায়। আমি ঊর্ধ্বে তাকালুম, মৃত্তিকায় তাকালুম, তৃণ-লতায় গুল্মে তাকালুম, সর্বত্র তাকালুম। দেখলুম সেই ভালবাসা কত পরম করুণাস্নিগ্ধ ভাবে পরমস্পর্শে ছড়িয়ে আছে। শিশিরের চেয়েও সে লঘু, শান্ত, স্নিগ্ধ।

সর্বত্র আমীনা, সর্বত্র আমার প্রেম, তার প্রেম,। আমি দেখলুম, সর্বত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর মানুষের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন প্রেমে। দুঃখের আঘাতে ধীরে ধীরে জটিল গ্রন্থি মোচন করেছেন। যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এসেছে শান্তি।

বেদনার দুঃখে একদিন ঈশ্বরের প্রতি আমি অভিমান প্রকাশ করেছিলুম। বঞ্চনার ক্ষোভে আমি একদিন তাঁকে অস্বীকার করেছিলুম। মনের দুঃখে আমি একদিন তাঁকে স্মরণ করে কেঁদেছিলুম।

'আমাকে তুমি কান্না দাও কেন?' এই বলেছিলুম।

অশ্রুজলের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ মনে হয়ঃ কি পুলক! কি শান্তি! কি অপার ভাললাগা। হে ঈশ্বর, তুমি এত করুণাময়! এমন দুঃখের মধ্য দিয়ে আমাকে জীবনাতীত আনন্দের সাড়া এনে দিলে! হে ঈশ্বর, তুমি আছ, আছ, আছ। প্রতি কাজের মধ্যে শুধু তুমি, তুমি, ঝরে পড়ছে তোমার অপার করুণা। দুঃখ যে এত সুখের, দুঃখের মধ্য দিয়ে তুমি শিল্পীর মত আমাকে এগিয়ে নিয়ে নিপুণ কবির সার্থকতায় সে কথা প্রকাশ করে দিলে। হে ঈশ্বর! তোমাকে নমস্কার! আমি তোমাকে দেখতে পেয়েছি।

বক্তার মুখের মধ্যে এক আলো ফুটে উঠল। অসীম সৌন্দর্যালোকের পরম স্নিগ্ধঘন শান্তির জ্যোতি।

অবাক হয়ে সকলে তাকিয়ে দেখল—হ্যাঁ, সব কিছুই মধুর, মধুর লাবণ্যে ভরে উঠেছে যেন তাঁর কাছে। তিনি যখন কথা বলেন—সর্বত্রই যেন সেই মধুরের ব্যাপ্তি অনুভব করা যায়।

বক্তা বললেনঃ সবই যেন আমার আপন মনে হল সেদিন,—ঘর-বার সব। পশুপাখী, তৃণ-লতা, পাতা সব। সর্বত্র, সর্বত্র আমি দেখতে পেলুম সেই মহাপ্রেম মধুর ভালবাসার শিশিরে জড়িয়ে আছে। আমি পথে বেরোলুম। এক পরম ভাললাগায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

আমি বলছি শোনঃ ঈশ্বর আছেন। তিনি এক এবং মহাপ্রেমের তিনিই উৎস। তিনি গভীর দুঃখ, আবার তিনিই নিবিড় সুখ। তাঁর প্রতি কাজের মধ্য দিয়ে মানুষকে তিনি সেই মহাপ্রেমের মধ্যেই আবার টেনে নিচ্ছেন। মহাপ্রেম থেকে আমাদের উৎপত্তি, আবার মহাপ্রেমেই

আমাদের নয়। সেই ঈশ্বরের ভালবাসা নিজেকে অনুভব করবার জন্য জীবনের মধ্যে এসে কাঁদে; কেঁদে কেঁদে আবার সেই অনন্ত প্রেমের পরশ অনুভব করে। আমি বলছি: হে মানুষের সন্তানেরা, দুঃখকে ভয় কোরো না, দুঃখ সুখের প্রবেশ-পথ। দুর্ভাগ্য এবং সুখ ঈশ্বরের আশীর্বাদ। অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে সেই দুর্ভাগ্য এবং সুখকে তুমি ঈশ্বরের নামে গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। ঈশ্বর এক এবং সকলের। তিনি হিন্দুর নন, মুসলমানের নন, মানুষের। জগতে জাতি নেই, আছে শুধু মানুষ। সেই মানুষই ঈশ্বরের কাছে আছেন যার হৃদয়ে আছে নিরহঙ্কার ভালবাসা। তোমরা ঈশ্বরের উপর গভীর আস্থা স্থাপন কর, ভালবাস, কাঁদ। ঈশ্বর তোমাদের দুয়ারে আসবেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়, সুখে-দুঃখে সর্বদা তিনি মঙ্গলময়।"

সকলে যেন চিৎকার করে উঠল: ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি আছেন। জাতি নেই, বর্ণ নেই, তিনি আছেন। তিনি মানুষের ঈশ্বর, তৃণ-লতা-পাতা-পশু-পাখীর ঈশ্বর। তিনি চেতনের ঈশ্বর, তিনি অচেতনের ঈশ্বর। তিনি আছেন। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান প্রেম, বেদনা।

ঈশ্বর-অভিজ্ঞ মানুষের বিশাল ব্যাপ্তি। তাঁর উপস্থিতিতে জন-মনে আপনি পুলক আর বিশ্বাসের সঞ্চার হয়। জনতা যেন ঈশ্বরের সেই করুণাপুষ্ট সন্তানের মধ্যে এক নতুন আলো পেল।

মাঠে ঘাটে পথে নতুন উন্মাদনা:
'ঈশ্বর আছেন।'
'দুঃখে-সুখে তিনি সর্বত্র মঙ্গলময়।'
'দুঃখই ঈশ্বরের মহত্তম দান।'
'জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপনি প্রকাশিত হন।'
'জীবন ঈশ্বরের পথেই বিকাশমান।'
'ধর্ম্ম শুধু এক:—ভালবাসা।'
'জাতি শুধু এক: মানুষ।'
'জীবন সর্বত্র।'

দলে দলে লোক আসতে লাগল: গৌড়ের কাছে ঈশ্বরদর্শী মহাপ্রেমিক এসেছেন। দুঃখের জীবনের জন্য তিনি এনেছেন সান্ত্বনার বাণী। বেদনাক্লিষ্ট জীবনের মধ্যে মানুষ সেই সান্ত্বনার বাণী শুনতে চায়।

হাজারো হাজারো লোকের ভীড়, কেঁপে উঠল গৌড়ের প্রান্তর। দিল্লীর সুলতান তখন সিকান্দার লোদী। গৃহ যুদ্ধে, আত্মকলহে ব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত তিনি। শত্রুকে ভয় নেই, তরবারি আছে, যুদ্ধ করবেন। হঠাৎ সংবাদ শুনলেন: গৌড়ে এক নতুন মানুষ এসেছে, চিরাচরিত ধর্মের পথ পরিত্যাগ করে বলছে নতুন কথা: সমস্ত মানুষ এক। ধর্ম নেই, জাতি নেই। প্রেমই জীবনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। ধর্ম যদি না থাকে, জাতি যদি না থাকে, প্রেম যদি আরাধ্য, তবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র কোথায়? ব্যক্তির স্বার্থ কোথায়? ক্ষমতা কোথায়? এই দ্বন্দ্বের উপরই তো রয়েছে শক্তি!

সাম্রাজ্য ভেঙে গেলে গড়ে উঠবে। কিন্তু মানুষের মনে যদি প্রচলিত ধারণা ভেঙে যায়, নতুন সাম্রাজ্য আর গড়া চলবে না। মানুষ যদি মানুষের মধ্যে আর বি[illegible] না দেখে, যদি ধর্মে ধর্মে, স্বার্থে স্বার্থে, কলহ না থাকে, সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেয়েও এ বড় বিদ্রোহ। আর এক মুহূর্ত দেরী নয়, অবিলম্বে এ বিদ্রোহ দমন করতে হবে। দিল্লীর সুলতান হুকুম পাঠালেন পাটনার শিপাহশালারকে: বন্দী কর দুষ্‌মনকে। এক জীবনে সর্ব-ধর্মের সমন্বয় হতে পারে না। যদি হিন্দু সে তবে হিন্দুই, যদি মুসলমান তবে মুসলমান। হিন্দু মুসলমান এক নয়। এর মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে।

একদিন হাজারো মানুষের ভীড়ের মধ্যে সুলতানী ফৌজ এসে বন্দী করল তাঁকে। কিন্তু তাঁর মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। শান্ত, স্নিগ্ধ, পরম আনন্দ-ঘন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে সে মুখ। লোকেরা চিৎকার করলো: দুষ্‌মন্‌, শয়তান্‌, দিল্লীর সুলতানের পতন হোক্‌।

উদ্ধত অস্ত্রের ঝনৎকার মানুষের প্রতিবাদকে কি মূল্য দেয়!

তাঁকে নিয়ে যাওয়া হোল বিহারের শিপাহশালার আজম-ই-হুমায়ুনের কাছে।

একটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সামান্য মানুষটির দিকে তিনি তাকালেন। কে দেখেই দিল্লীর সুলতান ভয় পেলেন? আশ্চর্য! কি আছে র! কিছু নেই। শান্তশিষ্ট, নিরীহ।

জিজ্ঞেস করলেন শিপাহশালার: তুমি কে?

উত্তর এল: আমি মানুষ।

ভয় নেই, ঔদ্ধত্যও নেই। শান্ত স্নিগ্ধ পরম তৃপ্তির স্পর্শে লাবণ্যময় সে।

—তোমার ধর্ম কি?

—ভালবাসা।

ধমকে উঠলেন শিপাহশালার: তুমি কোন্ ধর্মের লোক?

—ভালবাসার।

—তুমি হিন্দু না মুসলমান? চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

—আমি মানুষ।

আশ্চর্য শান্ত, স্নিগ্ধ, এতটুকু ভয় নেই।

—মুসলমান ধর্ম মান তুমি?

—বুঝি না।

—হিন্দু ধর্ম?

—বুঝি না।

—কি বোঝ তবে?

—বুঝি ভালবাসা।

ক্রুদ্ধ হয়ে শিপাহশালার বললেন: জোচ্চুরী রাখ। বল, তুমি হিন্দু না মুসলমান?

—আমি মানুষ।

দাঁতে দাঁত ঘসলেন শিপাহশালার: আচ্ছা! বিষ দাঁত তোমার ভাঙছি, রোস।

একটি হুকুমনামা বের করে ধরলেন তিনি তাঁর দিকে—এটা চেন?

—না।

শিপাহশালার বললেন: এটা দিল্লীর সুলতানের হুকুমনামা।

—শুনলুম।

—এতে কি লেখা আছে জান।

—জানি না!

—শোন তবে। সুলতান হুকুম দিয়েছেন ধর্ম-সমন্বয়ের কথা তোমার চলবে না। হয় হিন্দু, নয় মুসলমান, একটি ধর্ম তোমাকে বেছে নিতে হবে।

—আমি প্রেমের ধর্ম ছাড়া আর কিছু বুঝি না।

সিপাহশালার বললেন: এখনো ভাব। কোন বিশেষ একটি ধর্ম অথবা মৃত্যু তোমাকে বরণ করতে হবে।

কোন শব্দ নেই।

—মৃত্যুবরণ করবে?

—ঈশ্বর জানেন।

—কোন বিশেষ ধর্ম তুমি তা হলে মানছ না?

—জীবনের মধ্য দিয়ে আমি যে সত্যের সন্ধান পেয়েছি তাকে কি করে অস্বীকার করব?

—মৃত্যুর ভয়েও না?

—মৃত্যু তো ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

ক্রুদ্ধ সিপাহশালার বললেন: উজবুক, তাহলে তোমাকে মৃত্যুদণ্ডই দিলুম।

—ঈশ্বর মঙ্গলময়।

প্রচার হয়ে গেল ধর্মদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড।

হাজারো হাজারো ভক্তেরা ছুটল শেষবারের মত তাদের প্রিয়তম মানুষকে দেখতে। এলো শত শত কৌতূহলী দর্শক।

বধ্যভূমিতে ঘাতক তাঁকে নিয়ে এল।

তেমনি শান্ত, স্নিগ্ধ, লাবণ্যময় মুখ। দুঃখ নেই, ভয় নেই, যন্ত্রণা নেই।

কে চিৎকার করে বলল: প্রভু কিছু বলে যান।

তিনি হাসলেন: আমি প্রভু নই। প্রভু তিনি। আমি মানুষের সন্তান। ব্যথা পেও না। দুঃখই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান। ভালবাসাই ধর্ম।

ঘাতকের অসি সেই মুহূর্তে তার পবিত্র দেহ থেকে মুণ্ডটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। হতবাক জনতা দেখল রক্তপ্লাবিত সেই মুখেও দুঃখের অতীত এক অনির্বচনীয় শান্তির স্পর্শ লেগে রয়েছে।

সকলে কেঁদে উঠল: হায় মানুষের সন্তান!